# দি অ্যাডভেঞ্চার্স অফ শার্লক হোমস

আর্থার কোনান ডয়েল

# সূচিপত্র


ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই ....................2
খানদানি আইবুড়োর কীর্তিকাহিনি....................33
ছদ্মবেশীর ছলনা....................66
ডোরাকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান....................90
নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার ....................124
পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি ....................151
পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার....................177
বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য ....................209
বসকোম ভ্যালির প্রহেলিকা....................235
বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি....................269
রহস্য নিকেতন কপার-বীচেস ....................302
লাল-চুলো সংঘ ....................333

# ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব]

শার্লক হোমসের সমীপে দুটো কেস আমি নিজেই নিয়ে এসেছিলাম। একটা মি. হেথার্লির বুড়ো আঙুল সংক্রান্ত, আর একটা কর্নেল ওয়ার্বার্টনের পাগলামি। দুটির মধ্যে অনেক বেশি অদ্ভুত আর নাটকীয় ছিল প্রথমটা।

১৮৮৯ সালের গরমকালের ঘটনা। সবে বিয়ে করেছি। বেকার স্ট্রিটের বাসা ছেড়ে চলে এসেছি, ডাক্তারি বেশ জমে উঠেছে। হোমসের কাছে প্রায়ই যাই, ওর বোহেমিয়ান স্বভাবটা ভাঙবার চেষ্টা করি।

ডাক্তারি করতাম প্যাডিংটন স্টেশনের কাছে। কাছেই স্টেশনের অনেক কর্মচারী আসত অসুখ সারাতে। এদের মধ্যে একজনের একটা ছিনেজোঁক যন্ত্রণা এমনভাবে সারিয়ে দিয়েছিলাম যে ভদ্রলোক অষ্টপ্রহর আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন। প্রায় রুগি পাঠিয়ে দিতেন আমার কাছে।

একদিন সকাল সাতটার একটু আগে পরিচারিকা এসে বললে স্টেশন থেকে দুজন লোক এসেছেন। তাড়াতাড়ি জামাকাপড় পরে নেমে এলাম। জানি তো, রেলের কেস কখনোই সামান্য হয় না দেরি করা যায় না।

সিঁড়ি দিয়ে নামছি, এমন সময়ে ঘর থেকে আমার সেই পূর্বপরিচিত গার্ড ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলেন।

ফিসফিস করে বললেন, এনেছি ওঁকে। ভালোই আছেন।

এমনভাবে কথাটা বললেন যেন একটা অদ্ভুত প্রাণীকে এইমাত্র বন্ধ করে এলেন বসার ঘরে।

বললাম, কী ব্যাপারটা বলবেন তো?

নতুন রুগি। যাতে পালিয়ে না-যান, তাই নিজেই নিয়ে এলাম। কাজ শেষ হল। এখন চলি, বলে ধন্যবাদ জানানোর ফুরসত পর্যন্ত না-দিয়ে উধাও হলেন গার্ড সাহেব।

ঢুকলাম কনসাল্টিং রুমে। দেখলাম, টেবিলের পাশে বসে এক যুবক। বয়স খুব জোর পঁচিশ। মুখ ফ্যাকাশে, উদবেগে অস্থির। একটা হাতে রক্তভেজা রুমাল জড়ানো।

বললেন, ডক্টর, সাতসকালে টেনে তোলার জন্য দুঃখিত। কাল রাত্রে একটা সিরিয়াস অ্যাক্সিডেন্টে পড়েছিলাম। ভোরের ট্রেনেই চলে এসেছি। স্টেশনে ডাক্তারের খোঁজ করেছিলাম–এক ভদ্রলোক এখানে নিয়ে এলেন। আমার কার্ড টেবিলেই আছে।

চোখ বুলোলাম কার্ডে।

মি. ভিক্টর হেথার্লি
হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার
১৬এ, ভিক্টোরিয়া স্ট্রিট (চারতলা)

লাইব্রেরি-চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, বসিয়ে রাখার জন্যে কিছু মনে করবেন না। সারারাত ট্রেন জার্নির ধকল তো কম নয়। বড্ড একঘেয়ে লাগে।

না না, একঘেয়ে রাত একে বলে না, বলতে বলতে পাগলের মতো হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। সে কী হাসি! সারাশরীর দুলে দুলে উঠতে লাগল। দেখেই শঙ্কিত হল আমার ডাক্তারি সত্তা।

থামুন! তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল এগিয়ে দিলাম বটে, কিন্তু কাজ হল না। বিরাট সংকট পেরিয়ে আসার পরেই যেমন হিস্টিরিয়ায় পেয়ে বসে অনেককে, উনিও সেইভাবে উন্মাদের হাসি হেসে চললেন আপন মনে। আস্তে আস্তে অবশ্য সামলে নিলেন নিজেকে।

বললেন জোরে জোরে নিশ্বাস নিতে নিতে, আচ্ছা আহাম্মক তো আমি।

জলের গেলাসে একটু ব্র্যান্ডি ঢেলে খাইয়ে দিতেই রং ফিরে এল ভদ্রলোকের রক্তহীন গালে।

আঃ, বাঁচলাম! ডক্টর, এবার আমার আঙুলটা, মানে, আঙুলটা, যেখানে থাকার কথা–সেই জায়গাটা দেখুন।

বলে, খুলে ফেললেন রক্তমাখা রুমালের পট্টি। আমার মতো শক্ত ধাতের মানুষও শিউরে উঠল সেই দৃশ্য দেখে। বীভৎস! চারটে আঙুলই কেবল দেখা যাচ্ছে বুড়ো আঙুলটার জায়গায় কেবল স্পঞ্জের মতো দগদগে মাংস আর হাড় ঠেলে বেরিয়ে আছে–গোড়া থেকে কুপিয়ে বা ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ।

সর্বনাশ! নিশ্চয় খুব রক্ত বেরিয়েছে?

তা বেরিয়েছে। অজ্ঞানও হয়ে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম তখনও রক্ত পড়ছে। তাই রুমাল দিয়ে কবজি পেঁচিয়ে ধরে গাছের সরু ডাল দিয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে রক্তপড়া বন্ধ করেছি।

চমৎকার! সার্জন হওয়া উচিত ছিল আপনার।

তরল পদার্থের গতিবিজ্ঞান জানি বলেই পেরেছি। হাইড্রলিক্স আমার বিষয়।

ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে বললাম, খুব ভারী আর ধারালো কোনো অস্ত্রের কোপ পড়েছে মনে হচ্ছে?

মাংস কাটা ছুরি বলতে পারেন।

অ্যাক্সিডেন্ট?

মোটেই না।

বলেন কী! খুনের চেষ্টা নাকি?

তার চাইতেও বেশি।

ভয় দেখিয়ে দিলেন দেখছি।

স্পঞ্জ দিয়ে ক্ষতস্থান ধুয়ে মুছে ব্যান্ডেজ করে দিলাম। যন্ত্রণায় ঠোঁট কামড়ে চুপ করে শুয়ে রইলেন ভদ্রলোক।

কাজ শেষ হলে বললাম, এ নিয়ে আর কথা নয়–নার্ভ সইতে পারবে না।

তা কি হয়? এখুনি গিয়ে সব পুলিশকে বলতে হবে। বুড়ো আঙুল নেই বলেই হয়তো বিশ্বাস করবে অসাধারণ এই কাহিনি। বিশ্বাস করলেও রহস্য ভেদ করতে পারবে কি না সন্দেহ–কেননা সূত্র তো জোগাতে পারব না।

রহস্যের গন্ধ পেয়ে নিমেষে জাগ্রত হল আমার কৌতূহল। বললাম, আরে মশাই, কুট সমস্যার সমাধান চান তো আমার বন্ধু শার্লক হোমসের কাছে আগে যান না কেন।

নিশ্চয় যাব। পুলিশকেও আমার দরকার।

তাহলে চলুন।

বসবার ঘরে বসে পাইপ টানছিল শার্লক হোমস। প্রাতরাশ খাওয়ার আগে যে-পাইপ খায়, সেই পাইপ। তার মানে, ব্রেকফাস্ট এখনও খাওয়া হয়নি। টাইমস কাগজ মেলে ধরে হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ কলমের খবর পড়ছিল একমনে।

একসঙ্গে খেলাম তিনজনে। নবাগতকে একটা সোফায় শুইয়ে হাতের কাছে জল মিশোনো ব্র্যান্ডির গেলাস রাখল।

বললে, মি. হেথার্লি, আপনার অভিজ্ঞতা যে মামুলি অভিজ্ঞতা নয়, তা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে ক্লান্তি বোধ করলে গেলাসে চুমুক দেবেন। বলুন এবার কী হয়েছে।

মি. হেথার্লি বললেন, বেশি সময় নেব না আপনার। ক্লান্তি কেটে গেছে ডাক্তারের চিকিৎসায়। পেটে খাবার পড়ায় এখন বেশ চাঙা বোধ করছি।

আমি অনাথ ব্যাচেলর। একলা থাকি। পেশায় হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার। সাত বছর কাজ করেছি একটা কোম্পানিতে। অভিজ্ঞতা প্রচুর হয়েছে। তারপর বাবার মৃত্যুর পর হাতে কিছু টাকা আসায় চাকরি ছেড়ে দিলাম। ঠিক করলাম স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করব। ঘর নিলাম ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটে।

দু-বছর স্রেফ মাছি তাড়ালাম বলতে পারেন। রোজগার প্রায় শূন্য। হতাশ হয়ে পড়লাম শেষকালে। বেশ বুঝলাম, আমার দ্বারা ব্যাবসা হবে না।

গতকাল কেরানি এসে খবর দিলে, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান আমার সঙ্গে। ভিজিটিং কার্ডে দেখলাম ভদ্রলোকের নাম–কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক।

কর্নেল ঘরে ঢুকলেন প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই। মাঝারি আকার, কিন্তু ভীষণ রোগা। মুখটা সরু হয়ে নাক চিবুকে ঠেকেছে। চামড়া ঠেলে গালের হনু উঁচু হয়ে রয়েছে। কিন্তু রুগ্ণ নন। চোখ উজ্জ্বল, পদক্ষেপ চটপটে। বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে।

জার্মান উচ্চারণে বললেন, মি. হেথার্লি, আপনি শুধু দক্ষ নন, গোপন কথা গোপনে রাখতে পারেন–এই সুপারিশ শুনেই দৌড়ে এসেছি আপনার কাছে।

তোষামোদে গলে গেলাম আমি, কে বলেছে বলুন তো?

উনিই বললেন–নামটা নাই-বা শুনলেন। তবে শুনেছি আপনার তিনকুলে কেউ নেই, আপনি বিয়ে করেননি, লন্ডনে একলা থাকেন।

সবই তো সত্যি, বললাম আমি, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কাজের কী সম্পর্ক বুঝছি না।

সম্পর্ক আছে বই কী, এখুনি শুনবেন। কিন্তু কাজটা অত্যন্ত গোপনীয়। আপনি যদি ফ্যামিলি নিয়ে থাকতেন, তাহলে এ-গোপনীয়তা আপনার কাছে আশা করতাম না।

কথা দিচ্ছি যা বলবেন, তা কেউ জানবে না।

সন্দিগ্ধ চোখে যেন আমার ভেতর পর্যন্ত দেখে নিলেন ভদ্রলোক। এ-রকম তীক্ষ্ণ চাহনি কখনো দেখিনি।

কথা দিচ্ছেন?

দিচ্ছি।

হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠলেন কর্নেল। বোঁ করে ছুটে গেলেন দরজার কাছে। এক ঝটকায় পাল্লা খুলে দেখলেন, বাইরে কেউ নেই।

ফিরে এসে বললেন, কেরানিগুলো মাঝে মাঝে বড় আড়ি পাতে। যাক এবার কাজের কথায় আসা যাক। বলে চেয়ারটা আমার কাছে সরিয়ে এনে আবার সেইরকম জিজ্ঞাসু চিন্তাবিষ্ট চোখে চেয়ে রইলেন আমার পানে।

মাংসহীন লোকটার বিচিত্র আচরণে একটু ভয় পেলাম। মনটা বিদ্রোহী হল। অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ফেললাম–যা বলবার, তাড়াতাড়ি বলুন। আমার সময়ের দাম আছে।

উনি বললেন, এক রাতে পঞ্চাশ গিনি রোজগার করতে চান?

নিশ্চয়ই।

কাজটা আসলে ঘণ্টাখানেকের। একটা হাইড্রলিক স্ট্যাম্পিং মেশিন বিগড়েছে। গোলমালটা কোথায় কেবল দেখিয়ে দেবেন।

খুবই সামান্য কাজ। দক্ষিণাটা সেই তুলনায় ভালোই।

তা ঠিক। আজ রাতেই শেষ ট্রেনে তাহলে আসছেন?

কোথায়?

আইফোর্ডে। রীডিং স্টেশন থেকে সাত মাইল দূরে। প্যাডিংটন থেকে ট্রেনে চাপলে পৌঁছে যাবেন সোয়া এগারোটায়।

বেশ যাব।

আমি গাড়ি নিয়ে আসব স্টেশনে। রাতটা ওখানেই কাটাবেন।

ফিরতি ট্রেন পাব না?

শেষ ট্রেনে যেতে বলছি কারণ আছে বলেই। এইসব অসুবিধের জন্যেই পঞ্চাশ গিনি দিচ্ছি আপনার মতো অল্পবয়সি অজানা মানুষকে। এখনও ভেবে দেখুন।

ভেবে দেখলাম। পঞ্চাশ গিনি ছাড়া যায় না। বললাম, ঠিক আছে, আপনার কথাই রইল। কিন্তু একটু খুলে বলুন কী করতে হবে আমাকে।

কেউ আড়ি পাতছে না তো?

না, না। নির্ভয়ে বলুন।

জানেন নিশ্চয় সাজিমাটি জিনিসটা দারুণ দামি। ইংলন্ডের দু-এক জায়গা ছাড়া পাওয়া যায় না।

শুনেছি!

কিছুদিন আগে রীডিং থেকে মাইল দশেকের মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গা কিনেছিলাম। কপালজোরে সাজিমাটির স্তর আবিষ্কার করলাম সেই জমিতে। তারপর দেখলাম, আমার জমিতে যে-স্তর আছে, তার চাইতেও বেশি স্তর আছে ডাইনে বাঁয়ে আমার প্রতিবেশীদের জমিতে। কিন্তু তারা জানে না সোনার খনির চাইতে দামি জিনিস রয়েছে মাটির তলায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করলাম, আমার জমি থেকে প্রথমে কিছু সাজিমাটি তুলে দু-পয়সা রোজগার করব! সেই টাকায় প্রতিবেশীদের জমি কিনে নেব। গোপনে কাজ সারার জন্যে একটা হাইড্রলিক প্রেস কিনেছি। কিন্তু পাছে কথাটা পাঁচ কান হয়, তাই কাউকে কিছু জানাইনি। আপনাকেও বলব, আইফোর্ড যাচ্ছেন আজ রাতে কাউকে বলবেন না।

আমি বললাম–সবই বুঝলাম। শুধু বুঝলাম না সাজিমাটি তোলার জন্যে হাইড্রলিক প্রেসের দরকার কী। ওটা তো গর্ত খুঁড়ে তুলতে হয়।

আমাদের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। মাটি চেপে ইট বানিয়ে পাচার করি যাতে কেউ জানতে না-পারে, উঠে দাঁড়ালেন কর্নেল। আপনাকে সব কথাই বললাম। আইফোর্ডে সোয়া এগারোটায় তাহলে আসছেন?

নিশ্চয়।

কাকপক্ষীও যেন না-জানে,বলে শেষবারের মতো আবার সেই অন্তর্ভেদী, জিজ্ঞাসু চাহনি দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ আমাকে যেন এফোঁড়-ওফেঁড় করলেন ভদ্রলোক। তারপর করমর্দন করে এস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

খুব অবাক হলাম কর্নেলের প্রস্তাবে। মাঝরাতে নিয়ে যেতে চান, কাকপক্ষীকে জানাতে চান না, দশগুণ পারিশ্রমিক দিতে চান। সাজিমাটির গল্পটাও যেন নেহাতই গল্প–বিশ্বাস করতে মন চায় না। যাই হোক, খেয়ে নিয়ে রওনা হলাম ট্রেন ধরতে।

আইফোর্ড পৌঁছোলাম এগারোটার পর। প্ল্যাটফর্মে নামলাম কেবল আমিই। লণ্ঠন হাতে ঘুমন্ত একজন কুলি ছাড়া কাউকে দেখলাম না। বাইরে আসার পর দেখলাম অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে কর্নেল। আমার হাত খামচে ধরে গাড়ির মধ্যে টেনে তুললেন, জানলা বন্ধ করে দিলেন, তক্তায় টোকা মারতেই ঘোড়া ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে।

একটাই ঘোড়া? শুধোল হোমস।

রংটা দেখেছিলেন?

তামাটে।

ক্লান্ত ঘোড়া?

না, না, বেশ তাজা, চকচকে।

তারপর?

গাড়ি ছুটল প্রায় এক ঘণ্টা। কর্নেল বলেছিলেন সাত মাইল পথ। আমার তো মনে হল বারো মাইল। রাস্তা খুব খারাপ। লাফাতে লাফাতে যাচ্ছিল গাড়ি। ওপরদিকে উঠলে বুঝতে পারতাম না–রাস্তা এবড়োখেবড়ো থাকার জন্যে কেবল লাফাচ্ছিল। জানলা বন্ধ থাকায় কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। কর্নেল কথা বলছিলেন না। সমানে অন্তর্ভেদী চোখে চেয়ে ছিলেন আমার দিকে। তারপর কাকর বিছানো পথের ওপর দিয়ে এসে গাড়ি থামল। আমরা নামলাম। বাড়িটাকে ভালো করে দেখবার আগেই ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল।

ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কর্নেল দেশলাই খুঁজতে লাগলেন। এমন সময়ে অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখা গেল। ল্যাম্প হাতে এক ভদ্রমহিলা। খুব সুন্দরী। পরনের পোশাকটিও দামি। বিদেশি ভাষায় কী যেন জিজ্ঞেস করল কর্নেলকে। একটিমাত্র ছোট্ট শব্দে জবাব দিলেন কর্নেল। শুনেই এমন আঁতকে উঠল মেয়েটি যে আর একটু হলেই ল্যাম্প খসে পড়ে যেত হাত থেকে। কর্নেল কানে কানে কী বলে তাকে ঠেলে বার করে দিলেন ঘরের বাইরে–ল্যাম্প নিয়ে ফিরে এলেন আমার কাছে।

পাশের ঘরে একটা দরজা খুলে আমাকে বসতে বললেন সেখানে। ঘরে একটা গোল টেবিলের ওপর ছড়ানো কতকগুলো জার্মান বই। ল্যাম্পটা একটা হার্মোনিয়ামের ওপর রেখে এখুনি আসছি বলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

জার্মান বইগুলোর মধ্যে দুটো বই বিজ্ঞানের, বাকিগুলো কবিতার। জানলা খুলতে গিয়ে দেখি আড়াআড়িভাবে খিল দিয়ে আঁটা খড়খড়ি। খোলে কার সাধ্য। আইফোর্ড থেকে মাইল দশেক দূরে এসেছি ঠিকই কিন্তু পুবে, না পশ্চিমে, উত্তরে, না দক্ষিণে বোঝার সাধ্য নেই। কোথাও কোনো আওয়াজ নেই। চরাচর নিস্তব্ধ। বাড়ি নিস্তব্ধ। শুধু একটা সেকেলে ঘড়ি চলার টিক টিক আওয়াজ আসছে ভেতর থেকে।

আচমকা নিঃশব্দে খুলে গেল ঘরের দরজা। ভয়ার্ত মুখে ল্যাম্প হাতে ঘরে ঢুকল সুন্দরী সেই মহিলাটি। এমনভবে পাণ্ডাসপানা মুখে বার বার পেছনে চাইতে লাগল যে আতঙ্কে অবশ হয়ে এল আমার হৃৎপিণ্ড।

আঙুল নেড়ে আমাকে কথা বলতে বারণ করে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললে, আমি হলে পালাতাম। এখানে থাকতাম না।

কিন্তু ম্যাডাম, মেশিন না-দেখে যাই কী করে?

থেকে কোনো লাভ নেই। এই দরজা দিয়ে পালান। আমি মুখ টিপে হাসছি দেখে এগিয়ে এসে দু-হাত এক করে বললে চাপা গলায়, ভগবানের নামে বলছি, এখুনি পালান–আর দেরি করবেন না!

আমি আবার একটু একরোখা টাইপের বাধা পেলে গোঁ আরও বেড়ে যায়। এসেছি পঞ্চাশ গিনি রোজগার করতে এতটা পথ বেরিয়ে অনেক ধকল সয়ে–খামোকা ফিরে যেতে যাব কেন? হাতের কাজ শেষ না-করেই বা পালাতে যাব কেন? মহিলাটির মাথায় ছিট আছে নিশ্চয়। তাই মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলাম, আমি যাব না। আবার কাকুতিমিনতি করতে যাচ্ছে ভদ্রমহিলা, এমন সময়ে দড়াম করে দরজা বন্ধ করার আওয়াজ হল ওপরতলায়। সিঁড়িতে শোনা গেল অনেকগুলো পায়ের আওয়াজ। কান খাড়া করে শুনেই নিঃসীম নৈরাশ্যে দু-হাত শূন্যে ছুঁড়ে চকিতে নিঃশব্দে ফের অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল ভদ্রমহিলা।

ঘরে ঢুকলেন কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক আর একজন বেঁটে মোটা ভদ্রলোক। এঁর নাম ফার্গুসন–আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর জানলাম। ভদ্রলোকের থুতনিতে মাংস ডবল ভাজ খেয়ে ঝুলছে–তার ওপর চিঞ্চিলা-জন্তুর কোমল ধূসর রোমের মতো দাড়ি।১৩

কর্নেল বললেন, মি. ফার্গুসন আমার ম্যানেজার আর সেক্রেটারি। ভালো কথা, দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেছিলাম না?

গুমোট লাগছিল বলে খুলেছি, বললাম আমি।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে কর্নেল বললেন–তাহলে চলুন মেশিনটা দেখে আসা যাক।

টুপিটা পরে নিই।

না, না টুপি পরার দরকার নেই। মেশিন বাড়ির মধ্যেই আছে।

সে কী কথা। বাড়ির মধ্যে সাজিমাটি খোঁড়েন নাকি?

আরে না। এখানে শুধু চেপেচুপে ইট বানাই। অত কথায় দরকার নেই। আপনি শুধু মেশিনটা দেখে বলে দিন গলদটা কোথায়।

ল্যাম্প হাতে কর্নেল চললেন আগে, আমি আর ফার্গুসন পেছনে। বাড়ি তো নয়, একটা গোলকধাঁধা। ঘোরানো সিঁড়ি, নীচু দরজা, সরু গলির যেন আর শেষ নেই। ওপরতলায় এ কার্পেট বা ফার্নিচারের চিহ্নমাত্র নেই। পলেস্তারা খসা দেওয়ালে ছাতলা পড়েছে। ভদ্রমহিলার হুঁশিয়ারিতে কর্ণপাত না-করলেও চোখ রেখেছি দুজনের ওপর বাইরে যদূর সম্ভব নির্বিকার। ফাগুসন লোকটাকে মনে হল স্বদেশবাসী। বেশ মুষড়ে রয়েছে যেন, কথা একদম বলছে না।

অবশেষে একটা ছোট্ট নীচু দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন কর্নেল। ঘরখানা চৌকোনা। এত ছোটো যে একসঙ্গে তিনজনের ঠাঁই হয় না। কাজেই ফার্গুসন রইলেন বাইরে–আমি গেলাম কর্নেলের পেছন পেছন।

উনি বললেন–আমরা এখন হাইড্রলিক প্রেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে। পায়ের তলা ধাতুর। মেঝের সঙ্গে চিঁড়েচেপটা হয়ে যাব যদি এখন কেউ মেশিনটা চালিয়ে দেয়–কেননা মাথার ওপরকার ছাদটা আসলে পিস্টনের তলার দিক—হু-হু করে নেমে আসবে নীচে কয়েক টন চাপ দিয়ে। মেশিনটা আগের মতো মসৃণভাবে আর চলছে না–শক্তি কমে গেছে। কেন এ-রকম হচ্ছে, সেইটুকুই কেবল দেখিয়ে দিন।

ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে মেশিন পরীক্ষা করলাম। সত্যিই দানবিক মেশিন। বাইরে গিয়ে হাতল টিপে মেশিন চালালাম। সোঁ-সোঁ আওয়াজ শুনেই বুঝলাম লিক আছে কোথাও। দেখলাম, পাশের একটা সিলিন্ডার থেকে জল বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা রাবারের পটি শুকিয়ে যাওয়ায় ড্রাইভিং-রড ঠিকমতো কাজ করছে না। শক্তির ঘাটতি দেখা দিয়েছে সেই কারণেই। কর্নেলকে দেখিয়ে দিলাম গলদটা এবং বুঝিয়ে দিলাম কীভাবে মেরামত করতে হবে। কান খাড়া করে সব শুনলেন তিনি। তারপর আমি ভেতরে ঢুকলাম নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্যে। দেখলাম, দেওয়াল কাঠের কিন্তু মেঝে একখানা বিরাট লোহার পাত দিয়ে তৈরি। সাজিমাটি চেপে ইট বানানোর গল্পটা যে একেবারেই কল্পিত, তার প্রমাণ রয়েছে মেঝেতে। একটা ধাতুর স্তর লেগে রয়েছে সেখানে। এইরকম একটা দানবিক মেশিন দিয়ে সাজিমাটি চেপে ইট বানানো তাহলে হয় না। খুঁটিয়ে দেখছি ধাতুর

স্তরটা কী, এমন সময়ে অস্ফুট জার্মান বিস্ময়োক্তি শুনলাম পেছনে। সচমকে ফিরে দেখি, বিবর্ণ মাথা হেঁট করে আমার কাণ্ড দেখছেন কর্নেল।

কী করছেন?

মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ভুলিয়ে আনার জন্যে, চিৎকার করে বললাম, সাজিমাটির তারিফ করছি। সত্যি কথাটা বললে আরও ভালো পরামর্শ দিতে পারতাম কিন্তু।

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। মুখটা কঠিন হয়ে গেল কর্নেলের, নরকের আগুন জ্বলে উঠল দুই চোখে।

এখুনি জানবেন সত্যি কথাটা, বলেই এক লাফে বেরিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে চাবি দিয়ে দিলেন কর্নেল। পাল্লায় লাথি ঘুসি মেরে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে চললাম আমি।

আচমকা নৈঃশব্দ্য খান খান করে দিয়ে জাগ্রত হল হাতল টেপবার ঝনৎকার আর জল বেরিয়ে যাওয়ার সোঁ-সোঁ শব্দ। মেশিন চালিয়ে দিয়েছেন কর্নেল। কালো ছাদটা ঝাঁকি মেরে নামতে শুরু করেছে নীচের দিকে। মেঝে পরীক্ষা করার সময়ে ল্যাম্পটা মেঝের ওপর রেখেছিলাম বলে হাতটা খালি ছিল। দু-হাতে পাল্লা খোলার চেষ্টা করলাম, কাকুতিমিনতি করলাম। কিন্তু ফল হল না। হাত বাড়ালেই তখন ছাদ ছুঁতে পারছি–মানে এক মিনিট লাগবে আমাকে মাংসপিণ্ড বানাতে। মাথা তুলে যখন দাঁড়াতেও পারছি না,

ভাবছি শুয়ে পড়লেই বরং শিরদাঁড়া সমেত একেবারেই থেতলে যাব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরার চাইতে ভালো। এমন সময়ে হৃৎপিণ্ড তুড়ুক নাচ নেচে উঠল একটা জিনিস দেখে।

কাঠের দেওয়াল একটু একটু ফাঁক হয়ে গেল। একটা হলদে আলোর আভা দেখা গেল। দরজা! লাফ দিয়ে সেঁধিয়ে গেলাম ফাঁকটা দিয়ে। দরজাও বন্ধ হল, পেছনে ল্যাম্প গুড়ো করে ধাতুতে ধাতুতে মিলে যাওয়ায় ঝন ঝনাৎ শব্দও শুনলাম।

সম্বিৎ ফিরে পেলাম কবজিতে টান পড়ায়। ডান হাতে ল্যাম্প ধরে বাঁ-হাতে আমার কবজি ধরে হিড় হিড় করে টানছে পরমাসুন্দরী সেই মহিলাটি। আমি পড়ে আছি একটা সংকীর্ণ গলির পাথুরে মেঝেতে।

এসে পড়বে ওরা! তাড়াতাড়ি।

এবার আর অন্যথা হল না। হাঁচড়পাঁচড় করে দাঁড়িয়ে উঠে ছুটলাম তার পেছনে। গলিখুঁজি পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে দুজন পুরুষের উচ্চকণ্ঠের চিৎকার শুনলাম। ভদ্রমহিলা ঘাবড়ে গেলেন। ঝট করে দরজা খুলে ঢোকালেন একটা শোবার ঘরে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে চাদের আলো।

লাফান! আর পথ নেই!

মুখের কথা শেষ হওয়ার আগেই সরু গলির অপর প্রান্তে দেখা গেল ল্যাম্প হাতে ঝড়ের মতো দৌড়ে আসছেন কর্নেল তার এক হাতে মাংসকাটা কসাইয়ের ছুরি। আমি ততক্ষণে জানলার গোবরাট ধরে বাইরে ঝুলে পড়েছি–কিন্তু ভদ্রমহিলাকে ফেলে পালাতে মন চাইছে না। যদি দেখি ওর ওপর অত্যাচার চলছে, তাহলে প্রাণ যায় যাক, উঠে যাব ঘরে।

মহিলাটিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে গেলেন কর্নেল কিন্তু পারলেন না। তাকে আঁকড়ে ধরে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ইংরেজিতে ভদ্রমহিলা বললেন, ফ্রিৎস! ফ্রিৎস! গতবার তুমি কথা দিয়েছিলে! আর হবে না বলেছিলে। ওঁকে ছেড়ে দাও! উনি কাউকে কিছু বলবেন না!

তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে এলিজ? আমাদের সবাইকে শেষ করে ছাড়বে ওই লোক। অনেক বেশি দেখে ফেলেছে। সরো! বলে এক ধাক্কায় ভদ্রমহিলাকে সরিয়ে দিয়ে জানলার সামনে ছিটকে এসে কোপ মারলেন ছুরি দিয়ে। আমি সবে গোবরাট থেকে হাত তুলতে গেছি, এমন সময়ে কোপ পড়ল গোবরাটে–একটা সাংঘাতিক তনু-মন-অবশ-করা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ল অণুতে পরমাণুতে। আমি পড়ে গেলাম বাগানে।

পড়ে গেলেও জ্ঞান হারাইনি। উঠেই দৌড়োতে লাগলাম ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে। অনেকটা মুহ্যমানের মতো। কান ঝাঁ-আঁ করছে, মাথার মধ্যে যেন লক্ষ ঝঝর বাজছে। এই সময়ে যন্ত্রণাটা আবার চিড়িক দিয়ে ওঠায় বুড়ো আঙুলের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখি আঙুলটাই নেই! দেখেই মাথা ঘুরে গেল। রুমাল দিয়ে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়াটা বন্ধ

করতে গিয়ে আরও যেন কীরকম হয়ে গেলাম। গোলাপ ঝোঁপের মধ্যে টলে পড়ে গেলাম।

নিশ্চয় অনেকক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম। জ্ঞান ফিরে এলে দেখলাম চাদ চলে গেছে, ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। সবচেয়ে অবাক কাণ্ড আমি পড়ে আছি বড়োরাস্তার একটা ঝোঁপের ধারে দূরে রেল স্টেশনের বাড়ি। আশেপাশে কোথাও গত রাতের সেই রহস্যনিকেতন বা বাগিচার চিহ্নমাত্র নেই।

হাতটা আবার ঝন ঝন করে উঠতে চেয়ে দেখলাম। স্বপ্ন নয়। সত্যিই কাল রাতে ভয়ংকর মৃত্যুর মুখে পড়েছিলাম কিন্তু মরিনি।

টলতে টলতে স্টেশনে গেলাম। সেই কুলিটা ছিল। কিন্তু কর্নেল লাইস্যান্ডার স্টার্ক বলে কাউকে সে চেনে না। কাল রাতে কোনো গাড়িও দেখেনি।

ছ-টার একটু পরেই লন্ডন পৌঁছোলাম। স্টেশন থেকে আঙুল ড্রেস করতে গিয়ে ডক্টর ওয়াটসনের কাছে আপনার কথা শুনলাম। সবই বললাম, এখন বলুন কী করব।

কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। অসাধারণ কাহিনি সন্দেহ নেই। তারপর হোমস উঠে গিয়ে মোটা খাতা পেড়ে আনল তাক থেকে। খবরের কাগজের কাটিং সেঁটে রাখে খাতাটায়।

বললে, এক বছর আগে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। শুনুন।

ন-তারিখে ছাব্বিশ বছর বয়স্ক হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার মি. জেরেমিয়া হেলিং নিখোঁজ হয়েছেন। রাত দশটার সময়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যান–আর পাওয়া যায়নি। পোশাক ইত্যাদি, ইত্যাদি। ব্যস! এই তো বোঝা গেল! এক বছর আগে এইভাবেই মেশিন মেরামত করেছিলেন কর্নেল।

কী সর্বনাশ! ভদ্রমহিলা তাহলে এর কথাই বলছিলেন! বললেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠহীন রুগি।

নিশ্চয়। কর্নেল লোকটা পয়লা নম্বরের মরিয়া লোক–ঠান্ডা মাথার বদমাশ। পথের কাঁটা দূর করতে কোনো পন্থা অবলম্বনেই পেছপা নন। প্রত্যেকটা সেকেন্ড এখন অমূল্য। চলুন, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে আগে যাওয়া যাক। সেখান থেকে দল বেঁধে যাব আইফোর্ড।

ঘণ্টা তিনেক পরে ট্রেনে চেপে বসলাম আমি, শার্লক হোমস, ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট, হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন সাদা পোশাকি পুলিশ। ব্র্যাডস্ট্রিট একটা সামরিক ম্যাপ১৬ বিছিয়ে আইফোর্ডকে মাঝে রেখে কম্পাস দিয়ে বৃত্ত আঁকছিলেন চারধারে।

বললেন, এই নিন দশ মাইল ব্যাসার্ধের বৃত্ত। এর মধ্যেই পড়বে। দশ মাইলই তো?

আধঘণ্টা টেনে গিয়েছিলাম গাড়িতে।

অজ্ঞান অবস্থায় এতটা পথ বয়ে এনেছিল?

নিশ্চয় তাই। আবছা মতন মনে আছে কারা যেন বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে।

আমি বললাম, বাগানে আপনাকে অজ্ঞান অবস্থায় পেয়ে ছেড়ে দিল কেন বুঝছি না।

ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, এখুনি তা বোঝা যাবে। আগে জানা দরকার সেই বাড়িটা কোথায়।

শান্তকণ্ঠে হোমস বললে, আমি দেখিয়ে দিতে পারি।

তাই নাকি! তার মানে, মনে মনে আপনি ঠিক করেই ফেলেছেন জায়গাটা কোথায়। বেশ, দেখা যাক আপনার সঙ্গে একমত হতে পারি কি না। আমি বলব বাড়িটা দক্ষিণে ওইদিকেই লোকজন কম।

হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার বললেন, পুবদিকে।

পশ্চিম দিকে, বললে সাদা পোশাকি ভদ্রলোক, নিরালা গ্রামগুলো তো ওইদিকেই।

উত্তর দিকে, বললাম আমি, কেননা পাহাড় নেই ওদিকে। মি. হেথার্লি বলেছেন, গাড়ি ওপর দিকে উঠেছে বলে একবারও মনে হয়নি।

শার্লক হোমস বললে, ভুল করলেন প্রত্যেকেই। বলে আঙুলে রাখল বৃত্তের ঠিক মাঝখানে, এইখানে খুঁজলে পাবেন সেই বাড়ি।

দম আটকে এল যেন হেথার্লির, কিন্তু বারো মাইল পথ তো গিয়েছি!

ছ-মাইল গেছেন, ছ-মাইল এসেছেন। আপনিই বললেন, ঘোড়ার গা চকচক করছিল, ক্লান্ত মোটেই ছিল না। বারো মাইল খারাপ রাস্তা পেরিয়ে কোনো ঘোড়াকেই ও অবস্থায় দেখা যায় না।

মাথা চুলকোতে চুলকাতে ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, খুব ধোঁকা দিয়েছে মনে হচ্ছে। দলটার কাজকারবার এবার আন্দাজ করা যাচ্ছে।

জাল টাকার কারবার, বললে হোমস। রুপোর নকল হিসেবে খাদ মিশোনো যে-ধাতু লাগে, সেটি তৈরির জন্যেই দরকার ওই মেশিন।

ব্র্যাডস্ট্রিট বললেন, নকল আধ ক্রাউন মুদ্রায় বাজার ছেয়ে ফেলেছে, এমন একটা দলের কীর্তি আমাদের কানে এসেছে। রীডিং পর্যন্ত তাদের হদিশ পেয়েছি–এবার বাছাধনদের ছাড়ছি না।

কিন্তু পুলিশের হাতে পড়বার পাত্র তারা নয়। ব্র্যাডস্ট্রিটের মনোবাঞ্ছা আর পূর্ণ হল না। আইফোর্ডে ট্রেন যখন ঢুকছে, তখনই দেখলাম অস্ট্রিচ পাখির পালকের মতো রাশি রাশি ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। বড়ো বড়ো গাছপালার আড়ালে দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন।

বাড়ি পুড়ছে নাকি? গাড়ি থামলে পর স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞেস করলেন ইনস্পেকটর।

আজ্ঞে, হ্যাঁ।

আগুন লাগল কখন।

রাত্রে।

বাড়িটা কার?

ডক্টর বেচারের।

ডক্টর বেচার কি জাতে জার্মান, খুব রোগা, খাড়া লম্বা নাক?

স্টেশন মাস্টার তো হেসেই অস্থির।

বলল, আজ্ঞে না, ডক্টর বেচার জাতে ইংরেজ। খাঁটি ভদ্রলোক। তবে ওঁর বাড়িতে একজন বিদেশি রুগি থাকেন–পেটে কিছু সয় বলে মনে হয় না।

তাড়াতাড়ি একটা গাড়ি নিয়ে রওনা হলাম আগুনের দিকে। গিয়ে দেখলাম বিরাট একটা বাড়ি জানলাসমেত দাউ দাউ করে পুড়ছে৮। বাগানে দমকল বাহিনী বৃথাই আগুনকে বাগে আনবার চেষ্টা করছে।

দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন হেথার্লি, ওই তো সেই বাড়ি। এই হল কঁকর বিছানো পথ, ওই গোলাপি ঝোপে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলাম আমি, আর ওই জানলাটা থেকে লাফ দিয়েছিলাম নীচে।

হোমস বললে, ভালো শোধই নিলেন আপনি। যে-ল্যাম্পটা মেশিন ঘরে রেখে এসেছিলেন, গুড়িয়ে যাবার পর সেই আগুন কাঠের তক্তায় গিয়ে লাগে। তখন আপনার পেছন নিতে গিয়ে অত কেউ খেয়াল করেনি–পরে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দেখে সব ফেলে পালিয়েছে–এতক্ষণে এক-শো মাইল দূরে চলে গেছে বলতে পারেন।

হোমসের কথাই সত্যি হল শেষ পর্যন্ত। নৃশংস জার্মান বা বিষণ্ণ ইংরেজের খবর আর পাওয়া যায়নি। তবে সেইদিনই ভোরের দিকে ভারী ভারী বাক্স বোঝাই একটা গাড়িকে রীডিং স্টেশনের দিকে যেতে দেখেছিল একজন চাষি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা গেল কোথায়, তা শার্লক হোমস পর্যন্ত মাথা খাঁটিয়ে বার করতে পারেননি।

বাড়িটার গোলকধাঁধার মতো গলিখুঁজি দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল দমকল বাহিনী, চোখ কপালে উঠেছিল ওপরতলার জানলার গোবরাটে একটা মানুষের বুড়ো আঙুল দেখে। সন্ধে নাগাদ আগুন নিভল বটে, কিন্তু ততক্ষণে ছাদ ধ্বসে পড়েছে, অভিশপ্ত মেশিনটাও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। বারবাড়িতে পাওয়া গেল কিছু নিকেল আর টিন। পাওয়া গেল না কেবল মুদ্রা নিশ্চয় পাচার হয়ে গিয়েছে ভোরের সেই গাড়িতে।

হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার প্রাণে বেঁচে গেলেন কীভাবে এবং কে-ই বা তাকে বয়ে নিয়ে গেলেন বড়োরাস্তায়–সে-রহস্য পরিষ্কার হল নরম মাটিতে দু-জোড়া পদচিহ্ন আবিষ্কারের পর। একজোড়া খুব ছোটো, আর একজোড়া বেশ বড়ো। অর্থাৎ মহিলাটি ইংরেজ ভদ্রলোকের সাহায্যে ইঞ্জিনিয়ারকে ধরাধরি করে নিয়ে আসে বাইরে। নীরব প্রকৃতি ভদ্রলোকের মন অতটা নিষ্ঠুর নয়, খুন জখমের প্রবৃত্তি নেই বলেই ভদ্রমহিলার মিনতি তাঁকে স্পর্শ করেছে।

লন্ডনগামী ট্রেনে উঠে বসে ক্ষোভের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার বললেন, ভালো কারবার করে গেলাম বটে! পঞ্চাশটা গিনি তো পেলামই না–রেখে গেলাম বুড়ো আঙুলখানা!

কিন্তু পেলেন অভিজ্ঞতা, হেসে বলল শার্লক হোমস। এই গল্প শুনিয়ে ব্যাবসা জীবনে আপনার সুনাম বাড়িয়ে নেবেন খন।

———

টীকা

১. ইঞ্জিনিয়ারের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ নেই : দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব প্রথম প্রকাশিত হয় স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯২-এর মার্চ সংখ্যায়।

২. কর্নেল ওয়ার্কার্টনের : কর্নেল উইলিয়াম পি. ওয়ার্কার্টন ছিলেন এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থার কন্যান ডয়ালের সহপাঠী।

৩. একটা হাতে : কোন হাত? ডান না বাম? লেখেননি কন্যান ডয়াল, তবে স্ট্র্যান্ডে প্রকাশিত সিডনি প্যাগেটের আঁকা ছবি দেখে মনে হয় বাঁ-হাতের বুড়ো আঙুলটি কাটা পড়েছিল।

৪. হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ার : মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি শাখা। বিভিন্ন মেশিন, মিল, স্টিম ইঞ্জিন, সেকালের রেল ইঞ্জিন প্রভৃতি নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত ইত্যাদি পড়ত হাইড্রলিক ইঞ্জিনিয়ারদের কাজের আওতায়।

৫. স্পঞ্জের মতো দগদগে মাংস : এককোপে কাটা পড়া আঙুলের ক্ষত স্পঞ্জের মতো দগদগে হওয়া খুব স্বাভাবিক নয়।

৬. ব্যান্ডেজ : ব্যান্ডেজে ব্যবহার করা হত কার্বলিক অ্যাসিড কিংবা ফিনাইল, যোসেফ লিস্টার (১৮২৭-১৯১২) ব্যান্ডেজে অ্যান্টিসেপটিক ব্যবহারের প্রচলন করেন। তার আগে ইথারের ব্যবহারে ব্যথা কমানোর চেষ্টা করা হত। এতে রোগীর কষ্ট কম হলেও ভবিষ্যতে ক্ষততে গ্যাংরিন হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানো যেত না।

৭. তাহলে চলুন : এত বড়ো আঘাতের পর ডাক্তার হিসেবে ওয়াটসন রোগীর ঘুমোনোর ব্যবস্থা করলেন না।

৮. আইফোর্ড : ইংলন্ডে আইফোর্ড নামে কোনো এলাকা নেই।

৯. সাজিমাটি : অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট। ধোপাদের কাপড় কাঁচায় ব্যবহার হওয়া ছাড়া বিভিন্ন কেমিক্যাল দ্রব্য উৎপাদনে এবং কারখানায় ব্যবহৃত হয়।

১০. ইংলন্ডের দু-এক জায়গা : ইংলন্ডের সারে এবং ইয়র্কশায়ারে সাজিমাটি পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় স্কটল্যান্ডের মোরেশায়ারে।

১১. হাইড্রলিক প্রেস : ইয়র্কশায়ারের যোসেফ ব্রামা ১৭৯৬ সালে আবিষ্কার করেন এই যন্ত্র। একটি ছোটো পিস্টন দিয়ে তরল পদার্থকে ঠেলা দিয়ে অন্য একটি বড়ো পিস্টনের ওপর বহুগুণ বেশি চাপ উৎপন্ন করা যায় এই যন্ত্রে।

১২. হামোনিয়ামের : হার্মোনিয়াম প্রথম তৈরি করেন আলেকসান্দ্রে ডিবে, ১৮৪৮ সালে। এই বাদ্যযন্ত্র প্রাথমিকভাবে ছোটো চার্চ, চ্যাপেল বা বাড়িতে ব্যবহার করা হত।

১৩. চিঞ্চিলা-জন্তুর কোমল... দাড়ি : ঘন, জটা পাকানো দাড়িকে ইংরেজিতে অনেক সময়ে চিঞ্চিলা-বিয়ার্ড বলা হয়।

১৪. স্বদেশবাসী : লন্ডনের অধিবাসীরা সাধারণভাবে জার্মানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। কাইজার উইলহেলম জার্মানির সিংহাসনে বসলে বার্লিনেও ইংরেজ বিরোধী মত প্রগাঢ় হয়। সম্ভবত এই কারণেই জার্মানের সঙ্গী ইংরেজটির প্রতি হোমসের মক্কেলের এই দরদ-ভরা সম্বোধন।

১৫. দানবিক মেশিন : এই ধরনের একটি মেশিন প্রতিবেশীদের সন্দেহের উদ্রেক না-করে বসানো হল কীভাবে, সে-বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কয়েকজন সমালোচক।

১৬. সামরিক ম্যাপ : ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবার আশঙ্কায় ১৭৯১-এ ইংলন্ডের বোর্ড অব অর্ডিন্যান্স দক্ষিণ ব্রিটেনের জরিপ আরম্ভ করে। প্রথম ম্যাপটি ছিল কেন্ট কাউন্টির। এটি সম্পূর্ণ হয় ১৮০১ সালে।

১৭. জাল টাকার কারবার : ভিক্টোরীয় যুগে ইংলন্ডে নকল মুদ্রা ছেয়ে গিয়েছিল।

**১৮.** দাউ দাউ করে পুড়ছে : হেদার্লি হাইড্রলিক প্রেসে জ্বলন্ত লণ্ঠন রেখে আসে আনুমানিক রাত দুটোয়। আগুন তখনই লেগেছে। হোমসরা অকুস্থলে পৌঁছন দুপুর নাগাদ। আগুন নিভল সন্ধের সময়ে। দমকল থাকা সত্ত্বেও অত সময় লাগল? আর কুড়ি ঘন্টা আগুন জ্বলল বাড়িটা পোড়াতে!

**১৯.** ওই গোলাপি ঝোপে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম আমি : আগুন লাগবার দু-আড়াই ঘণ্টা পরে যখন হেদার্লির জ্ঞান ফিরল তখন সে কোনো পোড়া গন্ধ পায়নি বা ধোঁয়া দেখেনি? নাকি, হাতের ব্যথায় বিব্রত হয়ে কিছু টের পায়নি?

# খানদানি আইবুড়োর কীর্তিকাহিনি

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য নোবল ব্যাচেলার]

লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ে এবং তারপরেই বিয়ে ভেঙে যাওয়ার অদ্ভুত কাহিনি অনেকের কাছেই এখন বাসি হয়ে গিয়েছে। নিত্যনতুন কলঙ্ক কাহিনি রটছে, চার বছর আগেকার ব্যাপারটা আর তেমন আগ্রহ জাগায় না। বিচিত্র এই রহস্য ভেদে কিন্তু শার্লক হোমসের একটা বড়ো ভূমিকা ছিল।

আমার বিয়ের কয়েক হপ্তা আগের ঘটনা। ঝড়বাদলার মাতামাতি চলছে বাইরে। জিজেল বুলেটে আহত প্রত্যঙ্গ টনটনিয়ে উঠছে—বহু বছর আগে আফগান লড়াইয়ে জখম হয়েছিলাম–কিন্তু মাঝে মাঝে ব্যথাটা বেশ চাগাড় দিয়ে ওঠে। চেয়ারে পা তুলে একরাশ খবরের কাগজ আর হোমসের নামে আসা এক বান্ডিল চিঠি নিয়ে বসে ছিলাম। একটা লেফাফার ওপর সিলমোহর আর মনোগ্রাম লক্ষ করার মতো। ভাবছিলাম খানদানি পত্রলেখকটি কে হতে পারে।

এমন সময়ে বৈকালিক ভ্রমণ সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরল শার্লক হোমস। খামটা হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে ভেতরের চিঠিতে চোখ বুলিয়ে বললে, ওহে, কেস খুব ইন্টারেস্টিং!

সামাজিক ব্যাপার নয় তাহলে?

একেবারেই না। পেশার ব্যাপার।

খানদানি মক্কেল নিশ্চয়?

ইংলন্ডের উঁচু মহলে যে কজন আছেন, তাঁদের একজনের চিঠি।

বল কী হে! অভিনন্দন রইল।

ওয়াটসন, মক্কেলের সমস্যাটাই আমার কাছে বড়ো–তার সামাজিক প্রতিপত্তি নয়। কাগজ তো পড়, লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ের ঘটনা নিশ্চয় চোখ এড়ায়নি?

আরে না। দারুণ ইন্টারেস্টিং ঘটনা।

চিঠিখানা লর্ড সেন্ট সাইমনের লেখা। লিখেছেন :

মাই ডিয়ার মি. শার্লক হোমস,

আমার বিয়ের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই আজ বিকেল চারটের সময়ে। অনুগ্রহ করে অন্য কাজ থাকলে তা বাতিল করবেন, কেননা ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মি. লেসট্রেড রহস্য সমাধানে উঠে পড়ে লেগেছেন–তাঁর মতে আপনিও যদি এ-সম্পর্কে চিন্তা করেন, তাহলে সুরাহা হতে পারে।

আপনার বিশ্বস্ত
সেন্ট সাইমন।

চিঠিতে তারিখ পড়েছে গ্রসভেনর ম্যানসনের, লেখা হয়েছে পালকের কলমে, খানদানি লর্ড মশাই ডান হাতের কড়ে আঙুলে এক ফোঁটা কালিও লাগিয়ে ফেলেছেন চিঠি ভঁজ করতে করতে, বলল হোমস।

এখন তিনটে বাজে। চারটের সময়ে আসবেন লিখেছেন।

সেই ফাঁকে বিষয়টা একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক, ম্যান্টলপিস থেকে লাল মলাট দেওয়া একটা বই পেড়ে আনল হোমস। পাতা উলটে বললে, এই তো ডিউক অফ ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট ওয়ালসিংহ্যাম দ্য ভেরে সেন্ট সাইমন। হুম! বয়স একচল্লিশ, বিয়ের বয়স। কলোনি শাসনব্যবস্থায় আন্ডার সেক্রেটারি ছিলেন। পররাষ্ট্র দপ্তরে সেক্রেটারি ছিলেন ওঁর পিতৃদেব। ধমনীতে আছে বাপ পিতামহের প্লান্টাজেনেট রক্ত, বিয়ের সুত্রে তাতে মিশেছে টিউডর রক্ত। খুব একটা কিছু জানা গেল না এ থেকে। ওয়াটসন, খবরের কাগজে কী দেখেছ বল তো?

কয়েক হপ্তা আগে মর্নিংপোস্টে প্রথম নোটিশটা বেরোয় পার্সোনাল কলমে। লিখেছে, জোর গুজব, সানফ্রান্সিসকো নিবাসী মি. অ্যালয়সিয়াস ডোরানোর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হতে চলেছে ডিউক অফ ব্যালমোরালের দ্বিতীয় পুত্র লর্ড রবার্ট সাইমনের।

আগুনের দিকে লম্বা ঠ্যাং ছড়িয়ে হোমস বললে, বড় কাটছাঁট ছছাট্ট খবর।

গত হপ্তার শেষের দিকেও একটা খবর বেরিয়েছিল। শোনো :

খোলা বাজারের বিয়ের নীতির ফলে আমাদের দেশের জিনিসই পাচার হয়ে যাচ্ছে বাইরে। এ নিয়ে আইনকানুন করা দরকার। ব্রিটেনের খানদানি ফ্যামিলিতে হামেশাই বউ হয়ে আসছে সাগরপারের সুন্দরীরা। সর্বশেষ ঘটনাটি ঘটেছে লর্ড সেন্ট সাইমনের ক্ষেত্রে। এত বছর বীরবিক্রমে আইবুড়ো থাকার পর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার কোটিপতি-কন্যা হ্যাটি ডোরানের কটাক্ষ বিদ্ধ হয়েছেন। বিয়ে পর্যন্ত ঠিক হয়ে গেছে, যৌতুক ছয় অঙ্ক ছাড়িয়ে যাবে। ডিউক অফ ব্যালমোরালের ট্যাক যে গড়ের মাঠ, সে-খবরও দেশসুদ্ধ লোক জেনে গেছে। গত ক-বছর ধরে নিজস্ব ছবি বিক্রি করে সংসার চালিয়েছেন ভদ্রলোক। বার্চমুরের ছোট্ট সম্পত্তি ছাড়া লর্ড সেন্ট সাইমনেরও কপালে কিছু জোটেনি। কাজেই বিয়ের ফলে লাভের কড়ি কেবল ক্যালিফোর্নিয়ার সুন্দরীই পাবেন না–লর্ড সেন্ট সাইমনও বর্তে যাবেন।

হাই তুলে হোমস বললে, আর কিছু আছে নাকি?

আছে। সেন্ট জর্জ গির্জায় সাদাসিধেভাবে বিয়ে হবে–খবর দিয়েছে মর্নিং পোস্ট। জনাছয়েক অন্তরঙ্গ বন্ধু কেবল নিমন্ত্রিত হবেন। বিয়ের পর ল্যাঙ্কাস্টার গেটের বাড়িতে যাবেন মি. ডোরান। দু-দিন পরে–মানে গত বুধবার আর একটা খবর বেরিয়েছে বিয়ে

হয়ে গেছে। বর-বউ হানিমুন করতে যাবেন লর্ড ব্যাকওয়াটারের বাড়িতে। কনে অদৃশ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত এই হল গিয়ে সব খবর।

কীসের আগে পর্যন্ত? সচমকে বলল হোমস।

লেডি সাইমন অদৃশ্য হওয়ার আগে পর্যন্ত।

অদৃশ্য হলেন কবে?

বিয়ের ব্রেকফাস্ট খেতে খেতে।

আচ্ছা! রীতিমতো ইন্টারেস্টিং আর নাটকীয় মনে হচ্ছে।

এ-রকম ঘটনা বড়ো একটা ঘটে না।

বিয়ের আগে অদৃশ্য হওয়ার ঘটনা আছে, এমনকী হানিমুনের সময়েও সটকান দেয় অনেকে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি তো কেউ পালায় না। একটু খুঁটিয়ে বল শুনি।

গতকাল সকালে কাগজে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে শোনো। শিরোনাম হল হালফ্যাশনের বিয়ের আসরে অভূতপূর্ব কাণ্ড!

লর্ড সেন্ট সাইমনের বিয়ে নিয়ে টি-টি পড়ে গেছে শহরে। কিছুতেই আর ধামাচাপা দেওয়া যাচ্ছে না।

সেন্ট জর্জ চার্চে মোট ছ-জনের উপস্থিতিতে বিয়ে হয়ে যায় দুজনের। গির্জে থেকে বেরিয়ে ল্যাঙ্কাস্টার গেটে মি. ডোরানের বাড়িতে সবাই যান। এইসময়ে মিস ফ্লোরা মিলার নামে এক নর্তকী হাঙ্গামার সৃষ্টি করে। লর্ড সাইমনের ওপর নাকি তার দাবি আছে। বাড়ির মধ্যেও ঢোকবার চেষ্টা করে কিন্তু ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

এই হাঙ্গামা শুরু হওয়ার আগে লেডি সাইমন বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন। প্রাতরাশ খেতেও বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ শরীর খারাপ বলে উঠে যান। অনেকক্ষণ তাঁকে না-দেখে মি. ডোরান মেয়ের ঘরে গিয়ে আর তাকে দেখতে পাননি। কনের পরিচারিকা বলেছে, কোট আর টুপি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছেন লেডি সাইমন। মি. ডোরান তৎক্ষণাৎ পুলিশে খবর দেন। তদন্ত চলছে। নর্তকী মিস ফ্লোরা মিলারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে লেডি সাইমনের অন্তর্ধানের পেছনে নিশ্চয় তার হাত আছে।

ওয়াটসন, সব শোনবার পর বললে শার্লক হোমস, কেসটা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে হাজার প্রলোভনেও এ-কেস হাতছাড়া করতে আমি রাজি নই। দরজায় ঘণ্টা বাজছে। চারটেও বেজে গেছে। খানদানি মক্কেলটি এসে গেছেন নিশ্চয়।

ক্ষণপরেই ছোকরা চাকরের পেছন পেছন ঘরে প্রবেশ করলেন লর্ড সেন্ট সাইমন। বয়স যা-ই হোক না কেন, ঈষৎ হাঁটু বেঁকিয়ে কোলকুঁজো হয়ে হাঁটার দরুন একটু বয়স্কই

মনে হয়। টুপি খোলার পর দেখা গেল চুলে পাক ধরেছে। ব্রহ্মতালুর চুল পাতলা হয়ে এসেছে। সাজগোজে শৌখিনতা আছে। ডান হাতে সোনার চশমার সুতো ধরে দোলাতে দোলাতে ঘরে ঢুকলেন প্রকৃতই অভিজাত কায়দায়। হুকুম করার জন্যেই যেন তিনি জন্মেছেন।

অভিবাদন বিনিময়ের পর লর্ড বললেন, মি. হোমস আপনি অনেকের কেস নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন, কিন্তু আমি যে-মহলের মানুষ, সে-মহল থেকে বোধ হয় আমিই প্রথম।

তারও ওপরের মহল থেকে আসা হয়ে গেছে। তিনি ছিলেন একটা দেশের রাজা। সেদিক দিয়ে বলতে পারেন আমার দর কমছে।

বলেন কী! কোথাকার রাজা?

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার!

সর্বনাশ! তারও কি বউ নিখোঁজ হয়েছিল?

মাফ করবেন। গোপনীয়তা রক্ষা করা আমার পেশার ধর্ম। আপনি বরং বলুন খবরের কাগজে এই যে-খবরটা বেরিয়েছে, এটা ঠিক কি না।

কনের অন্তর্ধান সম্পর্কিত সংবাদে চোখ বুলিয়ে লর্ড সাইমন বললেন, ঠিক।

মিস হ্যাটি ডোরানকে প্রথম কবে দেখেন?

এক বছর আগে সানফ্রান্সিসকোয়।

যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

বিয়ের কথা পাকাঁপাকি হয়েছিল কি তখনই?

না।

কিন্তু বন্ধুত্ব নিবিড় হয়েছিল?

পরস্পরকে ভালো লাগত বলতে পারেন।

ওর বাবা খুব বড়োলোক?

প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে ভদ্রলোক বলতে যে ক-জন আছেন, উনি তাদের পকেটে পুরে রাখতে পারেন।

এত টাকা করলেন কী করে?

খনির কাজে। বছর কয়েক আগে কানাকড়িও ছিল না। তারপর সোনার খোঁজ পেয়ে রাতারাতি লাল হয়ে গেলেন।

আপনার স্ত্রী-র চরিত্র কীরকম?

হাতের চশমা আরও জোরে দুলিয়ে আগুনের পানে তাকিয়ে বললেন খানদানি ভদ্রলোক, স্ত্রীর বয়স যখন বিশ, তখন পর্যন্ত খনি নিয়েই মেতে থেকেছেন আমার শ্বশুর–বড়োলোক হননি। তাঁবুতে রাত কাটিয়েছে, পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরেছে শিক্ষা পেয়েছে প্রকৃতির পাঠশালায় স্কুলে নয়। ইংলন্ডে যাদের আমরা টম বয় অর্থাৎ গেছো মেয়ে বলি, সে তাই। প্রকৃতি দুর্দান্ত, স্বাধীনচেতা, কোনো সংস্কারের বালাই নেই। খুদে আগ্নেয়গিরি বললেও চলে–আবেগ চেপে বসলে আর তর সয় না। মনস্থির করে তুড়ি মেরে, সেই অনুযায়ী কাজ করে তৎক্ষণাৎ অন্তরে তার আভিজাত্য দেখেছিলাম বলেই আমার নামের মর্যাদা তাকে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলাম। আমি জানি সে নিজেকে বলি দেবে, তাও ভালো কিন্তু মর্যাদা যায় এ-রকম কিছুই করবে না।

কাছে ফটো আছে?

সঙ্গেই এনেছি, বলে একটা লকেট বাড়িয়ে দিলেন লর্ড। লকেটের মধ্যে হাতির দাঁতের ওপর পরমাসুন্দরী একজন তরুণীর মুখশ্রী অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন শিল্পী। নিবিড় কৃষ্ণচক্ষুর পানে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে লকেট ফিরিয়ে দিল হোমস।

বলল, ইনি লন্ডনে এলে নতুন করে অন্তরঙ্গতা আরম্ভ হয়। তাই তো?

ওর বাবা ওই কারণেই ওকে এনেছিলেন এখান। বিয়ের কথাও পাকা হয়ে যাবার পর বিয়ে পর্যন্ত হয়ে গেল। তারপর–

যৌতুকের টাকা পেয়ে গেছেন?

ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। খোঁজখবরও করিনি।

বিয়ে যেদিন হয়, তার আগের দিন দেখা হয়েছিল মিস ডোরানের সঙ্গে?

হ্যাঁ!

মেজাজ সরস ছিল কি?

ও-রকম খুশি চনমনে আর কখনো দেখিনি।

বিয়ে যেদিন হল, সেদিন সকালে মেজাজ কীরকম দেখলেন?

অত্যন্ত ভালো। বিয়ে শেষ না-হওয়া পর্যন্ত।

তারপর বুঝি মেজাজে চিড় লক্ষ করেছিলেন?

তা... হ্যাঁ, সেই প্রথম ওকে একটু অস্থির অবস্থায় দেখেছিলাম। সামান্যই ব্যাপার।

হোক সামান্য, বলুন আমাকে।

বেদির দিকে যাওয়ার সময়ে ফুলের তোড়াটা পড়ে যায় ওর হাত থেকে। এক ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ সেটা তুলে দিল ওর হাতে। তোড়ার ক্ষতি হয়নি–অথচ কথাটা জিজ্ঞেস করতেই একটা অসংলগ্ন জবাব দিল। বাড়ি ফেরার সময়ে গাড়ির মধ্যে মনে হল বেশ উত্তেজিত হয়ে রয়েছে সামান্য এই ব্যাপারে।

গির্জের মধ্যে তাহলে বাইরের লোক ছিল?

তা তো থাকবেই। গির্জে খোলা থাকলে ঘাড় ধরে কাউকে বার করে তো দেওয়া যায় না।

ভদ্রলোক লেডি সাইমনের বন্ধু কি?

কী যে বলেন! ভদ্রলোক বললাম ভদ্রতার খাতিরে। চেহারা একেবারেই সাদামাটা। ভালো করে তাকিয়েও দেখিনি।

লেডি সাইমন তাহলে গির্জেতে গেছিলেন মনের আনন্দ নিয়ে। বেরিয়ে এসেছিলেন মন খারাপ করে। বাড়ি এসে কী করলেন?

ঝিয়ের সঙ্গে কথা বলছিল।

কে সে?

নাম তার অ্যালিস। আমেরিকান মেয়ে। ওর সঙ্গেই এসেছে বাপের বাড়ি থেকে।

খুব মাই ডিয়ার ঝি বুঝি?

খুবই। বড্ড আশকারা পাওয়া ঝি। আমেরিকায় এসব ওরা বরদাস্ত করে, এখানে চলে না।

কতক্ষণ কথা বললেন ঝি-য়ের সঙ্গে?

মিনিট কয়েক।

কী কথা শুনেছিলেন?

গাঁইয়া ভাষায় কী যেন বলছিল লেডি সাইমন। জাম্পিং এ ক্লেম শব্দগুলো কেবল কানে এসেছিল। মানে বুঝিনি।

আমেরিকার গাঁইয়া ভাষায় অনেক মানে থাকে কিন্তু। তারপর উনি কী করলেন?

প্রাতরাশের টেবিলে গেলেন।

আপনার বাহুলগ্না হয়ে?

না। মিনিট দশেক থেকে উঠে পড়ল। বেরিয়ে গেল। আর আসেনি।

ঝি-টি কিন্তু এজাহারে বলেছে, ঘরে গিয়ে কোট আর টুপি নিয়ে বেরিয়েছেন লেডি সাইমন!

ঠিকই বলেছে। এর ঠিক পরে হাইড পার্কে ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে তাকে হাঁটতে দেখা গেছে। সেই ফ্লোরা মিলার যে বাড়ি বয়ে এসে মামলা জুড়েছিল।

ফ্লোরা মিলারের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কীরকম, একটু খুলে বলবেন?

ভুরু কুঁচকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে লর্ড সাইমন বললেন, বছর কয়েক একটু যোগাযোগ ছিল– বান্ধবী বলতে পারেন। আদরের বান্ধবী। কিন্তু মেয়েরা আশকারা পেলে মাথায় উঠে যায়। আমার বিয়ের খবর পেয়ে যাচ্ছেতাই চিঠি লিখতে শুরু করলে। তখনই জানতাম, বিয়ের সময়ে হট্টগোল করতে পারে, আমার মুখে চুনকালি দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। হলও তাই। শ্বশুরবাড়িতে জোর করে ঢুকতে গেছিল, আমার স্ত্রী-র বাপান্তও করেছিল। কিন্তু আমি সাদা পোশকি দুজন পুলিশ মোতায়েন রেখেছিলাম দরজায়, এইরকম কিছু একটা হবে আঁচ করে। তারাই বের করে দেয় ওকে।

লেডি সাইমন শুনেছিলেন ধাক্কাধাক্কির ঘটনা?

না।

অথচ তাঁর সঙ্গেই ফ্লোরা মিলারকে হাইড পার্কে দেখা গেছে?

মি. লেসট্রেড সেই কারণেই সন্দেহ করেছেন ফ্লোরাই ষড়যন্ত্র করে সরিয়েছে লেডি সাইমনকে।

আপনার কি তাই মনে হয়?

না। সামান্য একটা মাছিকেও যে মারতে চায় না, তার পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়। ফ্লোরা নির্দোষ। ঈর্ষায় মানুষ পালটে যায়।

দেখুন, আমার মনে হয় হঠাৎ এইরকম উঁচুদরের খেতাব পেয়ে, সমাজের উঁচু মহলের একজন হয়ে গিয়ে লেডি সাইমন মাথার ঠিক রাখতে পারেননি বলেই আমার বিশ্বাস।

বেসামাল অবস্থা, এই তো?

তা ছাড়া আর কী? হাপিত্যেশ করে থেকেও অনেকে যা পায়নি–ও তা সহজেই পেয়ে যখন চলে গেছে তখন ওকে অপ্রকৃতিস্থ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি?

হাসল হোমস। বলল, আশ্চর্য কিছু নয়। এখন আর একটা প্রশ্ন। আপনি প্রাতরাশের টেবিলে যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকে জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যাচ্ছিল কি?

রাস্তার উলটো দিক আর পার্কের খানিকটা দেখতে পাচ্ছিলাম।

ঠিক বলেছেন। তাহলে আর আপনাকে আটকে রাখব না। আমিই খবর দেব আপনাকে।

উঠে দাঁড়ালেন লর্ড, রহস্য ভেদ করতে পারবেন তো?

রহস্যভেদ হয়ে গেছে।

অ্যাঁ! কী বললেন?

বললাম যে, রহস্যভেদ হয়ে গেছে।

বলুন তাহলে আমার বউ কোথায়?

সেটা শিগগিরই জানব।

আমার তো মনে হয় আপনার বা আমার দ্বারা এ-রহস্যভেদ হবে না–আরও পাকা মাথা দরকার। সেকেলে খানদানি ঢংয়ে বাতাসে মাথা ঠুকে অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন লর্ড।

হাসতে লাগল শার্লক হোমস।

বলল, যাক, আমার মাথাকে লর্ড মশায় নিজের মাথার স্তরে ফেলে সম্মান তো দিলেন। ওহে, জেরা তো অনেক হল, এবার একটু হুইস্কি-সোডা-চুরুটের সদ্ব্যবহার করা যাক। মক্কেল ভদ্রলোক ঘরে ঢোকবার আগেই কিন্তু রহস্য ভেদ করে বসেছিলাম আমি।

মাই ডিয়ার হোমস!

এ-রকম ঘটনার সুরাহা এর আগেও করেছি–তবে এত ঝটপট করিনি। আরে! আরে! লেসট্রেড যে! কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! বসে পড়ো! পাশের টেবিল থেকে গেলাস নাও, চুরুট পাবে এই বাক্সে।

কালো ক্যানভাস ব্যাগ হাতে ঘরে ঢুকল সরকারি গোয়েন্দা। পরনে মোটা পশমি জ্যাকেট আর গলাবন্ধ। অবিকল নাবিকদের মতো দেখাচ্ছে।

লেসট্রেড, চোখ নামিয়ে বললে হোমস, এত মনমরা কেন?

দুর মশাই! চুরুট ধরিয়ে বললে লেসট্রেড, সেন্ট সাইমনের ছাতার বিয়ে নিয়ে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে গেলাম।

বল কী হে!

সূত্র-টুত্রগুলো সব পাঁকাল মাছের মতো পিছলে যাচ্ছে।

ভিজলে কী করে?

জাল ফেলতে গিয়ে। সার্পেন্টাইনে জাল ফেলে দেখছিলাম লেডি সাইমনের ডেডবডি পাওয়া যায় কি না।

অ্যাঁ! বলে চেয়ারে এলিয়ে পড়ে পেট ফাটা হাসি হাসতে লাগল হোমস।

হাসতে হাসতেই বললে, ট্রাফালগার স্কোয়ারের ফোয়ারায় জাল ফেললে না কেন?

তার মানে?

ডেডবডি পাওয়ার সম্ভাবনা দু-জায়গাতেই সমান।

কটমট করে তাকিয়ে লেসট্রেড বললে, অনেক কিছু জেনে বসে আছেন মনে হচ্ছে?

খবরটা শোনার সঙ্গেসঙ্গে জানা হয়ে গেছে।

সার্পেন্টাইনে জাল ফেলার সঙ্গে এ-রহস্যের কোনো সম্পর্ক নেই বলতে চান?

আদৌ নেই।

এগুলো তাহলে কী,বলতে বলতে ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে জলে চুপসোনোকনের পোশাক, জুতো, মালা, ওড়না আর একটি আংটি বার করল লেসট্রেড। দেখি এই ধাঁধার সমাধান করেন কী করে।

জাল ফেলে তুললে মনে হচ্ছে?নীল ধূম্রবলয় শূন্যে উড়িয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে বন্ধুবর।

আজ্ঞে না। তিক্ত স্বর লেসট্রেডের।জলে ভাসছিল, দারোয়ান দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে। বিয়ের পোশাক যেখানে পাওয়া গেছে, কনে বউকেও সেখানে পাওয়া যাবে, এই আশায় জালটা ফেলা হয়েছিল।

অপূর্ব যুক্তি! এই যুক্তির বশেই সব মানুষকেই তাদের জামাকাপড় রাখার আলমারির কাছে পাওয়া উচিত।

আমি কিন্তু এই জামাকাপড় থেকেই প্রমাণ করে ছাড়ব ফ্লোরা মিলারের হাত আছে লেডি সাইমনকে সরিয়ে দেওয়ার পেছনে।

পারবে না, লেসট্রেড, পারবে না।

পারব না? সাংঘাতিক ভুল করে বসলেন কিন্তু মি. হোমস। ফ্লোরা মিলারকে ফাঁসানোর প্রমাণ এই পোশাকেই আছে।

কীরকম?

বিয়ের পোশাকের পকেটে একটা কার্ডের বাক্স পাওয়া গেছে। তার মধ্যে পেয়েছি এই চিরকুটটা। শুনুন কী লেখা আছে :

দেখা করো। এখুনি এসো।
এফ.এইচ.এম.

এ থেকে কি বোঝা যায় না ফ্লোরা মিলারই জপিয়ে নিয়ে গেছে লেডি সাইমনকে? চিঠিখানা গির্জেতে ঢোকার সময়ে পাচার করা হয়েছিল ওঁর হাতে।

চমৎকার! অতীব চমৎকার! তাচ্ছিল্যের সঙ্গে চিরকুটটা হাতে নিল শার্লক হোমস। চোখ বুলানোর সঙ্গেসঙ্গে কিন্তু পালটে গেল চোখ-মুখের চেহারা। নিমেষে তিরোহিত হল ঔদাসীন্য, সে-জায়গায় আবির্ভূত হল নিঃসীম কৌতূহল। বলল চকিত কণ্ঠে, আরে! এ যে দেখছি সত্যিই কাজের জিনিস।

পথে আসুন।

এসে গেছি। অভিনন্দন রইল, লেসট্রেড।

বুক ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আঁতকে ওঠে সরকারি গোয়েন্দা।

আরে মশাই, উলটো দিক দেখছেন কেন?

উলটো কী হে, ওইটাই তো সোজা দিক।

মাথা-টাথা খারাপ হল নাকি আপনার? চিঠি তো এ-পিঠে লেখা।

আর ও-পিঠে লেখা একটা খরচের বিল। দারুণ ইন্টারেস্টিং।

আগেই দেখেছি, কি নেই ওর মধ্যে। চৌঠা অক্টোবর ঘর ভাড়ার জন্যে ৮ শিলিং, প্রাতরাশের জন্য আড়াই শিলিং, ককটেলের জন্যে ১ শিলিং, লাঞ্চের জন্যে আড়াই শিলিং আর এক তোলা শেরি মদের জন্যে ৮ পেন্স খরচ করা হয়েছে। এই তো?

আরে হা, ওর মধ্যেই তো সব কিছু। চিরকুটটাও কম দরকার নয়–নামের আদ্যাক্ষরগুলো কাজে লাগবে।

দেখুন মশায়, আমি হাড়ভাঙা খাটতে ভালোবাসি–আগুনের ধারে আরামে বসে কল্পনাবিলাস আমাকে মানায় না। চললাম, দেখি কে আগে রহস্য ভেদ করে, গজ গজ করতে করতে ভিজে জামাকাপড়গুলো ব্যাগে পুরে নিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল লেসট্রেড। পেছন থেকে চিৎকার করে হোমস বললে, ওহে একটা কথা শুনে যাও। লেডি সাইমন বলে কেউ নেই, ছিলও না।

তারপর তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরিয়ে গেল শার্লক হোমস।

এক ঘণ্টা পরে খাবারের দোকান থেকে লোকজন এসে চমৎকার একটা নৈশভোজ সাজিয়ে দিয়ে গেল খাবার টেবিলে। বলে গেল টাকাপয়সা আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

রাত নটার সময়ে ফিরল হোমস। মুখ গম্ভীর। চোখ উজ্জ্বল। অর্থাৎ সান্ধ্য অভিযান ব্যর্থ হয়নি।

সোৎসাহে বললে, যাক, খাবার দিয়ে গেছে তাহলে।

পাঁচজনের খাবার দেখছি। অতিথি আসছেন নাকি?

হ্যাঁ। লর্ড সেন্ট সাইমন বোধ হয় এসে গেলেন।

উল্কাবেগে ঘরে ঢুকলেন লর্ড মশায়। ভীষণ বিচলিত মুখে বললেন, এই যে মি. হোমস।

চিঠি তাহলে পেয়েছেন?

তা তো পেয়েছি। কিন্তু যা লিখেছেন, তা কি জেনে লিখেছেন?

মনে তো হয়।

ধপ করে চেয়ারে দেহভার এলিয়ে দিলেন লর্ড সাইমন। কপাল চাপড়ে বললেন, এই অপমানের কাহিনি ডিউকের কানে পৌঁছেলে ওঁর মনের অবস্থাটা কী হবে ভাবতে পারেন?

অপমান বলে ধরছেন কেন–নেহাতই একটা দুর্ঘটনা। ঝোকের মাথায় কাজটা করে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। এ ছাড়া, ওঁর সামনে অন্য পথ ছিল কি?

টেবিল বাজিয়ে চিৎকার করে উঠলেন লর্ড, আপনি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতে চাইছেন। কিন্তু পাঁচজনের সামনে আমার মাথা হেঁট করা কি হয়নি বলতে চান?

ভদ্রমহিলার অবস্থাটাও একটু ভাবুন।

কারো কথা ভাববার দরকার নেই আমার। অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করা হয়েছে আমার সঙ্গে।

উৎকর্ণ হয়ে হোমস বললে, ওঁরা বোধ হয় এসে গেলেন। লর্ড সাইমন, আমি একজন আইনবিদের সঙ্গে কথা বলে এসেছি–তিনি এ-ব্যাপারে ফয়সালা করে দেবেন। আসুন।

ঘরে ঢুকলেন একজন ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক। সঙ্গেসঙ্গে চেয়ার ছেড়ে ছিটকে গিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন লর্ড মশায়।

হোমস বললে, আলাপ করিয়ে দিই। মিস্টার অ্যান্ড মিসেস ফ্রান্সিস হে মুল্টন। মিসেসকে অবশ্য আগেই চেনেন।

মিসেস মূল্টন এগিয়ে গেলেন লর্ডের সামনে। তিনি পকেটে হাত পুরে মুখ ফিরিয়ে রইলেন অন্যদিকে।

মিনতি মাখানো কণ্ঠে ভদ্রমহিলা বললেন, রবার্ট, আমি দুঃখিত।

দুঃখ প্রকাশের কোনো দরকার নেই।

তোমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল আমার। কিন্তু ফ্র্যাঙ্ককে দেখে আর মাথার ঠিক রাখতে পারিনি। অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাইনি এই যথেষ্ট।

আগন্তুক ভদ্রলোক বেশ চটপটে, শানিত মুখচ্ছবি, গায়ের রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গিয়েছে। বললেন, ব্যাপারটা বড্ড বেশি গোপন করা হয়েছিল বুঝতে পারছি।

ভদ্রমহিলা বললেন, তাহলে আমিই বলছি আমাদের কাহিনি। ১৮৮৪ সালে ম্যাককোয়ারের ক্যাম্পে ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। জায়গাটা রকি পাহাড়ের

ধারে–বাবা খনির কাজ নিয়ে মেতে ছিল ওখানে। ঠিক করলাম আমরা বিয়ে করব। তারপরেই সোনা পেয়ে বাবা বড়োলোক হয়ে গেল–আর কিছুই না-পেয়ে ফ্র্যাঙ্ক দিনকে দিন গরিব হতে লাগল। বাবা বিয়ে দিতে রাজি হল না। আমাকে নিয়ে ফ্রিস্কোয় চলে এল। আমরা কিন্তু লুকিয়ে দেখাসাক্ষাৎ চালিয়ে গেলাম, বিয়ে পর্যন্ত সেরে নিলাম ঠিক হল যদ্দিন না ভাগ্য ফিরছে, তদ্দিন খোলাখুলিভাবে আমার বর হিসেবে নিজের পরিচয় ও দেবে না। কিন্তু কেউ কাউকে ভুলব না।

ও গেল ভাগ্য অন্বেষণে, আমি গেলাম বাবার কাছে। তারপর নানান জায়গা থেকে ফ্র্যাঙ্কের কয়েকটা খবর পেলাম। শেষ খবরটা এল সাংঘাতিক। রেড ইন্ডিয়ানরা একটা তাবু আক্রমণ করে অনেক অভিযাত্রীকে খতম করেছে, তাদের মধ্যে ফ্র্যাঙ্কও আছে।

এক বছর পথ চেয়ে রইলাম। কোনো খবরই যখন পেলাম না, বুঝলাম সত্যিই ও আর নেই। শরীর ভেঙে গেল। বাবা দুনিয়ার ডাক্তার এনে চিকিৎসা করাল। এই সময়ে দেখা হল লর্ড সাইমনের সঙ্গে।

লন্ডনে এলাম। বিয়ের দিন কিন্তু বেদিতে উঠতে যাওয়ার আগেই সিঁড়ির প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দেখলাম স্বয়ং ফ্র্যাঙ্ককে। ভাবলাম বুঝি ফ্র্যাঙ্কের প্রেতমূর্তি। পুরুতঠাকুরের বিয়ের মন্ত্র কানে ঢোকেনি–সম্মোহিতের মতো ভেবেছি, এ কি সত্যি? হয়তো তখুনি একটা কেলেঙ্কারি করে বসতাম যদি না ফ্র্যাঙ্ক আঙুল নেড়ে আমাকে স্থির থাকতে ইশারা করত। তারপর দেখলাম একটা কাগজে চিঠি লিখছে। যাওয়ার সময়ে ইচ্ছে করে ফুলের তোড়া ফেলে দিলাম–ও তুলে দিল, সেইসঙ্গে চিঠিটা।

চিঠির মধ্যেই নির্দেশ পেলাম কী করতে হবে। আমার স্বামীর নির্দেশ।

বাড়ি গেলাম। অ্যালিসকে সব বললাম। কোট আর টুপি নিয়ে পালিয়ে গেলাম। ঠিক করেছিলাম, সব কথাই লর্ড সাইমনকে পরে বলব–ওই অবস্থায় নিকট আত্মীয় অভ্যাগতদের সামনে বলা সংগত বোধ করিনি।

মিস্টার মুল্টন বললেন, বিয়ের খবরটা একটা কাগজে পড়েই দৌড়ে এসেছি–শুধু গির্জার ঠিকানা পেয়েছিলাম–ওর বাড়ির ঠিকানা পাইনি।

মিসেস মুল্টন কথার খেই নিয়ে বললেন, ফ্র্যাঙ্ক চেয়েছিল সব কথা সবাইকে বলা হোক। আমি কিন্তু ভয়ে লজ্জায় পেছিয়ে এলাম। একঘর লোককে টেবিলে বসিয়ে এসেছি, ফিরব কী মুখে? তাই ঠিক করলাম একেবারেই উধাও হয়ে যাব। বাবাকে কেবল এক লাইন লিখে জানিয়ে দিলাম–আমি মরিনি, বেঁচে আছি। ফ্র্যাঙ্ক আমার জামাকাপড় আংটি পুটলি বেঁধে কোথায় যেন ফেলে এল। কালকেই প্যারিস রওনা হওয়ার কথা আমাদের। এমন সময়ে এই ভদ্রলোক হোমসকে দেখিয়ে, কী করে যেন আমাদের ঠিকানা জোগাড় করে হাজির হলেন বাড়িতে। বুঝিয়ে বললেন, না-বলে চলে আসাটা অন্যায় হয়েছে, একেবারেই চলে যাওয়াটা আরও বড়ো ভুল হবে। উনি বললেন, লর্ড সাইমনের সঙ্গে নিরালা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন যাতে সব খুলে বলতে পারি। তাই এসেছি। রবার্ট, তোমাকে আঘাত দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করো। নীচ মনে কোরো না।

মুখ চোখ একইরকম কঠোর রেখে সব শুনলেন লর্ড সাইমন। কিন্তু ক্ষমা করলেন না মিসেস মুল্টনকে।

বললেন, ঘরের কেচ্ছা নিয়ে পরের সামনে আলোচনা করতে আমি চাই না।

ক্ষমা না-কর, হ্যান্ডশেক তো করবে?

তোমাকে খুশি করার জন্যে সেটুকু করা যেতে পারে, বলে নিরুত্তাপ ভঙ্গিমায় করস্পর্শ করলেন মিসেস মুল্টনের।

লর্ড সাইমন, বললে হোমস, খেয়ে যাবেন কিন্তু।

ধন্যবাদ। বড্ড বেশি আশা করে ফেলেছেন। ব্যাপারটা ফুর্তি করার মতো নয় আমার কাছে। গুড নাইট।

কাষ্ঠ ভঙ্গিমায়, বাতাসে মাথা ঠুকে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন লর্ড সেন্ট সাইমন।

তাহলে আসুন আমরাই বসি টেবিলে। আমেরিকানদের আমি ভালোবাসি, মিস্টার মুল্টন। আসুন।

অতিথি বিদায় করার পর হোমস বললে, যে-কেস গোড়ায় বেশি দুর্বোধ্য মনে হয়, সে-কেস শেষে ততই সহজ হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম থেকে দুটো ব্যাপার আমার কাছে খুব পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। এক, বিয়েতে ইচ্ছা ছিল ভদ্রমহিলার। দুই, বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরেই বিয়েতে অরুচি দেখা গিয়েছে। মাঝখানে তাহলে এমন কিছু ঘটেছে যে মন পালটে গেছে। কী ঘটতে পারে? কাউকে দেখেছেন কি? যদি কাউকে দেখে থাকেন, নিশ্চয় সে আমেরিকান–কেননা দীর্ঘদিন আমেরিকাতেই থেকেছেন তিনি এদেশের স্বল্পবাসে এমন কেউ ঘনিষ্ঠ হতে পারে না যে ব্যক্তির এত অল্প সময়ের মধ্যে বিয়েতে অরুচি জন্মাতে পারে। তাহলে সে কে? পুরোনো প্রেমিক না, প্রথম স্বামী? যৌবন যার পাহাড় পর্বতে দামালপনার মধ্যে কেটেছে, এ-রকম অতীত তার জীবনে বিচিত্র নয়। গির্জায় সেই সাদামাটা লোকটার কথা তাহলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ফুলের তোড়া সে-ই তো তুলে দিয়েছিল, তারপর থেকেই মেজাজ অন্যরকম হয়ে গিয়েছিল কনে বউয়ের, বাড়ি ফিরে বাপের বাড়ির ঝিকে বলেছেন, জাম্পিং এ ক্লেম। আমেরিকার খনি অঞ্চলের ভাষায় কথাটার মানে হল, যার দাবি আগে, সে নিক আগে। ব্যস, পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা।

কিন্তু ঠিকানা জোগাড় করলে কীভাবে?

এই একটি ব্যাপারে লেসট্রেড আমাকে সাহায্য করেছে–নইলে মুশকিলে পড়তাম। কাগজটা দেখেই বুঝলাম, ভদ্রলোক গত সাতদিনের মধ্যে লন্ডনের খানদানি একটি হোটেলে উঠেছেন। নামের আদ্যক্ষর পাওয়ায় তাঁকে খুঁজে বার করা আরও সহজ হল।

কিন্তু পেলে কী করে হোটেলটা?

আগুন-দাম দেখে। ওই দামের খাবারদাবার বা ঘরভাড়া লন্ডনের খুব কম হোটেলেই হয়। খুঁজতে খুঁজতে ঠিক পেয়ে গেলাম।

যাঁর জন্যে এত করলে, সেই লর্ড মশায়টি কিন্তু খুব একটা ভালো ব্যবহার করে গেলেন। দরাজ হতে পারলেন না।

হেসে ফেলল হোমস।

বলল, ভায়া ওয়াটসন, যুগপৎ বউ আর যৌতুক হারালে তুমিও কি খুব একটা ভালো ব্যবহার করতে পারতে? দরাজ হতে পারতে? লর্ড সাইমনকে সেইদিক থেকেই বিচার করা উচিত, কৃপা করা উচিত। যাক, বেহালাটা দাও, শরতের নিরানন্দ সন্ধে কাটানোর ওইটেই এখন একমাত্র দাওয়াই।

——————

টীকা

১. খানদানি আইডোর কীর্তিকাহিনি : দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য নোব্ল ব্যাচেলর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের এপ্রিল ১৮৯২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।

২. জিজেল বুলেট : আফগান বিদ্রোহীদের ব্যবহৃত বন্দুকের বুলেট।

৩. আহত প্রত্যঙ্গ : আহত প্রত্যঙ্গ কোনটি? একবার ওয়াটসন বলেছিলেন গুলি লেগেছিল কাঁধে। পরে হোমসের কথায় জানা যায় ওয়াটসনের হাতে আঘাত লেগেছিল। আবার কখনো আহত পা-এর কথা শোনা গিয়েছে।

৪. লর্ড সেন্ট সাইমনের : রবার্ট সেন্ট সাইমন যেহেতু ডিউক অব ব্যালমোরালের মেজো ছেলে, বড়ো ছেলে নন, তাই তাঁর পরিচিত হওয়ার কথা লর্ড রবার্ট সেন্ট সাইমন নামে; লর্ড সেন্ট সাইমন হিসেবে নয়।

৫. গ্রসভেনর ম্যানসন : লন্ডন শহরে প্যালেস স্ট্রিট এবং ভিক্টোরিয়া স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত সাততলা বাড়ির ফ্ল্যাটের প্রতিটির ভাড়া সেকালে ছিল বছরে তিনশো পাউন্ড। বাড়িটি নির্মাণ শুরু হয় ১৮৫৮-তে। নির্মাণ শেষ হওয়ার সময়ে একটি ফ্ল্যাটও খালি ছিল না।

৬. লাল মলাট দেওয়া একটা বই : কোনো কোনো গবেষকের মতে এটি জেমস ই. ডয়েল সংকলিত পিয়ারেজ : দ্য অফিশিয়াল ব্যারোনেজ অব ইংলন্ড; কিংবা দ্য রেড বুক : অর কোর্ট অ্যান্ড ফ্যাশনেবল রেজিস্টার হওয়া সম্ভব।

৭. প্লান্টাজেনেট : ইংলন্ডেশ্বর দ্বিতীয় হেনরি (অভিষেক ১১৫৪ সালে) থেকে তৃতীয় রিচার্ড (মৃত্যু ১৪৮৫-তে) পর্যন্ত রাজাদের প্লান্টাজেনেট বংশীয় বলা হয়। রাজা প্রথম হেনরির মেয়ে রানি মার্টিলডা এবং কাউন্ট অব আনজাউ, জিওফ্রের বংশধররা হলেন প্লান্টাজেনেট। কাউন্টের টুপির শোভাবর্ধক প্লান্টা জেনিস্টা গাছের পাতা থেকে তার বংশধরদের এই নাম হয়েছে।

৮. টিউডর : ওয়েলস-এর টিউডর বংশীয় পাঁচজন শাসক ১৪৮৫ থেকে ১৬০৩ পর্যন্ত ইংলন্ডের সিংহাসনে বসেন। এঁরা হলেন সপ্তম হেনরি, অষ্টম হেনরি, ষষ্ঠ এডোয়ার্ড, প্রথম মেরি এবং প্রথম এলিজাবেথ। এঁরা হলেন পঞ্চম হেনরির বিধবা পত্নী ক্যাথরিন অব ভ্যালয় এবং ওয়েল টিউডরের বংশাবতংশ। ১৬০৩-এ প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যুর পর ইংলন্ডের সিংহাসন যায় স্টুয়ার্টদের হাতে।

৯. মর্নিং পোস্ট : প্রতিষ্ঠা ১৭৭২-এ। রাজপরিবারভুক্ত এবং খানদানি মানুষদের খবরাখবর প্রকাশে এই সংবাদপত্রের খ্যাতি ছিল। ১৮৮১-তে এই কাগজ পরিণত হয় রক্ষণশীল দলের মুখপত্রে। ১৯৩৭-এ ডেইলি টেলিগ্রাফের সঙ্গে মিলিত হয়।

১০. সানফ্রান্সিসকো : আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে, ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে অবস্থিত বন্দর-নগরী।

সেন্ট জর্জ গির্জা : জন জেমসের নকশায় ১৭২১ থেকে ১৭২৪-এ নির্মিত এই অ্যাংলিকান চার্চ বিখ্যাত এখানে অনুষ্ঠিত বহু স্মরণীয় বিবাহের জায়গা হিসেবে। পি. বি. শেলি, বেঞ্জামিন ডিজরেবিন, জর্জ মেরেডিথ, থিয়োডর রুজভেল্ট, জর্জ ইলিয়ট, প্রমুখের বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় এই গির্জায়।

১২. ল্যাঙ্কাস্টার গেট : হাইড পার্কের উত্তরে অবস্থিত সারিবদ্ধভাবে তৈরি বাসা-বাড়ি।

১৩. বিয়ের ব্রেকফাস্ট : ১৮৮৭-র আগে পর্যন্ত ইংলন্ডের আইনে বিবাহের অনুষ্ঠান সেরে ফেলতে হত মধ্যাহ্নের আগে। সেই থেকে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার প্রথা চালু হয়। পরে আইন বদল হলেও ব্রেকফাস্টের প্রথা রয়েই যায়।

১৪. স্ক্যান্ডিনেভিয়ার : শার্লক হোমসের সঙ্গে স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজপরিবারের যোগসুত্রর উল্লেখ পাওয়া যায় আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া এবং দ্য ফাইনাল প্রবলেম গল্পে।ব্ল্যাক পিটার গল্পেও হোমসের নরওয়ে যাওয়ার খবর পাওয়া যায়।

১৫. সার্পেন্টাইনে : হাইড পার্কের ভেতরে ১৭৩০-এ নির্মিত এই কৃত্রিম হ্রদ ব্যবহৃত হয় নৌকাবিহার এবং সাঁতার কাটার উদ্দেশ্যে। প্রথম দিকে এর জল আসত ওয়েস্টবোর্ন নামের ছোটো খাঁড়ি থেকে। পরে টেমস নদীর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটানো হয়।

১৬. ট্রাফালগার স্কোয়ার : ওয়েস্টমিনস্টারের ট্রাফালগার স্কোয়ার উৎসর্গীত ট্রাফালগারের যুদ্ধে মৃত ইংরেজ সেনাপতি লর্ড নেলসনের স্মৃতিতে। স্কোয়ারের উত্তরে পাশাপাশি দুটি ফোয়ারা আছে।

১৭. ফ্রিস্কো : সানফ্রান্সিসকো শহরের সংক্ষেপিত নাম।

১৮. রেড ইন্ডিয়ানরা একটা তাবু আক্রমণ করে অনেক অভিযাত্রীকে খতম করেছে : অ্যাপাচে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ জুড়ে। এই ঔপনিবেশিকদের অধিকাংশ ছিল খনিসন্ধানী। অন্যরা পশুপালন করতেন।

১৯. দেখলাম স্বয়ং ফ্র্যাঙ্ককে : ফ্রান্সিস হে মূল্টনকে হ্যাটি ডডারানের বাবা অ্যালসিয়াস ডোরান কেন চিনতে পারল না?

# ছদ্মবেশীর ছলনা

[এ কেস অফ আইডেনটিটি]

বেকার স্ট্রিটের আস্তানায় বসে আছি আমি আর হোমস। সামনে আগুনের চুল্লি।

হোমস বললে, ভায়া, কল্পনার রং কখনো বাস্তবের রঙের চেয়ে জোরদার হতে পারে না। আটপৌরে নাটক নভেল মাঠে মারা যাবে যদি জীবন থেকে তুলে নেওয়া সত্য ঘটনাকে সঠিকভাবে দেখা যায়।

আমি বললাম, আমার তাতে সন্দেহ আছে। কই, হাজার রং চড়িয়েও তো পুলিশ কোর্টের কেসগুলোকে নিছক কেলেঙ্কারির উর্ধ্বে তোলা যায় না?

সেটা হয় খুঁটিয়ে রিপোর্ট পেশ করার মতো মগজ নেই বলে। যা নজর কাড়ে না, তা এড়িয়ে যাওয়া বোকামি। তুচ্ছ বিষয়ের মধ্যেই বৃহৎ চমকে থাকে।

মেঝে থেকে দৈনিক সংবাদপত্রটা তুলে নিয়ে বললাম, তোমাকে ঘায়েল করার জন্যে একটা শুধু উদাহরণ দিচ্ছি। এই দেখ একটা কেলেঙ্কারির খবর। স্ত্রী-র ওপর স্বামীদেবতার অকথ্য অত্যাচার। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে যা লেখা হয়েছে যেকোনো নিকৃষ্ট লেখকও এর চাইতে ভালো জিনিস মন থেকে লিখতে পারবে।

কাগজটা হাতে নিয়ে হোমস চোখ বুলিয়ে বললে, ভায়া নিজের উদাহরণেই ঘায়েল হলে তুমি। কেসটা অসাধারণ। আমি নিজে তদন্ত করেছিলাম। স্বামীটি মোটেই বদচরিত্রের লোক নন। তিনি মদ খাওয়া বরদাস্ত করেন না, পরকীয়া ব্যাপারটা দু-চক্ষে দেখতে পারেন না–তা সত্ত্বেও বিবাহবিচ্ছেদের মামলা রুজু করা হল তার বিরুদ্ধে? কেন? না, তিনি খাওয়ার শেষে বাঁধানো দাঁত ছুঁড়ে স্ত্রীকে মারতেন। অদ্ভুত ঘটনা, তাই নয় কি? কল্পনা করতে পারবে কোনো লেখক? নাও হে, এক টিপ নস্যি নিয়ে মাথাটা সাফ করো।

বলে এগিয়ে দিল দামি অ্যামেথিস্ট রত্ন বসানো সোনার নস্যির ডিবে।

অবাক হয়ে বললাম, এটা আবার কোথায় পেলে?

বোহেমিয়ার সেই রাজা দিয়েছে। তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম।

অনামিকার হিরের আংটি দেখিয়ে বললাম, এটা?

হল্যান্ডের রাজপরিবারের উপহার। তাদের একটা গোপন ব্যাপারে সাহায্য করেছিলাম।

এখন কী করছ? হাত খালি, না কেস আছে?

আছে দশ বারোটা, কিন্তু কোনোটাই চিত্তাকর্ষক নয়। যে-মামলা যত বিরাট বলে মনে হয়, আসলে তা তত সহজ। আকারটাই প্রকাণ্ড–ভেতরে ফক্কা। মিনিট কয়েকের মধ্যে আর একজন মক্কেল আসতে পারে।

বলে, উঠে গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। আমিও ওর দৃষ্টি অনুসরণ করলাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা। সাজপোশাক জমকালো। ভীষণ উত্তেজিত। আঙুল কাঁপছে। আমাদের জানলায় চোখ পড়তেই জলে ঝাঁপ দেওয়ার মতো সাঁৎ করে রাস্তা পেরিয়ে এসে ঢং ঢং করে বাজিয়ে দিলেন দরজার ঘণ্টা। হোমস বললে, প্রেমের কেস মনে হচ্ছে নইলে ঘণ্টা নিয়ে এভাবে হ্যাচকা টান কেউ মারে? গোপনীয় কাণ্ড বলেই প্রথমটা মনস্থির করতে পারেননি দোটানায় পড়েছিলেন।

একটু পরেই চাকরের পেছন পেছন হাজির হলেন ভদ্রমহিলা। নাম মিস সাদারল্যান্ড। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিল হোমস।

বললে, চোখের বারোটা বাজিয়ে বসে আছেন। অথচ টাইপের কাজ করেন কী করে বুঝলাম না।

প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধে হত, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে–আন্দাজে বুঝি কোথায় কোন টাইপটা আছে। এই পর্যন্ত বলেই যেন আঁতকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে? নিশ্চয় আগে শুনেছেন?

জানাটাই আমার কাজ, স্মিত মুখে জবাব দেয় হোমস। অন্যের চোখে যা ধরা পড়ে না আমি তা দেখে ফেলি।

দেখুন, আমি খুব বড়োলোক নই। টাইপের কাজ করে সামান্য রোজকার করি, তা ছাড়াও কে-শো পাউন্ড হাতে আসে। সব আপনাকে দেব শুধু একটা খবরের বিনিময়ে। মিস্টার হসমার গ্রেঞ্জল এখন কোথায় আছে বলে দিন।

শিবনেত্র হয়ে হোমস বললে, এসেছেন তো দেখছি ঊর্ধ্বশ্বাসে। কেন বলুন তো?

অবাক হলেন মিস সাদারল্যান্ড, ঠিক ধরেছেন তো! সত্যি আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। হার বাবা, মি. উইন্ডিব্যাঙ্ক, একদম পাত্তা দিচ্ছেন না ব্যাপারটাকে। পুলিশে খবর দেবেন না,

তপনার কাছেও আসবেন না। তাই খুব রাগ হয়ে গিয়েছিল।

সৎ-বাবা? পদবি আলাদা দেখছি।

হ্যাঁ। বয়সে আমার চেয়ে মোটে পাঁচ বছর দু-মাসের বড়ো। মায়ের চেয়ে পনেরো বছরের ছোটো। বিধবা হয়েই এঁকে বিয়ে করে মা। বাবার ব্যাবসা ছিল টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে। মি. উইন্ডিব্যাঙ্ক নানা জায়গায় ঘুরে মদ বেচেন। তিনি মাকে দিয়ে বাবার ব্যাবসা বিক্রি

করে দিলেন–তাতে সুদে আসলে যা পাওয়া যায়–বাবার জীবদ্দশায় তার চাইতে বেশি আসত।

আপনার রোজগারের টাকা কি এ থেকেই আসে?

না। কাকার মৃত্যুর পর তার কিছু কোম্পানির কাগজ আমি পেয়েছি। তা থেকে বছরে সুদ পাই প্রায় এক-শো পাউন্ড।

ছদ্মবেশীর ছলনা

সে তো অনেক টাকা। বছরে ষাট পাউন্ডেই একজন মহিলার জীবন বেশ কেটে যায়।

কিন্তু একসঙ্গে থাকতে গেলে আমাকেও কিছু দিতে হয়। তিন মাস অন্তর সুদের টাকাটা মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক এনে মাকে দেন। আমি টাইপ করে যা পাই, তাতে নিজের খরচ বেশ চলে যায়।

হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক, দয়া করে খুলে বলুন। সংকোচ করবেন না ডক্টর ওয়াটসন আমার বন্ধু।

প্রদীপ্ত মুখে মিস সাদারল্যান্ড বললেন, গ্যাসফিটারের নাচের আসরে হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। এসব আসরে আমার যাওয়াটা পছন্দ করতেন না মিস্টার

উইন্ডিব্যাঙ্ক। কোথায় যাব শুনলেই খেপে যেতেন। কিন্তু আমি যখন বেঁকে বসলাম, তখন উনি রাগ করে ফ্রান্সে চলে গেলেন। মা আর ফোরম্যান মি. হার্ডির সঙ্গে গেলাম নাচের আসরে। আলাপ হল মিস্টার হসমার এঞ্জেলের সঙ্গে।

ফ্রান্স থেকে ফিরে মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক নিশ্চয় তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন?

মোটেই না। হাসতে লাগলেন। বললেন, মেয়েরা বড্ড জেদি যা করব বলে, তা করে ছাড়ে। খুব সহজভাবে নিলেন সমস্ত ব্যাপারটা।

আলাপ হওয়ার পর?

বাড়িতে একবার এসেছিলেন। আমিও দু-বার তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর আর বাড়িমুখো হননি।

কেন?

বাড়িতে কারো আসাটা সৎ-বাবা পছন্দ করেন না বলে। ওঁর মতে মেয়েদের উচিত ঘরকন্না নিয়ে থাকা।

মিস্টার হসমার এঞ্জেল তখন কী করলেন?

চিঠিতে যোগাযোগ রাখলেন। বলতেন, সৎ-বাবা ফের ফ্রান্সে গেলে বাড়ি আসবেন।

বিয়ের কথা কি চিঠির মধ্যেই হয়?

প্রথমবার বেড়াতে যাওয়ার সময়ে। উনি লেডেনহল স্ট্রিটে একটা অফিসের ক্যাশিয়ার—

কোন অফিস?

তা তো জানি না।

আস্তানা?

অফিসেরই ঘরে।

ঠিকানা?

লেডেন হল স্ট্রিট।

চিঠি কোন ঠিকানায় লিখতেন?

লেডেন হল পোস্ট অফিসের ঠিকানায়। পাছে অফিসের মেয়েরা পেছনে লাগে আমার চিঠি দেখলে, তাই উনি নিজে গিয়ে পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে আসতেন প্রত্যেকটা চিঠি। আমি টাইপ করে চিঠি লিখতে চেয়েছিলাম–উনি রাজি হননি। আমার হাতের লেখার মধ্যেই যেন আমাকে দেখতে পান। কতখানি ভালোবাসলে এমন কথা বলা যায় ভাবুন তো?

হোমস বললে, ব্যাপারটা ছোট্ট হলেও বেশ সংকেতময়। এ-রকম ছোটোখাটো ব্যাপার আর মনে পড়ছে?

রাত না-হলে আমার সঙ্গে বেড়াতে যেতেন না–এত লজ্জা। নিরালায় থাকতে ভালোবাসেন, কথা বলেন খুব আস্তে গ্ল্যান্ডের অসুখ হওয়ার পর থেকেই জোরে কথা বলা বন্ধ। খুব ফিটফাট। চোখে রঙিন চশমা–চোখটাও নিশ্চয় আমার মতো খারাপ।

মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক ফ্রান্সে যাওয়ার পর কী হল?

হসমার আমার বাড়ি আসতে লাগলেন। সৎ-বাবা ফিরে আসার আগেই এই সপ্তাহেই বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইলেন। আমাকে দিয়ে বাইবেল ছুঁইয়ে কথা আদায় করলেন কখন কী ঘটে বলা যায় না কিন্তু আমি যেন তাকে না-ভুলি। সৎ-বাবার মত নেওয়ার ব্যাপারে মা আর হসমার দুজনেই বললেন, তার দরকার কী? মা আমার চেয়েও যেন বেশি ভালোবাসত হসমারকে। বললে, মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ককে বোঝানোর ভার তার। তা

সত্ত্বেও সৎ-বাবাকে একটা চিঠি লিখলাম ফ্রান্সের ঠিকানায় কিন্তু চিঠি পৌঁছোনোর আগেই উনি ইংলন্ড রওনা হওয়ায় চিঠি ফিরে এল বিয়ের দিন সকালে।

আচ্ছা! বিয়েটা তাহলে শুক্রবারেই হয়ে যেত? কোথায়?

সেন্ট জেভিয়ার্স গির্জেতে। একটা ভাড়াটে গাড়িতে আমাকে আর মাকে বসিয়ে উনি পেছন পেছন এলেন আর একটা গাড়িতে। গির্জের সামনে আমরা নামতেই পেছনের গাড়ি এসে দাঁড়াল–কিন্তু ভেতরে কাউকে দেখা গেল না। অথচ গাড়োয়ান তাকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছেন। সেই থেকে তাকে দেখিনি।

আপনার সঙ্গে তার ব্যবহারটা খুবই যাচ্ছেতাই হয়েছে মনে হচ্ছে।

না, না, ওসব ভাববেন না। ওঁর মতো মানুষ এ-কাজ করতেই পারেন না। সকাল থেকেই কিন্তু একটা কথা বার বার বলেছিলাম। আচমকা কোনো কারণে যদি আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়–আমি যেন তাঁকে না-ভুলি–শপথটা মনে রাখি। বিয়ের ঠিক আগে এসব কথার তখন মানে খুঁজে পাইনি–এখন পাচ্ছি।

আপনার বিশ্বাস তাহলে উনি সাংঘাতিক কোনো বিপদে পড়েছেন?

নইলে আগে থেকেই ওইসব কথা বলবে কেন?

বিপদটা কি আঁচ করতে পারছেন?

না।

মায়ের মত কী?

রেগে গেছে। এ নিয়ে আর কোনো কথা আমি না-বলি।

বাবার?

বাবা সব শুনে বললেন, হসমারের খবর নিশ্চয় পরে পাওয়া যাবে। আমার সম্পত্তির ওপর তার একদম লোভ ছিল না। কাজেই খামোকা বিয়ের লোভ দেখিয়ে গির্জে পর্যন্ত ছোটাতে যাবেন কেন? নিশ্চয় কিছু একটা ঘটেছে। এদিকে ভাবনাচিন্তায় আমার রাতের ঘুম উড়ে গেছে। বলতে বলতে রুমালে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন ভদ্রমহিলা।

উঠে দাঁড়াল হোমস। বললে, আমার যথাসাধ্য করব কথা দিচ্ছি। আপনি কিন্তু মন থেকে দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলুন। হসমার এঞ্জেলকে ভুলে যান।

সে কী। আর কি তাহলে দেখা হবে না?

মনে তো হয়।

কিন্তু তার হলটা কী?

জবাব পরে দেব। আপাতত তাঁকে দেখতে কীরকম বলে যান, আর চিঠিপত্র কিছু থাকে তো দিয়ে যান।

গত শনিবার খবরের কাগজে ওঁর জন্যে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম–এই নিন চারখানা চিঠি।

আপনার ঠিকানা?

৩১, লায়ন প্রেস, ক্যাম্বার ওয়েল।

আপনার সৎ-বাবার কারবারের ঠিকানা?

ফেনচার্চ স্ট্রিটের ওয়েস্ট হাউস অ্যান্ড মারব্যাঙ্ক কোম্পানি।

ধন্যবাদ। ফের বলছি, ব্যাপারটা ভুলে যান।

কিন্তু তা তো আমি পারব না। হসমারকে যে কথা দিয়েছি–সারাজীবন পথ চেয়ে থাকব তার জন্যে।

কাগজপত্র টেবিলে রেখে বিদায় নিলেন মিস সাদারল্যান্ড। সাদামাটা মুখ আর বদখত টুপি দেখে প্রথমটা মনে অন্য ধারণা হয়েছিল, এখন কিন্তু শ্রদ্ধা না-করে পারলাম না। সরল ভাবে যে বিশ্বাস করতে পারে, তার ভেতরটা অনেক পবিত্র।

দু-পা সামনে ছড়িয়ে শিবনেত্র হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল শার্লক হোমস। তারপর পাইপ বের করে তামাক ঠেসে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল ভলকে ভলকে।

অনেকক্ষণ পরে বললে—কেসটা নতুন কিছু নয়–এ-রকম ঘটনা এর আগেও ঘটেছে–আমার কাগজপত্র লেখা আছে। কিন্তু মেয়েটি ইন্টারেস্টিং।

বললাম, কী দেখলে ওর মধ্যে?

ভায়া, দেখেছ তুমিও, কিন্তু দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। জামার হাতা, বুড়ো আঙুলের নখ আর জুতোর ফিতের মধ্যেও অনেক রহস্য থাকে। মেয়েটাকে দেখে তোমার কী মনে হল শোনা যাক।

মাথায় পালক গোঁজা চওড়া-কিনারা কালচে-ধূসর বেতের টুপি, গায়ে পুঁতি বসানো কালো পাথরের ঝালরওলা কালো জামা, হাতার বেগুনি দাগ, ধূসর দস্তানা–ডান হাতের আঙুলের ডগা ছিড়ে গেছে, কানে দুল, জুতো দেখিনি। সব মিলিয়ে অবস্থা ভালো, কিন্তু শৌখিন নন।

হাততালি দিয়ে উঠল হোমস। হাসতে হাসতে বলল, চমৎকার বলেছ! খুঁটিয়ে দেখেছ। কিন্তু আসল জিনিসগুলোই দেখনি। রঙের তফাতটা বেশ চোখে পড়েছে দেখলাম। আমি কিন্তু মেয়েদের আস্তিন আর পুরুষদের ট্রাউজার্সের হাঁটু আগে দেখি অনেক খবর ওইখানেই থাকে। মেয়েটার আস্তিনে তুমি বেগনি দাগ দেখেছ, কিন্তু কবজির ঠিক ওপরে সমান্তরাল দুটো রেখা লক্ষ করনি টাইপিস্ট টেবিলে হাত রাখলে এই দাগ দেখা যায়। সেলাই মেশিনেও হয় তবে দাগটা তখন এতটা চওড়া হয় না। মেয়েটির নাকের দু-পাশেও প্যাসনে চশমার দাগ–যা থেকে বললাম চোখ খারাপ সত্ত্বেও টাইপের কাজ করেন কী করে। শুনে খুবই অবাক হলেন ভদ্রমহিলা।

আমিও।

অবাক আমিও হয়েছিলাম ভদ্রমহিলার জুতো দেখে। দু-রকমের জুতো পরেছিলেন। বোতামগুলোও সব লাগাননি। এক পাটিতে পাঁচটা বোতামের শুধু তলার দুটো লাগিয়েছেন। আরেক পাটিতে একনম্বর, তিননম্বর আর পাঁচনম্বর বোম লাগিয়েছেন। এ থেকেই বোঝা যায় কীরকম ছুটতে ছুটতে তিনি এসেছিলেন।

আর কিছু? যুক্তি আর বিশ্লেষণের চমক লাগে আমার মনে।

আসবার আগে তাড়াতাড়ি করে একটা চিঠি লিখে এসেছিলেন ভদ্রমহিলা। দোয়াতে কলমটা একটু বেশিই ডুবিয়েছিলেন–আঙুলে তাই দাগ লেগেছিল। দস্তানা ছেড়া তুমি লক্ষ

করেছিলে–কিন্তু দাগটা দেখনি। আজ সকালেই দাগটা লেগেছিল বলে অত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। যাকগে সে-কথা, বিজ্ঞাপনের কাটিং থেকে হসমার এঞ্জেলের সুরতটা কীরকম একটু পড়ে শোনাও তো ওয়াটসন।

আমি পড়লাম, গত, চোদ্দো তারিখ থেকে হসমার এঞ্জেল নামে এক ভদ্রলোককে পাওয়া যাচ্ছে না। লম্বায় পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি, ভাললা গড়ন, পাণ্ডুর বর্ণ, সামান্য টাক আছে, কালো গোঁফ আর জুলপি আছে, চুলের রংও কালো। রঙিন চশমা পরেন, ফিসফিস করে কথা বলেন। গায়ে কালো ফ্রককোট, কালো ওয়েস্টকোট। ধূসর টুইডের ট্রাউজার্স আর সোনার অ্যালবার্ট চেন। পায়ে ইলাস্টিক বুট আর বাদামি চামড়ার পটি। লেডেনহল স্ট্রিটের একটা অফিসে কাজ করেন। যদি কেউ দয়া করে–

এতেই হবে, বলল হোমস চিঠিগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে, মামুলি চিঠি। কিন্তু একটা ব্যাপার চোখে পড়ার মতো।

কী?

সব চিঠিই তো দেখছি টাইপ করা–তলায় হসমার এঞ্জেল নামটাও টাইপ করা। তারিখ আছে, ঠিকানা নেই। লেডেনহল স্ট্রিট নামটা আবছাভাবে লেখা। মোক্ষম প্রমাণ কিন্তু নামের সইটা।

কীসের প্রমাণ?

ভায়া ওয়াটসন, সইটাই এ-কেসের মোদ্দা রহস্য।

চুক্তি না-রাখার মামলায় সই অস্বীকার করবে বলেই নামটা টাইপ করেছে?

আরে না। যাকগে, দুটো চিঠি লিখতে হবে এখন। একটা লন্ডনের একটা কোম্পানিকে। আর একটা মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ককে কাল সন্ধে ছটায় যেন দেখা করেন আমার সঙ্গে। দুটো চিঠির জবাব না-আসা পর্যন্ত এ নিয়ে আর কোনো কথা নয়।

হোমসের বিচার বুদ্ধি আর বিশ্লেষণী যুক্তির ওপর অগাধ আস্থা আমার। বেশ বুঝলাম, রহস্য আর রহস্য নেই ওর কাছে তাই এত নিশ্চিন্ত।

পরের দিন রুগি নিয়ে কাটল সারাদিন। সন্ধে ছটা নাগাদ হন্তদন্ত হয়ে বেকার স্ট্রিটে ঢুকে দেখলাম, ইজিচেয়ারে গুটিসুটি মেরে ঝিমোচ্ছে বন্ধুবর সামনে গাদা গাদা টেস্টটিউব। রাসায়নিক গবেষণায় বুদ হয়ে ছিল এতক্ষণ নিশ্চয়।

বললাম, ওহে, সমস্যার সমাধান হল?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাইসালফেট অফ ব্যারাইটা।

আরে দুর! সেই কেসটার কী হল?

সে তো হয়েই রয়েছে। ওর মধ্যে আবার সমস্যা কোথায় দেখলে? তবে কী জানো, আইন নিয়ে শয়তানটার চুল পর্যন্ত ছোঁয়া যাবে না।

কে সে?

জবাব শোনবার আগেই করিডরে ভারী পদশব্দ শুনলাম।

হোমস বললে, মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক এলেন। ছ-টার সময়ে আসবেন চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন। ঘরে ঢুকল মধ্যমাকৃতি এক ভদ্রলোক। বয়স বছর তিরিশ। দাড়ি গোঁফ কামানো মুখ, রংটা একটু ফ্যাকাশে, ধূসর চোখে আশ্চর্য খরখরে দৃষ্টি।

অভিবাদন বিনিময়ের পর চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বলল, একটু দেরি হয়ে গেল আমার। মেয়েটা অযথা আপনাকে জ্বালাতন করে গেছে। বড্ড জেদি আর আবেগপ্রবণ। বারণ করা সত্ত্বেও তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনার কাছে আসা উচিত হয়নি। অবশ্য আপনি পুলিশের লোক নন–কাজেই ঘরের কেলেঙ্কারি খুব বেশি পাঁচ কান হবে না। তা ছাড়া, হসমার এঞ্জেলকে খুঁজে পাওয়াও আর যাবে না।

আমার তো বিশ্বাস পাওয়া যাবে?

উইন্ডিব্যাঙ্ক যেন আঁতকে উঠল। হাত থেকে দস্তানা ছিটকে গেল মেঝেতে, তাই নাকি! তাহলে তো খবর খুব ভালোই।

মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক, হাতের লেখার মতো টাইপ করে লেখারও জাত থাকে আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য থাকে। খুব নতুন না-হলে এক-একটা মেশিনে এক একরকম লেখা হয়। টাইপগুলো বিশেষভাবে ক্ষয়ে যায়, চোট খায়। যেমন ধরুন আপনার এই চিঠিই। E ভালো নয়, R-এর তলায় দোষ। এ ছাড়াও চোদ্দোটা বৈশিষ্ট্য আছে।

কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখে হোমসকে দেখতে দেখতে উইন্ডিব্যাঙ্ক বললে, অফিসের মেশিন, সব কাজ এতেই হয়।

হোমস বললে, এবার এই চারখানা চিঠি দেখুন। সবগুলোই নিখোঁজ হসমার এঞ্জেল পাঠিয়েছে। প্রত্যেকটায় E খারাপ, R-এর তলায় গলদ। মাইক্রোস্কোপে দেখলে দেখবেন আরও চোদ্দোটা বৈশিষ্ট্য এতেও আছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে উইন্ডিব্যাঙ্ক বললে, বাজে কথা শোনবার সময় আমার নেই। যদি তাকে ধরতে পারেন, আমাকে জানাবেন।

ততোধিক বেগে এগিয়ে দরজার চাবি লাগিয়ে দিয়ে হোমস বললে, ধরে তো ফেলেছি। কোথায়? ফঁদে আটকানো ইঁদুরের মতো চিমড়ে গেল উইন্ডিব্যাঙ্ক, সাদা হয়ে গেল ঠোঁট। ওতে সুবিধে হবে না, মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক। বসুন।

ঘামতে ঘামতে বসে পড়ল উইন্ডিব্যাঙ্ক। মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেল যেন। বলল তোতলাতে তোতলাতে, কিন্তু কিসু করতে পারবেন না। এ-কেসে মামলা হয় না।

জানি। কিন্তু কাজটা খুব নোংরা। নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা। আমি বলে যাচ্ছি, আপনি শুনুন।

উইন্ডিব্যাঙ্কের অবস্থা দেখে মনে হল যেন নাভিশ্বাস উঠেছে মাথা ঝুলে পড়ল বুকের ওপর। ম্যান্টলপিসের কোণে পা তুলে দিয়ে পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন নিজের মনে কথা বলে গেল হোমস।

বয়সে বড়ো মহিলাকে বিয়ে করেছিল একজন শুধু টাকার লোভে মহিলাটির মেয়ের টাকাও সংসারে খরচ হচ্ছিল।

কিন্তু মেয়েটা বড়ো আবেগপ্রবণ আর জেদি। হাতে টাকা থাকায় বেশিদিন আইবুড়ি নাও থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে বছরে এক-শো পাউন্ড লোকসান হবে। তাই তাকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হত না। কারো সঙ্গে মিশতে দেওয়া হত না। কিন্তু একদিন সে বেঁকে বসল নাচের আসরে যাবে বলে।

মেয়েটির মা আর সৎবাবা তখন জবর ফন্দি আঁটল। সাবা ছদ্মবেশ ধরল। রঙিন চশমা পরে ধারালো চাহনি ঢাকা দিল। নকল গোঁফ আর জুলপি লাগিয়ে মুখের চেহারা পালটাল। গলা শুনে যাতে চিনতে না-পারে, তাই ফিসফিস করে কথা বলতে লাগল।

রাত্রে মেয়েটির সঙ্গে দেখা করত এই কারণেই। চোখ খারাপ থাকায় মেয়েটিও কিচ্ছু ধরতে পারল না। এই হল গিয়ে হসমার এঞ্জেল। মেয়েটিকে দিয়ে বিয়ের চুক্তি করিয়ে নিয়ে অন্যের সঙ্গে বিয়ের পথ বন্ধ করা

হল।

আকুল কণ্ঠে উইন্ডিব্যাঙ্ক বলল, আমরা একটু রগড় করতে চেয়েছিলাম। ও যে অমন মজবে কে জানত।

মেয়েটা সরল মনে ভাবতেও পারেনি কী নিষ্ঠুর খেলা হচ্ছে তাকে নিয়ে। ব্যাপারটাকে জমাটি করার জন্যে ঘনঘন দেখাসাক্ষাৎ চলল তার সঙ্গে। বাইবেল ছুইয়ে দিব্যি করানো হল–যাতে আর কাউকে মনে ঠাঁই না-দেয়। বিয়ের দিন কিছু একটা ঘটতে পারে, এমন ইঙ্গিতও দেওয়া হল। ফ্রান্স যাতায়াতে অসুবিধা হচ্ছিল বলে এবং বেশ কিছুদিন মেয়েটিকে মুহ্যমান রাখার জন্যে এবার বিয়ের খেলায় নামা হল। হসমার এঞ্জেল গাড়ির এ-দরজা দিয়ে ঢুকে ও-দরজা দিয়ে নেমে গেল। গিঞ্জেয় পৌঁছে দেখা গেল গাড়ি ফাঁকা। কী মশাই, ঠিক ঠিক বলছি তো?

উঠে দাঁড়াল উইন্ডিব্যাঙ্ক। নির্বিকার মুখে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, ঠিক হতে পারে, বেঠিকও হতে পারে। আপনার ঘটে এত বুদ্ধি আছে, কিন্তু এটুকু কেন বুঝছেন না যে আমার কাজে আইন ভাঙা হয়নি কিন্তু আপনি আমাকে দরজা বন্ধ করে আটকে রেখে আইন ভাঙছেন।

দরজা খুলে দিল হোমস।

বলল, কথাটা সত্যি। আইন আপনাকে শাস্তি দিতে পারে না। কিন্তু মেয়েটার যেকোনো বন্ধু পারে। এই ঘোড়ার চাবুকটা দিয়ে আগাগোড়া চাবকানো উচিত আপনাকে।

মুখে অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলল উইন্ডিব্যাঙ্ক। দেখেই তবে রে বলে দেওয়ালে ঝোলানো চাবুকের দিকে এগোল হোমস। পরমুহূর্তেই দুমদাম শব্দ শোনা গেল করিডর আর সিঁড়িতে, দড়াম করে দরজা খোলার শব্দ হল নীচে। জানলা দিয়ে দেখলাম পড়ি কি মরি করে রাস্তা দিয়ে ছুটছে মিস্টার উইন্ডিব্যাঙ্ক।

হাসতে হাসতে চেয়ারে বসে পড়ল হোমস।

বলল, লোকটা নিজের ফাঁদেই একদিন নিজে জড়িয়ে পড়বে, ফাঁসিকাঠে উঠবে। কেসটা কিন্তু সহজ হলেও বেশ ইন্টারেস্টিং।

কিন্তু ধরলে কী করে বল তো?

মোটিভ বিচার করে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে কার লাভ? না, মেয়েটির সৎ-বাবার। তাকে আর হসমার এঞ্জেলকে কখনো এক জায়গায় দেখা যায়নি একজন না-থাকলে আরেকজনের আবির্ভাব ঘটেছে। ফিসফিস করে কথা বলা, জুলপি গোঁফ আর রঙিন

চশমা কিন্তু ছদ্মবেশে কাজে লাগে। মোক্ষম প্রমাণ ওই নাম সই হাতে লেখা নয়–টাইপ করা। কেন? না, হাতের লেখাটা এত চেনা যে দুটো শব্দ দেখলেও মেয়েটা চিনে ফেলতে পারে। সন্দেহগুলো যাচাই করলাম দুটো চিঠি লিখে। উইন্ডিব্যাঙ্কের অফিসের ঠিকানা জেনে নিয়ে চিঠি লিখলাম। বিজ্ঞাপনের বর্ণনায় হসমার এঞ্জেলের মুখে জুলপি, গোঁফ আর রঙিন চশমার কথা আছে। ফিসফিস করে বলাটাও ছদ্মবেশ ধরতে কাজে লাগে। এইসব বাদ দিয়ে একটা বর্ণনা খাড়া করে জানতে চাইলাম এই ধরনের কেউ তাদের কোম্পানির ট্রাভেলিং সেলসম্যানের কাজ করে। উইন্ডিব্যাঙ্ককে লিখলাম এখানে আসতে। তার জবাব এল। হসমার এঞ্জেলের চিঠির টাইপে যেসব গোলমাল, এর চিঠিতেও তাই লক্ষ করলাম। এদিকে কোম্পানির জবাবও এসে গেল। জেমস উইন্ডিব্যাঙ্কের চেহারার সঙ্গে আমার দেওয়া বর্ণনা মিলে যায়।

মিস সাদারল্যান্ডের এখন কী হবে?

কী আবার হবে–মেয়েদের ভুল ভাঙতে নেই১৪। বাঘিনীর বাচ্চা কেড়ে আনার মতো বিপজ্জনক কাজ হবে সেটা।

————

টীকা

১. ছদ্মবেশীর ছলনা :আ কেস অব আইডেনটিটি১৮৯১-এর সেপ্টেম্বর মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. বাঁধানো দাঁত ছুঁড়ে : বাঁধানো দাঁত এভাবে ছুড়লে তা প্রথমদিনই ভেঙে যাওয়ার কথা। তাই এই ঘটনা দিনের পর দিন ঘটার সম্ভাবনা কতখানি, সে-বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেশ কিছু সমালোচক।

৩. নস্যি : হোমসকে অন্য কোথাও নস্যি নিতে দেখা যায়নি। তবে দ্য গ্রিক ইন্টারপ্রেটার গল্পে শার্লকের দাদা মাইক্রফটকে দেখা গিয়েছে নস্যি নিতে। বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দাদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত নস্যি নিতেন। নস্যি নেন অদ্রীশ বর্ধনের লেখা গল্পের ডিটেকটিভ ইন্দ্রনাথ রুদ্র।

৪. চাকরের : চাকরের উল্লেখ বেশ কয়েকটি গল্পে পাওয়া গেলেও, তার নাম বলা হয়েছে মাত্র খান-তিনেক গল্পে। নামটি হল বিলি।

৫. গ্যাসফিটারের : গ্যাসের পাইপ বা অন্য যন্ত্রাংশ বিষয়ক মিস্ত্রিকে গ্যাসফিটার বলা হয়।

৬. লেডেনহল স্ট্রিট : লেড (Lead) বা সিসার ছাউনি দেওয়া হল ঘরের নাম লেডেন হল। সেই হলের নামেই রাস্তার নাম, লন্ডনের এক খ্যাতনামা মেয়র ডিক হুইটিংটন শহরের তরফে এই হল কিনে নেন।

৭. উনি রাজি হননি : সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে, হসমার এঞ্জেলের টাইপ করে লেখা চিঠির সম্পর্কে মিস সাদারল্যান্ড কিছু বলেননি কেন।

৮. কাগজপত্র : এই কাগজপত্র ঘেঁটেই ড. ওয়াটসন হোমসের কাহিনি লিখতেন কি না সঠিক বলা যায় না।

৯. টাইপিস্ট টেবিলে হাত রাখলে : একজন সমালোচক বলেছিলেন, ড্রেসিং টেবিল বা পিয়ানোতে হাত রাখলেও ও-রকম দাগ হওয়া সম্ভব।

১০. প্যাসনে : এই বিশেষ ধরনের চশমার বহুল ব্যবহার দেখা যেত ভিক্টোরীয় যুগে। অনেক গল্প-উপন্যাসে একটু মেয়েলি-গোছের পুরুষ চরিত্রদের পাসনে ব্যবহার করতে দেখা যেত। হোমসের গল্প, দ্য গোল্ডেন প্যাসনে-তে এইরকম একটি চশমা গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা গিয়েছিল।

১১. ফ্রককোট : পুরুষদের ব্যবহার্য এই কোটের আসল বিশেষত্ব হল এর সামনে এবং পেছনে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঝুল। এগুলি সাধারণত ডাবল-ব্রেস্টেড।

১২. রাসায়নিক গবেষণায় বুদ : আ স্টাডি ইন স্কারলেট উপন্যাসে ওয়াটসনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই হোমস তার এই অভ্যাস বা বদভ্যাসের কথা জানিয়েছিল ওয়াটসনকে।

১৩. বাইসালফেট অব ব্যারাইটা : রসায়নশাস্ত্রে সালফেট হল লবণ বা সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে প্রাপ্ত কোনো পদার্থ। ব্যারাইটা হল বেরিয়াম সালফেট। বাইসালফেট অব ব্যারাইটা নামক যৌগিক পদার্থটির সম্পর্কে কোনো রাসায়নিক পরীক্ষা কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

১৪. মেয়েদের ভুল... : এই উক্তিটির সঙ্গে সাদৃশ্য বিশিষ্ট একটি উদ্ধৃতি পাওয়া যায় বিখ্যাত পারসিক কবি হাফিজের একটি কবিতায়। হাফিজের সম্পূর্ণ নাম মহম্মদ সামসুদ্দিন হাফিজ (১৩২৫-১৩৮৯)।

# ডোরাকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য স্পেকলড ব্যান্ড]

শার্লক হোমস মামলা হাতে নিত বেছে। উদ্ভট, অদ্ভুত, ফ্যানট্যাসটিক রহস্য না-হলে টাকার প্রলোভনেও আজেবাজে কেসে নাক গলাত না। ও ভালোবাসত জটিল ধাঁধার সমাধান করতে এবং ভালোবাসার টানেই দেখেছি গত আট বছরে সত্তরটি অত্যদ্ভুদ মামলার সমাধান করেছে। এর প্রতিটিতে ওর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমি পেয়েছি, ওর আশ্চর্য তদন্ত পদ্ধতি লক্ষ করেছি। এইসবের মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর কেস হল স্টোকমোরানের নামকরা ফ্যামিলি রয়লটদের ব্যাপারটা।

১৮৮৩ সালে এপ্রিল তখন সবে শুরু হয়েছে। সাতসকালে ঘুম ভেঙে গেল। অবাক হয়ে দেখলাম, আমাকে ঠেলে তুলেছে শার্লক হোমস স্বয়ং। অথচ চিরকালই বেলা পর্যন্ত ঘুমোনো ওর অভ্যেস।

ওয়াটসন, মক্কেল এসেছেন। তরুণী মক্কেল।এত সকালে যখন বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জাগিয়েছেন, তখন বুঝতে হবে কেসটা ইন্টারেস্টিং। তোমাকে তাই না-ডেকে পারলাম না।

আরে ভাই, ভালোই করেছ। এ-সুযোগ কেউ ছাড়ে।

আশ্চর্য বিশ্লেষণী শক্তি আর যুক্তির খেলা দেখিয়ে হোমস যেভাবে রহস্য সমাধান করে, তা চিরকালই আমার কাছে একটা গভীর আনন্দের ব্যাপার। তাই চটপট সেজেগুঁজে নিয়ে গেলাম বসবার ঘরে। আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন একজন মহিলা। মুখটা কালো ওড়নায় ঢাকা।

প্রসন্ন কণ্ঠে হোমস বললে, আমার নাম শার্লক হোমস। ইনি আমার প্রাণের বন্ধু ড. ওয়াটসন–সহযোগীও বটে। এঁর সামনেই সব কথা বলতে পারেন। আপনি বরং আগুনের পাশে বসুন। শীতে কাঁপছেন দেখছি।

শীতে নয়, মি. হোমস আমি ভয়ে কাঁপছি, বলে মুখ থেকে ওড়না সরালেন মেয়েটি। দেখলাম, সত্যিই উদবেগ আতঙ্কে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, চোখে ভয়তরাসে চাহনি। বয়স তিরিশের নীচে। অকালে চুল পেকেছে।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত পিচ্ছিল চাহনি বুলিয়ে নিয়ে হোমস অভয় দিয়ে বলল, ভয় কী? সব ঠিক হয়ে যাবে। সকালের ট্রেনে এলেন?

হ্যাঁ। আপনি তাহলে চেনেন আমাকে?

না, চিনি না, তবে রিটার্ন টিকিটটা দস্তানায় খুঁজে রেখেছেন দেখা যাচ্ছে। বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন কাকডাকা ভোরে। এক ঘোড়ায় টানা হালকা গাড়িতে স্টেশনে পৌঁছেছেন। রাস্তা অনেকখানি এবং খুবই খারাপ।

ভদ্রমহিলা হতভম্ব হয়ে গেলেন।

মৃদু হাসল হোমস, জামার সাত জায়গায় কাদা লাগিয়ে এসেছেন। এক ঘোড়ায় টানা গাড়িতে কোচোয়ানের বাঁ-পাশে বসলে তবে ওইভাবে কাদা ছিটকে লাগে গায়ে।

ধরেছেন ঠিক। সত্যিই বাড়ি থেকে বেরিয়েছি ছ-টার আগে। মি. হোমস, এ অবস্থা বেশিদিন চললে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাব আমি। আপনি আমাকে বাঁচান। এই মুহূর্তে আপনাকে টাকাকড়ি দিতে পারব না কিন্তু দু-এক মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়ে যাবে আমার। আমার টাকা তখন আমারই হাতে আসবে। আপনার পাওনা আমি মিটিয়ে দেব।

আপনার সমস্যাটা বলুন।

সমস্যাটা সৃষ্টি হয়েছে কতকগুলো ধোঁয়াটে ব্যাপারের জন্যে। ভীষণ ঘাবড়ে গিয়েছি। একমাত্র একজনই আমাকে উচিত পরামর্শ দিতে পারেন এ-পরিস্থিতিতে কিন্তু তিনিও খুব একটা পাত্তা দিচ্ছেন না। ভাবছেন সবটাই মনগড়া ব্যাপার–ভয় পেয়ে উলটোপালটা ভাবছি। মেয়েলি কল্পনা। আপনার কাছে ছুটে এসেছি সেই কারণেই।

বেশ তো বলুন না।

আমার নাম হেলেন স্টোনার। স্টোকমোরানের রয়লট ফ্যামিলির শেষ বংশধর আমার সৎ-বাবা। এককালে এ-বংশের প্রতাপ ছিল, টাকার জোর ছিল–এখন দু-শো বছরের বাড়িটা আর কয়েক একর জমি ছাড়া কিছু নেই।

আমার সৎ-বাবা এই বংশের শেষ পুরুষ। উনি ভাগ্য ফেরানোর জন্যে কলকাতায় যান, ডাক্তারি করে যথেষ্ট রোজগার করেন। তারপর একদিন রাগের মাথায় খাস চাকরকে মারতে। মারতে একদম মেরে ফেলায় কোনোমতে ফাঁসির দড়ি থেকে বেঁচে যান, কিন্তু জেল খাটতে হয় অনেক দিন। জেল থেকে বেরিয়ে চলে আসেন ইংলন্ডে।

বেঙ্গল আর্টিলারির মেজর স্টোনার আমার বাবা। আমরা দুই বোে‌ন–জুলিয়া আর আমি যমজ। উনি মারা যাওয়ার পর আমাদের বয়স যখন মাত্র দু-বছর, মা বিয়ে করে ডা. রয়লটকে। বিয়েটা হয় ভারতবর্ষে।

মায়ের যা টাকা ছিল, তা থেকে বছরে হাজার পাউন্ড আয় হত। সৎ-বাবাকে মা সব টাকাই উইল করে দিয়েছিলেন একটা শর্তে। আমাদের বিয়ের পর কিছু টাকা দুই বোনকে দিতে হবে।

ইংলন্ডে ফিরে আসার পর আট বছর আগে ট্রেন অ্যাক্সিডেন্টে মা মারা যায়। লন্ডনে প্র্যাকটিস কররেন ভাবছিলেন সৎ-বাবা, এই ঘটনার পর তিনি আর সেসবের মধ্যে গেলেন না। স্টোকমোরানে বাপ-ঠাকুরদার ভিটেতে ফিরে এলেন।

প্রতিবেশীরা তখন খুব খুশি হয়েছিল। কিন্তু দু-দিন যেতে-না-যেতেই তারা সৎ-বাবার ছায়া মাড়ানোও ছেড়ে দিল। কারণ তার বদমেজাজ। বাড়ি থেকে বেরোতেন না, কারো সঙ্গে মিশতেন না। বংশের আদিপুরুষের মতো এমনিতেই রগচটা ছিলেন–অনেকদিন গরমের দেশে থাকার ফলে মেজাজ আরও তিরিক্ষে হয়ে গিয়েছিল। কয়েকটা ঝামেলা পুলিশ কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল। এই সেদিন গাঁয়ের কামারকে পাঁচিলের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন নদীর জলে। গায়ে তার আসুরিক শক্তি। মেলামেশা করেন যাযাবর বেদেদের সঙ্গে। নিজের কাঁটা জমিতে তাদের থাকতে দেন। নিজেও মাঝে মাঝে তাঁদের তাঁবুতে গিয়ে থাকেন–ওদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান। ভারতবর্ষের জন্তুজানোয়ার পুষতে ভালোবাসেন। একটা চিতাবাঘ আর একটা বেবুন তো নিজের বাগানেই ছেড়ে রাখেন–তল্লাটের কেউই তাই আমাদের ত্রিসীমানায় আসতে চায় না। কোনো চাকরবাকরও বাড়িতে থাকতে চায় না। আমরা দুই বোন সব কাজ করেছি। জুলিয়া মারা যায় তিরিশ বছর বয়সে। আমার মতন তারও চুলে পাক ধরেছিল মৃত্যুকালে।

বোন মারা গেছেন?

দু-বছর আগে। বুঝতেই পারছেন, এ অবস্থায় কেউই আমরা সুখে ছিলাম না। কোথাও বেরোতে পারতাম না–মাসির কাছে যাওয়া ছাড়া। মাসি বিয়ে-থা করেনি–থাকত হ্যারোতে। সেইখানেই গিয়ে থাকতাম মাঝে মাঝে। দু-বছর আগে বড়োদিনের সময়ে সেখানেই নৌদপ্তরে এক আধা মাইনের রিটায়ার্ড মেজরের সঙ্গে জুলিয়ার বিয়ে ঠিক হয়। স্টোকমোরানে ফিরে আসার পর সৎ-বাবা বিয়ের কথা শুনলেও কোনো আপত্তি

করেননি। দিন কয়েক পরেই মানে, বিয়ের ঠিক পনেরো দিন আগে, একটা লোমহর্ষক ঘটনা ঘটল। মারা গেল জুলিয়া।

এতক্ষণ চোখ মুদে শুনছিল হোমস। এবার অর্ধনিমীলিত চোখে বললে, সমস্ত বলবেন–কিচ্ছু বাদ দেবেন না।

নিশ্চয় বলব। সেই ভয়ংকর রাতের কোনো কথাই এ-জীবনে আর ভুলতে পারব না। স্টোকমোরানের জমিদার ভবন দু-শো বছরের পুরোনো। পোড়োবাড়ির অবস্থায় পৌঁছেছে। একটা অংশে কোনোমতে থাকা যায়। শোবার ঘরগুলো একতলায়। একটা বারান্দার পাশে পাশাপাশি তিনটে শোবার ঘর। তিনটে ঘরেরই জানলার পাশে ঘাস-ছাওয়া লন। প্রথম ঘরটা সৎ-বাবার, দ্বিতীয়টা জুলিয়ার, তৃতীয়টা আমার। এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাওয়ার দরজা নেই–কিন্তু সব ঘরের দরজা আছে একই বারান্দার। বসবার ঘরটা বাড়ির মাঝের অংশে।

ভয়ংকর সেই রাতে সৎ-বাবা একটু তাড়াতাড়ি শুতে গেলেন। ঘরে গিয়ে কড়া চুরুট খেতে লাগলেন। ভারতীয় চুরুট। নিজের ঘরে বসে সেই গন্ধে তিষ্ঠোতে না-পেরে জুলিয়া এল আমার ঘরে। আসন্ন বিয়ে সম্বন্ধে একটু গল্পগুজব করার পর এগারোটা নাগাদ উঠে দাঁড়াল নিজের ঘরে যাবে বলে। তারপর বললে, হেলেন, তুই কি রাতে শিস দিস?

আমি বললাম, না তো।

ও বলল, কিন্তু রোজ রাতে শিসের আওয়াজ শুনছি ক-দিন। আমি ভাবলাম তুই বুঝি ঘুমিয়ে শিস দেওয়া আরম্ভ করেছিস।

আমি বললাম, দুর আমি কেন দেব। ওই পাজি বেদেগুলোর কাণ্ড নিশ্চয়।

ও বলল, তাহলে তো তুইও শুনতে পেতিস। লন থেকে শিস দিলে তোর কানেও যাওয়া উচিত।

আমি বললাম, তোর মতন পাতলা ঘুম তো নয় আমার।

জুলিয়া তখন চলে গেল নিজের ঘরে। ভেতর থেকে দরজায় তালা দেওয়ার আওয়াজ

পেলাম।

শার্লক হোমস বললে, রোজ রাতে দরজায় তালা দেন নাকি?

দিই। বাগানে চিতাবাঘ আর বেবুন ছাড়া থাকে বললাম না? দরজায় তালা না-দিলে নিশ্চিন্ত হতে পারি না।

তারপর?

ঘটনাটা ঘটল সেই রাতেই। জানেন তো যমজদের আত্মা সূক্ষ্ম যোগসূত্রে বাঁধা থাকে। তাই আসন্ন দুর্ভাগ্যের সম্ভাবনায় ঘুমোতে পারছিলাম না কিছুতেই। অজানা আতঙ্কে কাঠ হয়ে ছিলাম বিছানায়। বাইরে ঝড়ের হুংকার, জানলায় বৃষ্টির ঝাঁপটা শুনছি আর শুনছি। আচমকা ঝড়বাদলার এই মাতামাতির মধ্যেই শুনলাম নারীকণ্ঠের একটা ভয়ার্ত চিৎকার। বিষম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠেছে আমার বোন–গলা শুনেই বুঝলাম। তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে গায়ে শাল জড়িয়ে ছুটে গেলাম করিডরে। দরজা যখন খুলছি, তখন যেন একটা চাপা শিসের শব্দ কানে ভেসে এল। ঠিক যেমনটি আমার বোন বলেছিল–অবিকল সেইরকম। তার কয়েক মুহূর্ত পরেই ঝন ঝন ঝনাৎ করে আওয়াজ কানে ভেসে এল। যেন ধাতুর কিছু পড়ে গেল। করিডর দিয়ে ছুটতে ছুটতে দেখলাম আস্তে আস্তে কবজার ওপর ঘুরে যাচ্ছে বোনের ঘরের দরজা। আতঙ্কে কাঠ হয়ে চাইলাম সেইদিকে–না-জানি কী জিনিস বেরিয়ে আসবে ঘর থেকে। বারান্দায় আলোয় কিন্তু দেখলাম, আমার বোনই বেরোচ্ছে ঘর থেকে, ভয়ে বিকট হয়ে গিয়েছে মুখ, দু-হাত সামনে বাড়িয়ে হাওয়া আঁকড়াবার চেষ্টা করছে, মাতালের মতো সারাশরীর দুলছে। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। ঠিক তখনই ওর হাঁটু আর ভার সইতে পারল না–লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। এমনভাবে পাকসাট খেতে লাগল যেন বিষম যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাচ্ছে শরীরটা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমাকে বুঝি চিনতেই পারছে না। তারপরেই আচমকা যন্ত্রণায় ভাঙা গলায় ভীষণ চিৎকার করে বললে, হেলেন! হেলেন! ডোরাকাটা পটি! ফুটকি দাগওলা ডোরাকাটা সেই পটি!আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, আঙুল তুলে ডাক্তারের ঘরের দরজাও দেখিয়েছিল কিন্তু যন্ত্রণার নতুন তাড়সে সিটিয়ে যেতে মুখ দিয়ে কথা আর বেরোল না। আমি ছুটে গিয়ে তারস্বরে ডাকলাম সৎ-বাবাকে। ড্রেসিংগাউন গায়ে হন্তদন্ত হয়ে উনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বোনের পাশে এসে যখন পৌঁছোলেন, তখন তার জ্ঞান নেই।

তাড়াতাড়ি গলায় ব্র্যান্ডি ঢেলে দিলেন, গাঁ থেকে ওষুধপত্তরের ব্যবস্থা করলেন–কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না–জুলিয়া আর জ্ঞান ফিরে পেল না। জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয়ে এল একটু একটু করে মারা গেল অজ্ঞান অবস্থাতেই। ভয়াবহভাবে শেষ হয়ে গেল আমার প্রাণপ্রিয় বোন।

হোমস বাধা দিয়ে বললে, এক সেকেন্ড। ধাতব আওয়াজ আর শিস দেওয়ার শব্দটা ঠিক শুনেছেন তো?

যেরকম ঝড়জলের আওয়াজ হচ্ছিল, তাতে ভুল শোনা বিচিত্র নয়। ভুল শুনেছি বলেই আমার বিশ্বাস। সেকেলে বাড়ি তো, হাজার রকম ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হয় ঝড়ের রাতে।

জুলিয়ার পরনে পোশাক কী ছিল?

শোয়ার পোশাক। বাঁ-হাতে দেশলাই, ডান হাতে একটা পোড়া কাঠি।

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। সর্বনাশের মুহূর্তে দেশলাই জ্বালিয়ে উনি দেখেছিলেন। করোনার কী বলেন?

অনেক তদন্ত করেও তিনি মৃত্যুর সঠিক কারণ বার করতে পারেননি, ডা. রয়লটের বদনাম তো কম নয়। কুখ্যাত হয়ে গিয়েছেন গোটা তল্লাটে।

আমার সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে, দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, সেকেলে খড়খড়ি আর লোহার মোটা গরাদওলা জানলাও বন্ধ ছিল ভেতর থেকে। দেওয়াল নিরেট, মেঝেও নিরেট। চওড়া চিমনির মুখ চারটে শিক দিয়ে বন্ধ। সোজা কথায়, মারা যাওয়ার সময়ে জুলিয়া একলাই ছিল। তা ছাড়া ওর শরীরে জোরজবরদস্তিরও কোনো দাগ বা চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

বিষ দেওয়া হয়েছিল কি না দেখা হয়েছে?

ডাক্তাররা দেখেছেন–বিষ পাননি।

মৃত্যুর কারণটা তাহলে আঁচ করতে পারেন?

সাংঘাতিক ভয়ে স্নায়ুতে চোট পেয়ে গেছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ভয় পেল কেন, সেইটাই বুঝতে পারছি না।

জিপসিরা কি তখন বাগানেই ছিল?

সবসময়েই তো থাকে–তখনও ছিল জনাকয়েক।

ডোরাকাটা ফুটকি দাগওয়ালা পটিটা কী হতে পারে?

জিপসিরা অনেকে ওইরকম রুমাল মাথায় বাঁধে। হয়তো প্রলাপ বকেছে।

হোমসের মাথা নাড়া দেখে বুঝলাম খুশি হতে পারেনি জবাব শুনে।

বলল, খুবই গভীর জলের ব্যাপার। যাকগে, আপনি বলে যান।

একা একা কাটল দুটো বছর। মাসখানেক আগে আমারও বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেল। সৎ-বাবা কোনো আপত্তি করেননি। দিন দুয়েক আগে বাড়ির পশ্চিম দিকে মেরামতির কাজ। আরম্ভ হল, আমার শোবার ঘরের দেওয়াল ফুটো করা হল। বাধ্য হয়ে বোনের ঘরে এসে শুলাম রাতে–বোনেরই খাটে শুতে হল নিরুপায় হয়ে। আমার মানসিক অবস্থা তখন কীরকম অনুমান করে নিন। একদম ঘুমোতে পারছি না–কেবল এপাশ-ওপাশ করছি। গভীর রাতে আচমকা শুনলাম সেই শিসের শব্দ–যে-শিস শুনেছিলাম জুলিয়া মারা যাওয়ার রাতে। আঁতকে উঠে নেমে পড়লাম খাট থেকে। সারারাত জেগে কাটিয়ে দিলাম। ভোররাতে চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম–সোজা এসেছি আপনার কাছে।

ভালোই করেছেন, বলল শার্লক হোমস, কিন্তু মিস স্টোনার, আপনি তো সব কথা খুলে বলেননি–সৎ-বাবার অনেক কীর্তিই আপনি চেপে গেছেন।

বলেই, হেলেন স্টোনারের কবজির ওপর থেকে জামার কাপড় সরিয়ে দিল হোমস। দেখলাম, পাঁচ আঙুলের স্পষ্ট কালসিটের দাগ।

জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে আপনার সঙ্গে, তাই না?

লজ্জায় মুখ লাল হয়ে গেল মেয়েটির। তাড়াতাড়ি কবজি ঢেকে বললে :

গায়ে আসুরিক জোর তো খেয়াল থাকে না।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তন্ময় হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে রইল হোমস।

তারপর বললে, ব্যাপারটা খুবই রহস্যজনক। হাতে সময়ও বেশি নেই। আজই আপনাদের বাড়িটা পরীক্ষা করে দেখতে চাই কিন্তু সৎ-বাবা যেন জানতে না-পারেন। সম্ভব হবে?

হ্যাঁ হবে। উনি আজকে শহরে আসবেন জানি।

তাহলে ওই কথাই রইল। বিকেল নাগাদ আমরা দুই বন্ধু আপনার বাড়ি যাচ্ছি।

মিস স্টোনার চলে যাওয়ার পর হোমস বললে, ওয়াটসন, কী বুঝলে?

অকূল রহস্য। দিশে পাচ্ছি না। জুলিয়া মারা যাওয়ার সময়ে ঘরে তো কেউ ছিল না। তাহলে?

তাহলে মরবার সময়ে ডোরাকাটা ফুটকি দাগওলা পটির কথা বলে গেল কেন? কেনই-বা শিসের শব্দ শোনা যেত রাতে?

আমার মাথায় আসছে না।

ভায়া, ঘটনাগুলো পর পর সাজিয়েই দেখ না। প্রথমেই ধরে নাও সৎমেয়ের বিয়ে আটকালে ডাক্তারের আর্থিক লাভ রয়েছে। তারপরেই দেখ ভদ্রলোকের সঙ্গে জিপসিদের দহরম-মহরম এবং রাত্রে শিসের আওয়াজ। ডোরাকাটা পটির কথা বলেই মিস স্টোনারের জ্ঞান লোপ এবং একটা ঝন ঝন ঝনাৎ শব্দ যা কিনা খড়খড়ি বন্ধ করার জন্যে লোহার খিল ফেলার আওয়াজ হতে পারে। সবকটা ঘটনা এক সুতোয় গাঁথলে রহস্য-সূত্র পাওয়া যাবেই। আরে! আরে! এ আবার কোন আপদ।

দড়াম করে দরজা খুলে মূর্তিমান উৎপাতের মতো ঘরে ঢুকল দানবাকৃতি এক বৃদ্ধ। মাথার টুপি প্রায় দরজায় ঠেকেছে, এত লম্বা। নিশ্বাস ফেলছে ফোঁস ফোঁস করে। বলিরেখা আঁকা মুখটা হলুদ হয়ে এসেছে রোদে পুড়ে। মুখের পরতে পরতে অনেক দুষ্কর্ম প্রকট হয়ে রয়েছে। চোখ

তো নয় যেন আগুনের ভাটা–রাগে জ্বলছে। বাজপাখির মতো সরু খাড়া নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠেছে। সব মিলিয়ে যেন একটা প্রেতচ্ছায়া।

হাতের চাবুকটা নাড়তে নাড়তে ক্রুদ্ধ হুংকার ছেড়ে বললে আগন্তুক, শার্লক হোমস কোন জন?

আমি, শান্তস্বরে বললে বন্ধুবর, আপনি?

স্টোকমোরানের ডাক্তার গ্রাইমসবি রয়লট।

বসুন।

বসতে আসিনি। আমার সৎ-মেয়ে এখানে এসেছিল। কেন?

বড়ো ঠান্ডা পড়েছে বাইরে।

কী বলছিল? হিংস্র চিৎকার ছাড়ল বৃদ্ধ।

তাহলে ক্রুকাস ভালোই ফুটবে, নিরুত্তাপ স্বরে বলে গেল হোমস।

আচ্ছা! এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে? স্কাউলে কোথাকার! তোমাকে আমি চিনি, এগিয়ে এসে নাকের ডগায় চাবুক নাড়তে নাড়তে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল বৃদ্ধ। পরের ব্যাপারে কাঠি দেওয়া তোমার স্বভাব।

হাসল হোমস।

পরচর্চায় বড় আনন্দ, না?

হোমসের হাসি সারামুখে ছড়িয়ে পড়ল।

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লক্কা পায়রা কোথাকার!

প্রাণ খুলে খুক খুক করে হেসে হোমস বললে, আপনার কথায় বেশ মজা আছে। যাওয়ার সময়ে দরজাটা বন্ধ করে যাবেন–ঠান্ডা ঝাঁপটা আসছে।

যা বলতে এসেছি, সেটা বলব, তারপর যাব। আমার ব্যাপারে নাক গলাতে এস না শার্লক হোমস। মিস স্টোনারের পেছন পেছন আমি এসেছি–আমি জানি এখানে সে এসেছিল! আমি কিন্তু লোক খুব খারাপ–ঘাঁটিয়ো না। দেখ তবে বলেই আগুন খোঁচানোর লোহার ডান্ডাটা বিশাল বাদামি হাতে তুলে বেঁকিয়ে ফেলে দিল ফায়ারপ্লেসে।

আমার মুঠোয় পড়লে এই দশাই হবে বলে দিলাম। দংষ্ট্রাসহ জিঘাংসাকে প্রকট করে তুলে হনহন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল অসুর আকৃতি।

অমায়িক মানুষ বটে, হেসে বলল হোমস। আমার চেহারাটা অবশ্য অত বিরাট নয়, তবে ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে গেলে দেখিয়ে দিতাম কবজির জোরে আমিও কম যাই না, বলে ইস্পাতের ডান্ডাটা তুলে এক ঝটকায় ফের সিধে করে দিল আগের মতো।

লোকটার স্পর্ধা দেখ! আমাকে কিনা সরকারি ডিটেকটিভ বলে গাল পাড়ে! যাকগে, ভালোই হল। তদন্ত করার উৎসাহটা আরও বেড়ে গেল। মেয়েটার ওপর এখন অত্যাচার না-হলেই হয়। ওয়াটসন, প্রাতরাশ খেয়ে নেওয়া যাক। তারপর আমি বেরোব একটু খোঁজখবর নিতে।

দুপুর একটা নাগাদ বাড়ি ফিরল হোমস। হাতে একতাড়া কাগজ। তাতে অনেক কিছু লিখে এনেছে।

বললে, মিস স্টোনারের মা যে উইল করে গেছেন, তা দেখে এলাম। আগে এক বছরের আয় ছিল ১১০০ পাউন্ড। এখন ৭৫০ পাউন্ড। বিয়ে হলে প্রত্যেক মেয়ে বছরে পাবে ২৫০ পাউন্ড। অর্থাৎ দুই মেয়েই পাত্রস্থ হলে ভদ্রলোকের ভঁড়ে থাকে মা ভবানী। নাও হে ওয়াটসন, এবার ওঠো। সকালের কাজটা বৃথা যায়নি–এবার শুরু হোক বিকেলের কাজ। সঙ্গে রিভলভারটা নিয়ো। যে-লোক কথায় কথায় লোহার ডান্ডা বাঁকায়, তার সঙ্গে রিভলভার নিয়ে কথা বলাই ভালো।

স্টোকমোরানে পৌঁছে দেখলাম মিস স্টোনার আমাদের জন্যেই বাড়ির বাইরে পায়চারি করছেন।

হোমসকে দেখেই সাগ্রহে বললে, ডক্টর রয়লট লন্ডন গেছেন–ফিরতে সেই সন্ধে।

জানি। দেখা হয়েছে আমাদের সঙ্গে, বলে ঘটনাটা বলল হোমস।

ফ্যাকাশে হয়ে গেলেন মিস স্টোনার, সাংঘাতিক ধড়িবাজ তো! পেছন নিয়েছিলেন?

অভয় দিয়ে হোমস বললে, ঘাবড়াবেন না। ওঁর চাইতেও ধড়িবাজ লোক ওঁরই পেছনে এবার লেগেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আপনাকে মাসির কাছে রেখে আসব। চলুন, ঘরটা দেখে আসি।

সুপ্রাচীন প্রাসাদের প্রায় সবটাই পড়ো-পড়া অবস্থায় পৌঁছেছে। একদিকে বাসোপযোগী একটা অংশে রাজমিস্ত্রির কাজ চলছে। ভারা বাঁধা। কিন্তু মিস্ত্রি নেই। একটা বারান্দার ওপর পাশাপাশি তিনটে ঘর। শেষের ঘরটায় দেওয়াল ভাঙা। হোমস সে-ঘরে গেলই না। যে-ঘরে মিস স্টোনার রাত কাটিয়েছেন, সেই ঘরের লনের দিককার জানলার লেন্স দিয়ে পরীক্ষা করল অনেকক্ষণ। ভেতর থেকে হুড়কো দিয়ে খড়খড়ি আটকানোর পর বাইরে থেকে অনেক চেষ্টা করেও খুলতে পারল না।

হোমস বললে, মিস স্টোনার, আপনার শোবার ঘরটা মেরামত না-করলেই কি চলছিল না?

কোনো দরকারই ছিল না। আমার তো মনে হয় ওই অছিলায় উনি আমাকে মাঝের ঘরে সরিয়েছেন।

তাহলে চলুন, ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখা যাক।

ঘরটা সাদাসিদে, বহু পুরোনো দেওয়াল, আসবাবপত্র মামুলি। দেওয়াল-ঘেঁষা একটা সরু খাট, সিন্দুক, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার। এক কোণে বসে তীক্ষ্ণ চোখে সব কিছুই যেন মনের পর্দায় এঁকে নিতে লাগল হোমস।

বিছানার পাশে একটা দড়ি ঝুলছিল কড়িকাঠের কাছ থেকে। ঝুমকো প্রান্ত লুটিয়ে বালিশে।

হোমস বললে, দড়িটা কীসের?

ঘণ্টার। হাউসকিপারের ঘর পর্যন্ত গিয়েছে।

এ-ঘরের সব কিছুই তো দেখছি পোকায় খাওয়া। দড়িটা সে তুলনায় অনেক নতুন মনে হচ্ছে।

এই তো বছর দুই হল লাগানো হয়েছে।

বোন বলেছিল বলে?

না, না। জুলিয়া চায়নি। ঘণ্টা টেনে ফরমাশ করা আমাদের ধাতে নেই। কাজকর্ম নিজেরাই করি।

দাঁড়ান, মেঝেটা দেখি, বলে আতশকাচ হাতে মেঝের ওপর উপুড় হয়ে পড়ল হোমস। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেঝে পর্যবেক্ষণ করল নিমগ্ন চিত্তে। মেঝের প্রত্যেকটা ফাটা, দেওয়ালের তক্তা তন্নতন্ন করে দেখার পর গেল খাটের কাছে। স্থির চোখে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চোখ বুলেল দেওয়ালের ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত। সবশেষে ঘণ্টার দড়ি ধরে মারল টান।

টেনেই বললে, আরে! এ তো দেখছি মেকি ব্যাপার!

বাজছে না বুঝি?

বাজবে কী করে? তারের সঙ্গে বাঁধা থাকলে তো! ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখছি। নিজেই দেখুন না হওয়া যাতায়াতের ঘুলঘুলির ঠিক ওপরে হুকের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে দড়িটা।

এ কী অদ্ভুত ব্যাপার! লক্ষই করিনি অ্যাদ্দিন।

অদ্ভুত বলে অদ্ভুত! আশ্চর্য ব্যাপার আরও আছে এ-ঘরে। যেমন ধরুন এমন বোকা রাজমিস্ত্রি কখনো দেখেছেন যে হাওয়া যাতায়াতের জন্যে পাশের ঘরের দেওয়ালে ঘুলঘুলি বানায়? একই মেহনতে খোলা বাতাস আনা যেত যদি ঘুলঘুলিটা বানানো হত বাইরের দেওয়ালে!

ওটাও সম্প্রতি তৈরি।

ঘণ্টার দড়ি যখন এসেছে, সেই সময়ে তো?

হ্যাঁ। কিছু রদবদল করা হয়েছিল তখন।

খুবই ইন্টারেস্টিং রদবদল, মিস স্টোনার। এক নম্বর, ডামিঘণ্টার দড়ি–ধোঁকা দেওয়ার জন্যে। দু-নম্বর–এমন একটা ভেন্টিলেটর যা ভেন্টিলেটরের কাজ করে না। এবার পাশের ঘর নিয়ে রিসার্চ করা যাক।

ডা. গ্রাইমসবি রয়লটের ঘরখানা একটু বড়ো–কিন্তু আসবাবপত্র একইরকম সাদাসিদে। ক্যাম্পখাট, কাঠের তাকভরতি বই–বেশির ভাগই যন্ত্রশিল্প সম্পর্কিত, বিছানার পাশে একটা আর্মচেয়ার, দেওয়ালের পাশে একটা কাঠের মামনি চেয়ার, একটা গোল টেবিল, একটা বড়ো লোহার সিন্দুক। চুলচেরা চোখে তন্ময় হয়ে প্রতিটি বস্তু দেখল হোমস।

সিন্দুকে আঙুল ঠুকে বলল, কী আছে এতে?

সৎ-বাবার ব্যাবসার কাগজপত্র।

ভেতর দেখেছেন?

অনেক বছর আগে একবারই দেখেছি–কাগজ ঠাসা ছিল।

ভেতরে বেড়াল-টেড়াল নেই তো?

ভারি অদ্ভুত কথা বলেন তো!

ডালার ওপর এক ডিশ দুধ দেখিয়ে হোমস বললে, এইজন্যে বললাম!

বেড়াল নেই, তবে চিতা আর বেবুন আছে।

তা বটে। চিতা আছে–বেড়ালেরই জাত–কিন্তু দুধে তার রুচি নেই, বলতে বলতে কাঠের চেয়ারটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে চেয়ার পর্যবেক্ষণ মন প্রাণ ঢেলে দিলে হোমস।

উঠে দাঁড়িয়ে লেন্স পকেটে পুরে বললে, থ্যাংকিউ! সব বোঝা গেছে। আরে! আরে! আবার একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার!

যা দেখে তাজ্জব হল শার্লক হোমস তা একটা কুকুর-মারার ছোট্ট চাবুক। ঝুলছে বিছানার কোণে। ডগাটায় কিন্তু একটা ফাস।

ওয়াটসন, কী বুঝলে? মামুলি চাবুক। কিন্তু ফাস বাঁধা কেন বুঝছি না।

ওইখানটায় কেবল মামুলি ঠেকছে না, কেমন? দুনিয়াটা বদমাশ লোকে বোঝাই হে, তার ওপর যদি চালাক লোক পাপ কাজে নামে তার মতো কুচক্রী আর হয় না। মিস স্টোনার, চলুন। এবার, লনে যাওয়া যাক।

মুখখানা অন্ধকার করে অনেকক্ষণ লনে পায়চারি করল বন্ধুবর। তারপর বললে, মিস স্টোনার, আমি যা বলব, আপনাকে তাই করতে হবে।

আপনার হাতেই তো ছেড়ে দিয়েছি নিজেকে।

তাহলে আজকে আপনি রাত কাটাবেন আপনার পুরোনো ঘরে। আর আমরা রাত কাটাবো আপনার ঘরে।

মিস স্টোনার আর আমি দুজনেই যুগপৎ অবাক হয়ে গেলাম।

হোমস বললে, শিসের শব্দটা কী, আমি জানতে চাই।–ওইটা নিশ্চয় গাঁয়ের সরাইখানা?

হ্যাঁ।

ওখান থেকে আপনার ঘরের জানলা দেখা যায়?

যায়।

তাহলে ডাক্তার ফিরে আসার পর মাথা ধরার অছিলায় আপনার ঘরে ঢুকে পড়বেন। যখন বুঝবেন উনি শুয়ে পড়েছেন, জানলা খুলে বাতিটা পাশে রাখবেন–যাতে সংকেত আলো দেখতে পাই। তারপর দরকারি জিনিসপত্র নিয়ে আপনার পুরোনো ঘরে চলে যাবেন।

মিস স্টোনার হোমসের বাহু স্পর্শ করে বললে, আমার বোন মারা গিয়েছে কেন, আপনি তা আঁচ করেছেন মনে হচ্ছে?

করেছি।

ভয়ে?

না। আরও স্পষ্ট হোক কারণটা, তারপর বলব।

চলে এলাম সরাইখানায়। ওপরতলায় এমন একটা ঘর বেছে নিলাম যেখান থেকে জীর্ণ প্রাসাদে মিস স্টোনারের ঘর দেখা যায়। বৈঠকখানা ঘরে আলো জ্বলে উঠল ডাক্তার রয়লট ফিরে আসার পরেই। ভদ্রলোক যে ভয়ঙ্কর রেগে আছে তা দূর থেকেই বোঝা গেল। গেট খুলতে একটু দেরি করছিল গাড়োয়ান–তাতেই এই মারে কি সেই মারে ভাব দেখা গেল। সেইসঙ্গে বাজখাই চিৎকার।

অন্ধকারে ঘরের জানলায় বসে এইসব দেখছি, এমন সময়ে হোমস বললে, ওয়াটসন, আজকের অভিযানে বিপদ আছে। তোমাকে নিয়ে যেতে মন চাইছে না।

কীসের বিপদ? আমি যা দেখছি, তুমিও তা দেখেছ? তবে?

ভেন্টিলেটরটা দেখলে তো?

দুর! অত ছোটো ফুটো দিয়ে উঁদুর পর্যন্ত গলতে পারবে না।

ভায়া, এখানে আসার আগেই জানতাম ও-রকম একটা ফুটো আছে।

মাই ডিয়ার হোমস!

আরে, এটা বুঝছ না কেন, ফুটো না-থাকলে নিজের ঘরে বসে জুলিখা পাশের ঘরে চুরুট খাওয়ার গন্ধ পেতেন কী করে?

কিন্তু তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল?

ভেন্টিলেটর তৈরি হল, দড়ি ঝোলানো হল, বিছানায় শুয়ে একটি মেয়ে মারা গেল। তিনটে ঘটনার যোগসূত্র কি বিচিত্র নয়?

তিনটে ঘটনার মধ্যে আদৌ কোনো যোগসূত্র আছে বলেই মনে হয় না আমার।

বিছানাটার বৈশিষ্ট্য দেখেছিলে?

না তো।

চারটে পায়াই মেঝেতে আঁটা। ইচ্ছে করলেও সরিয়ে শোয়া যায় না। ঘণ্টার মেকি দড়ির তলাতেই রাখতে হবে।

হোমস! হোমস! সাংঘাতিক ক্রাইমের গন্ধ পাইছি। একটু একটু বুঝতে পারছি কী বলতে চাইছ।

ভায়া ডাক্তারদের বিদ্যে থাকে, বুদ্ধি থাকে। তারা যদি ক্রাইমে নামে, তাদের চেয়ে বড়ো ক্রিমিন্যাল আর হয় না। এখন আর কথা নয়–তামাক খাওয়া যাক।

রাত নটায় অন্ধকার গ্রাস করল জীর্ণ সৌধকে। এগারোটায় একটা উজ্জ্বল আলো দেখা গেল অন্ধকারে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হোমস।

সংকেত এসে গেছে। ঠিক মাঝের ঘরেই আলো জ্বলছে। চলো।

বাগানে পৌঁছে জুতো খুলে পা টিপে টিপে কিছুদুর যেতেই গাছের মধ্যে বিকলাঙ্গ শিশুর মতো কী-একটা সড়াৎ করে মাঠে নেমে গড়াগড়ি দিয়ে ফের সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল গাছের আড়ালে। দারুণ চমকে উঠলাম আমি। সবলে আমার হাত খামচে ধরল হোমস।

তারপরেই নিঃশব্দে হেসে বললে, বেবুনটা।

বেবুন তো বুঝলাম, চিতাও তো আছে। ভাবতেই গা হিম হয়ে এল। ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে তবে নিশ্চিন্ত হলাম।

খড়খড়ি বন্ধ করল হোমস। নিজে বসল বিছানায়, পাশে মোমবাতি আর দেশলাই, হাতে একটা সরু বেত। আমি বসলাম চেয়ারে, হাতে রিভলভার। বাতি নিভিয়ে দিল হোমস।

অন্ধকার। কোথাও এতটুকু আলোকরশ্মি নেই। দুরের গির্জেয় পনেরো মিনিট অন্তর বাজছে ঘন্টা। খড়খড়ির বাইরে একবার চাপা ঘর-ঘর আওয়াজ শুনলাম। অর্থাৎ চিতাবাঘটা সত্যিই টহল দিচ্ছে বাগানে।

সেই উৎকণ্ঠা, সেই উদবেগ, সেই প্রতীক্ষা জীবনে আমি ভুলব না।

রাত তিনটের ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পর আচমকা ভেন্টিলেটরে যেন আলোর ঝিলিক দেখলাম। সেইসঙ্গে নাকে ভেসে এল পোড়া তেল আর ধাতু তেতে ওঠার গন্ধ। অর্থাৎ চোরা লণ্ঠন জ্বলছে পাশের ঘরে। হাঁটাচলার মৃদু শব্দও কানে ভেসে এল। তারপর আধঘণ্টা আর কোনো শব্দ নেই। পোড়া গন্ধটা কিন্তু বেড়েই চলেছে। এর ঠিক পরেই একটা নতুন শব্দ শুনলাম।

সোঁ-সোঁ করে একনাগাড়ে যেন স্টিম বেরিয়ে যাচ্ছে কেটলি থেকে।

শব্দটা কানে যেতেই হোমস বিছানা থেকে ছিটকে ফস করে দেশলাই ঘষে সপাং সপাং করে বেত হাঁকিয়ে চলল দড়িটার ওপর।

সেইসঙ্গে চেঁচাতে লাগল আতঙ্ক বিহ্বল কণ্ঠে, ওয়াটসন! দেখেছ? ওয়াটসন! দেখেছ?

কী দেখব আমি? হঠাৎ আলো জ্বালানোয় চোখ ধাঁধিয়ে গিয়েছিল–কিন্তু একটা চাপা শিসের শব্দ ভেসে এসেছিল কানে। তারপরেই ওইভাবে পাগলের মতো বেত মারা।

দেখেছিলাম শুধু হোমসের মুখের চেহারা। আতঙ্কে, ঘৃণায়, বিভীষিকায় পিরবর্ণ সে-মুখ যেন চেনাই যায় না।

মার বন্ধ করে ভেন্টিলেটররের দিকে চেয়েছিল হোমস। আচমকা নিশীথ রাতের নৈঃশব্দ্য খান খান করে জাগ্রত হল একটা অতি ভয়াবহ আর্ত চিক্কার জীবনে এমন রক্ত জমানো মরণ হাহাকার আমি শুনিনি। ক্রমশ পর্দা চড়তে লাগল চিৎকারের–আতীব্র যন্ত্রণা নিঃসীম আতঙ্ক আর অপরিসীম ক্রোধ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল সব শেষের বুকফাটা চিৎকারটার মধ্যে। লোমহর্ষক সেই চিৎকার শুনে নাকি গাঁয়ের সবাই বিছানায় উঠে বসেছিল–গাঁয়ের বাইরেও অনেকের ঘুম ছুটে গিয়েছিল। অবর্ণনীয় সেই চিৎকার সাপের মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অবশ করে তুলল আমাদের চিত্ত–ফ্যালফ্যাল করে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম আমি আর হোমস। আস্তে আস্তে প্রতিধ্বনির শেষ রেশ মিলিয়ে গেল দূর হতে দূরে–আবার টুটি টেপা নৈঃশব্দ্য চেপে বসল নিশীথ রাতের বুকে।

বললাম রুদ্ধশ্বাসে, এ আবার কী?

সবশেষ। পিস্তল নাও, চলো ডা. রয়লটের ঘরে।

গম্ভীর মুখে বাতি জ্বালল হোমস। করিডরে বেরিয়ে দু-বার ধাক্কা মারল দরজায়–সাড়া এল। তখন হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ঢুকল ভেতরে ঠিক পেছনে উদ্যত পিস্তল হাতে আমি।

দেখলাম এক অসাধারণ দৃশ্য। দেখলাম, টেবিলের ওপর জ্বলছে একটা আঁধার লণ্ঠন–শাটারটা অর্ধেক খোলা। তির্যক রশ্মিরেখা গিয়ে পড়ছে পাল্লা সিন্দুকের ওপর। টেবিলের পাশেই চেয়ারে বসে ডা. গ্রাইমসবি রয়লট। পরনে ধূসর লম্বা ড্রেসিং-গাউন, নগ্ন গোড়ালি দেখা যাচ্ছে তলার দিকে, পায়ে লাল তুর্কি চটি। বিকেল বেলা ফসওলা যে-চাবুকটা দেখে অবাক হয়েছিলাম, কোলের ওপর রয়েছে সেই চাবুকখানি। চিবুক ওপরে তোলা, ভয়াবহ আড়ষ্ট চাহনি নিবদ্ধ কড়িকাঠের দিকে, কপাল ঘিরে একটা অদ্ভুত হলদে পটি। ছিট-ছিট বাদামি দাগ দেওয়া ডোরাকাটা পটি! খুব আঁট করে যেন মাথায় বেড় দিয়ে রয়েছে বিচিত্র সেই পটি। আমরা ঘরে ঢুকলাম, ডাক্তার কিন্তু নড়লেন না, কথাও বললেন না।

ডোরাকাটা পটি? ফুটকি দাগ দেওয়া ডোরাকাটা সেই পটি! ফিসফিস করে বললে হোমস।

এক পা এগিয়েছিলাম আমি। অমনি নড়ে উঠল মাথার আশ্চর্য পাগড়ি। সরসর করে খুলতে লাগল বেড় এবং চুলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল চেপটা রুইতনের মতো একটা মাথা ঘাড় মোটা গা-ঘিনঘিনে একটা সরীসৃপ।

চেঁচিয়ে উঠল হোমস, অ্যাডার সাপ! বাদায় থাকে! ভারতবর্ষের সবচেয়ে বিষধর সরীসৃপ! ছোবল মারার দশ সেকেন্ডের মধ্যে১৪ অক্কা পেয়েছে ডাক্তার। নিজের ফাঁদেই শেষ পর্যন্ত পড়তে হয় কুচক্রীকে অন্যের বুকে ছুরি মারতে গেলে সে-ছুরি নিজের বুকে বেঁধে। যাক,

এখন ডেরায় পাঠানো যাক সরীসৃপ মহাপ্রভুকে। তারপর মিস স্টোনারকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে খবর দেব পুলিশকে।

ঝট করে ডাক্তারের কোল থেকে ফঁস দেওয়া চাবুক তুলে নিয়ে হোমস অ্যাডারের গলায় ফাঁস আটকে টেনে নিয়ে গেল সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ করে দিল পাল্লা।

পরের দিন বাড়ি ফেরার পথে হোমস যা বললে তা এই :

ভায়া ওয়াটসন, জিপসি আর পটির কথা শুনে গোড়া থেকেই ভুল ধারণা করেছিলাম–শুধু একটা ব্যাপার ছাড়া। ওই ভেন্টিলেটরটা চোখ খুলে দেয় আমার। জানলা দিয়ে কিছুই ঢোকা যখন সম্ভব নয়, তখন বুঝলাম ঘুলঘুলির ফুটো দিয়ে এমন কিছুই বেরিয়ে আসে, বিছানা পর্যন্ত যাকে নামবার জন্যে ঝোলানো হয়েছে দড়িটা। ভারতবর্ষের ভয়ানক জীবজন্তু পোষার শখ আছে শুনে সন্দেহ ঘনীভূত হল। রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা যায় না এমন বিষ যদি শরীরে ঢোকানো যায়, মৃত্যুর কারণ ধরা পড়বে না। ছোবল দেওয়ার ছছাট্ট দুটো ফুটোও অনেকের নজর এড়িয়ে যাবে। শিস দেওয়া হত সাপটাকে ডেকে নেওয়ার জন্যে দুধের লোভও দেখানো হত কিন্তু ঘুমের ঘোরে সাপের ল্যাজে পা দিলে কামড় তো একদিন খেতেই হবে।

এই সিদ্ধান্ত মাথায় নিয়ে ঢুকলাম ডাক্তারের ঘরে। চেয়ার পরীক্ষা করলাম দেখলাম ডাক্তার তাতে উঠে দাঁড়ায়। নইলে তো ভেন্টিলেটরের নাগাল ধরা যাবে না। ফঁসওলা চাবুক, লোহার সিন্দুক আর দুধ দেখে১৫ কোনো সন্দেহই আর রইল না। ঝনঝনঝনাৎ

আওয়াজটা আসলে লোহার সিন্দুকের ডালা বন্ধ করার আওয়াজ–সরীসৃপকে সিন্দুকে চালান করে সিন্দুক বন্ধ করেছিল ডাক্তার। সাপের ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনেই বেত মেরে ভাগিয়ে দিলাম যার কাছ থেকে এসেছে–তারই কাছে। মার খেয়ে সামনে যাকে পেয়েছে তাকেই ছোবল মেরেছে। সুতরাং লোকে বলবে আমিই হয়তো ডা. গ্রাইমসবি রয়লটের মৃত্যুর কারণ। তাতে আমার বিবেক কোনোদিন কাতর হবে না।

টীকা

১. ডোকাটা পটির রোমাঞ্চ উপাখ্যান : প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৮৯২-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে। মূল নাম দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য স্পেকল্ড ব্যান্ড।

২. আট বছরে সত্তরটি : এই হিসেবে এগোলে ১৯০৩-এর অক্টোবরে, হোমস রিটায়ার করার সময়ে, মোট কেসের সংখ্যা দাঁড়াত এক হাজার সাতশোর কাছাকাছি। হিসেব করে বলেছেন ফ্র্যাঙ্ক ওয়াটার্স, তার আপঅন দ্য প্রোবেবল নাম্বার অব কেসেস অব মি. শার্লক হোমস-এ।

৩. স্টোক মোরান : লেদারহেডের মাইল তিনেক দূরে অবস্থিত স্টোক ডিঅ্যাবারনন-কে হয়তো নাম বদলে স্ট্রোক মোরান করেছেন লেখক।

৪. বেঙ্গল আর্টিলারি : সিপাই বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে, ইন্ডিয়ান আর্মির মোট চব্বিশটি ব্যাটেলিয়ানের মধ্যে বারোটিই ছিল বেঙ্গল আর্টিলারির অধীনস্থ। যুদ্ধের পর এদের

সবকটিকে নিয়ে আসা হয় রয়্যাল আর্টিলারির আওতায়। অর্থাৎ সৈনিকরা ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে ব্রিটিশ আর্মির অন্তর্ভুক্ত হন।

৫. দুই বোনকে দিতে হবে : আ কেস অব আইডেন্টিটি গল্পে অনেকটা এই ধরনের ঘটনা লক্ষ করা যায়।

৬. বেদেদের : বেদে বা জিপসিরা চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারত থেকে ইউরোপে আসে বলে অনুমান করা হয়। এই যাযাবর গোষ্ঠীরা নিজেদের রোমানী বলে এবং রোমানী ভাষায় কথা বলে। অনেক ক্ষেত্রে শিশু চুরি, সংক্রামক রোগ ছড়ানো, সাধারণ চুরি-চামারি প্রভৃতি এদের অভ্যাস মনে করা হত। এমিলি ব্রন্টির উইদারিং হাইট, জর্জ ইলিয়টের দ্য স্প্যানিশ জিপসি প্রভৃতি উপন্যাসে জিপসিদের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। শার্লক হোমসের গল্প দ্য প্রায়োরি স্কুল, এবং দ্য রেড-হেডেড লিগ এবং উপন্যাস দ্য হাউন্ড অব দ্য বাস্কারভিলস-এও জিপসিদের কথা বলা হয়েছে।

৭. চিতাবাঘ : চিতা আফ্রিকায় লভ্য। ভারতে যা পাওয়া যায়, তা হল প্যান্থার।

৮. বেবুন : বেবুনের প্রাপ্তিস্থান আফ্রিকা এবং আরব উপদ্বীপ। ভারতবর্ষে অবশ্য কালো রঙের কলোবাস বাঁদর পাওয়া যায়, তবে সেগুলিকে বেবুন বলা যায় না।

৯. বাঁ-হাতে দেশলাই, ডান হাতে একটা পোড়া কাঠি : মৃত্যুর পরও দেখা যাচ্ছে জুলিয়ার এক হাতে দেশলাই, অন্য হাতে পোড়াকাঠি ধরা আছে। তাহলে জুলিয়া কোন হাত দিয়ে দরজার লক খুলল?

১০. জানোয়ারের মতো ব্যবহার করা হয়েছে : আঠারোশো আশির দশকের শেষদিকে রেভারেন্ড বেঞ্জামিন ও এবং আরও কয়েকজনের উদ্যোগে শিশুদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা নেওয়া আরম্ভ হয়। আমেরিকায় এই ধরনের উদ্যোগ শুরু হয় মেরি অ্যালেন ম্যাককরমিকের নেতৃত্বে নিউইয়র্কে। ১৮৭৫-এ নিউইয়র্কে প্রতিষ্ঠিত হয় নিউইয়র্ক সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব জুয়েলটি টু চিলড্রেন। এরই অনুকরণে ১৮৮৯ সালে লন্ডনে প্রতিষ্ঠা করা হয় ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন অব ক্রুয়েলটি টু চিলড্রেন। এই সোসাইটি আসলে ১৮৮৪-তে রেভারেন্ড ও-র প্রতিষ্ঠিত সোসাইটিরই সরকারি রূপ। রানি ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ছিলেন এর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষক এবং রয়্যাল পেট্রন। সোসাইটির ইনস্পেকটররা হেঁটে বা সাইকেলে টহল দিতেন শিশুদের সাহায্যার্থে। অবশ্য হেলেন স্টোনারের যা বয়স, তাতে সে এই সোসাইটির আওতায় আসত না।

১১. এখন ৭৫০ পাউন্ড : এইভাবে আয় কমে যাওয়ার কারণ কি ইংলন্ডের বাজারে ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৪-এ কৃষিজাত পণ্যের দাম পড়ে যাওয়া?

১২. আতঙ্কে : শার্লক হোমস আতঙ্কিত, এমন ঘটতে দেখা গিয়েছে দ্য ডেভিলস ফুট গল্পে। তবে সেই ঘটনা ওষুধের প্রভাবে ঘটেছিল।

১৩. অ্যাডার সাপ : অ্যাডার বা ভাইপার পাওয়া যায় এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপে। এরা এক থেকে ছয় ফুট লম্বা হয়ে থাকে। তবে বাদায় থাকা আলাদা কোনো ভাইপারের কথা জানা যায় না।

১৪. দশ সেকেন্ডের মধ্যে : সব থেকে তাড়াতাড়ি মৃত্যু ডেকে আনে কেউটের বিষ। তবে তাতে দশ সেকেন্ডের অনেক বেশি সময় লাগে।

১৫. দুধ দেখে : জীববিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, কোনো সাপই দুধ বা অন্য কোনো তরল পদার্থ খেতে পারে না।

# নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য ব্লু কারবাঙ্কল]

বড়োদিনের দু-দিন পরে মঙ্গল কামনা করতে গিয়েছিলাম বন্ধুবর শার্লক হোমসের আস্তানায়। ঘরে ঢুকে দেখলাম আরামকেদারায় শুয়ে আছে সে। গায়ে বেগনি ড্রেসিং গাউন, হাতের কাছে তাক ভরতি তাম্রকূট সেবনের পাইপ, সদ্যপড়া খবরের কাগজের উঁই, একটা বিতিগিচ্ছিরি থেঁতলানো শতচ্ছিদ্র পশমের গোল টুপি, আতশকাচ আর ফরসেপস, মানে সন্না। অর্থাৎ টুপি পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ।

বললাম, কাজে বাগড়া দিলাম মনে হচ্ছে?

আরে বোসো। টুপি দেখিয়ে–ব্যাপারটা সামান্য, কিন্তু সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি অসামান্য।

সাংঘাতিক অপরাধ নাকি?

না, না অপরাধ-টপরাধের ব্যাপার এটা নয়–কিন্তু বেশ বিদঘুটে।

তার মানে আইন ভাঙা হয়নি, কিন্তু রহস্যময়? এ-রকম তিনটে কেস এর আগেও লিখেছি।

সেইরকমই বটে। পিটারসনকে চেনো তো?

ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান?

হ্যাঁ। টুপিটা তারই আবিষ্কার! মালিক কে, কোথায় থাকে জানা যায়নি। বড়োদিনের দিন ভোর চারটে নাগাদ টটেনহ্যাম কোর্ট রোড দিয়ে ফেরবার সময়ে ও দেখে সাদা রাজহংসী কাঁধে তালঢ্যাঙা একটা লোক টলতে টলতে যাচ্ছে। আচমকা কতকগুলো গুন্ডার সঙ্গে লাগল কথা কাটাকাটি, শেষে মারামারি। ঢ্যাঙা লোকটার টুপি লাঠির ঘায়ে ছিটকে যেতেই সে লাঠি তুলল মারবার জন্যে লাঠি লাগল পেছনে দোকানে জানলার কাচে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল কাচ। গুন্ডাদের হাত থেকে তাকে বাঁচানোর জন্যে পিটারসন তখন সেদিকেই দৌড়েছে। লোকটা কিন্তু কাচ ভাঙার জন্যে হকচকিয়ে গেছিল। এমন সময়ে ইউনিফর্ম পরা পিটারসনকে দৌড়ে আসতে দেখে পুলিশ ভেবে ভোঁ দৌড় দিল সেখান থেকে রাজহাঁসটা ফেলে গেল রাস্তায়।

পিটারসন বেচারা পড়ল মহা ফাঁপরে। রাজহাঁসের বাঁ-পায়ে ছোট্ট একটা কার্ডে কেবল লেখা : মিসেস হেনরি বেকারের জন্যে। টুপির লাইনিংয়েও H.B. অক্ষর দুটি সুতো দিয়ে লেখা। কাকে ফিরিয়ে দেবে রাজহাঁস বুঝতে না-পেরে পিটারসন এল আমার কাছে। ও তো জানে সমস্যা যত সাধারণই হোক না কেন, আমি কখনো নারাজ হই না। এই দু-দিন বহাল তবিয়তেই ছিল রাজহাঁস... এখন নিয়ে গেছে পিটারসন–এতক্ষণে রান্নাও বোধ হয় আরম্ভ হয়ে গেছে। যার হাঁস তার ভোগে লাগল না, এইটাই যা দুঃখ। টুপিটা কেবল রেখেছি মালিককে ফেরত দেওয়ার জন্যে।

ঠিকানা তো জান না, ফেরত দেবে কী করে?

ঠিকানা এই টুপি থেকেই উদ্ধার করব।

কী যে বল!

বিশ্বাস হল না? বেশ, এই নাও তোমার আতশকাচ। আমার পরীক্ষা পদ্ধতি তুমি জান। দেখি, টুপি দেখে টুপির মালিককে কীরকম আঁচ করতে পার।

উলটেপালটে দেখলাম জীর্ণ, বিধ্বস্ত, শ্রীহীন টুপিটা। অত্যন্ত মামুলি ফেল্ট টুপি, রং কালো, আকারে গোল, বেশ শক্ত, লাল লাইনিং একপাশে লেখা দুটো অক্ষর–H.B. আলনায় ঝুলিয়ে রাখতে গিয়ে কয়েক জায়গায় ছাদা হয়ে গেছে, ধুলো যে কোথায় লাগেনি বলা মুশকিল, অনেক রকমের দাগও লেগেছে–কালি বুলিয়ে সে-দাগ ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে। ছিরিছাঁদ একেবারেই নেই–তার ওপর বহু ব্যবহারের ফলে অবস্থা বেশ কাহিল। একটা ঢাকনা পরানো হয়েছে টুপি যাতে বেশি নষ্ট না হয়। ইলাস্টিক ছিঁড়ে গেছে।

ফিরিয়ে দিলাম টুপি। বললাম, কিছুই দেখছি না।

উঁহু, একেবারে উলটো বললে। সবই দেখেছ। কিন্তু চোখের দেখাকে মনের যুক্তি দিয়ে সাজাতে পারছ না। সিদ্ধান্ত নিতে গেলেই ঘাবড়ে যাও বড্ড।

বেশ তো, তোমার সিদ্ধান্তটাই শোনা যাক না।

নিবিড় চোখে, টুপির দিকে তাকিয়ে রইল হোমস। চাহনির মধ্যে ফুটে উঠল সেই অন্তর্মুখিতা–যা ওর বৈশিষ্ট্য।

বলল আত্মনিমগ্ন কণ্ঠে, লোকটা মাথা খাঁটিয়ে খায়। এখন একটু টানাটানি চলছে—বছর তিনেক আগে অবস্থা সচ্ছল ছিল। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে পারত এককালে এখন সে-গুণ গোল্লায় গেছে–ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনা বা দূরদৃষ্টি আর নেই। নৈতিক অধঃপতন থেকেই তা সম্ভব হয়েছে খুব সম্ভব মদ ধরেছে–বউয়ের ভালোবাসা হারিয়েছে সেই কারণেই। সম্পত্তি খুইয়েছে নেশা করতে গিয়েই।

ভায়া হোমস! বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে কিন্তু!

ইদানীং লোকটা আত্মসম্মান কিছুটা রাখতে পারছে। কুঁড়ে, ঘরকুনো, হাতের কাজে আনাড়ি, লাইম-ক্রিম মাখে, চুলের রং ধূসর। চুল কেটেছে এই সেদিন, মাঝবয়েসি, বাড়িতে গ্যাসের ব্যবস্থা বোধ হয় নেই।

খুব ঠাট্টা জুড়েছ দেখছি!

এত স্পষ্ট করে বলার পরেও কিছু ধরতে পারছ না।

মানছি আমার মাথায় ঘিলু কম। কিন্তু বুঝলে কী করে যে টুপির মালিক মাথা খাঁটিয়ে খায়?

টুপিটা নিজের মাথায় দিল হোমস–কপাল ছাড়িয়ে এল নাক পর্যন্ত। বলল, দেখলে? এত বড়ো যার মাথার সাইজ, সে মাথা খাঁটিয়ে খাবে না তো কি গতর খাঁটিয়ে খাবে?

সম্পত্তি খুইয়েছে বুঝলে কী করে?

এই ফ্যাশনের টুপি বছর তিনেক আগে চালু ছিল, দামও খুব বেশি। সুতরাং তিন বছর আগে এত দামি টুপি কেনার যার ক্ষমতা ছিল, তিন বছরেও আরও একটা টুপি কিনতে পারেনি দেখে কি মনে হয় না তার অবস্থা পড়ে গেছে?

দূরদৃষ্টি হারিয়েছে বললে কেন? নৈতিক অধঃপতনের খবরই-বা জানলে কী করে?

আগে দূরদৃষ্টি ছিল বলেই ধুলো হাওয়া থেকে টুপি রক্ষে করার জন্যে ঢাকনা পরিয়েছিল! এখন দূরদৃষ্টি নেই বলেই ইলাস্টিক ছিঁড়ে যাওয়া সত্ত্বেও নতুন করে লাগায়নি! স্বভাব প্রকৃতিও যে কমজোরি হয়ে আসছে–এটাও তার প্রমাণ। তবে আত্মসম্মান সম্বন্ধে সজাগ বলেই কালি বুলিয়ে দাগ ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে।

সদ্য চুল ছেঁটেছে বলেই কাঁচিতে কাটা কুচো চুল লেগে ভেতরে, লাইমক্রিমের গন্ধও বেশ নাকে আসছে, বাদামি ধুলোটা রাস্তার ধুলোবালি নয়–ভেতরকার, অর্থাৎ ঘরকুনো মানুষ। ভেতরটা ভিজে ভিজে চটচটে, মানে চট করে মাথা ঘেমে যাওয়ার অভ্যেস আছে। যারা বেশি মাথা খাটায় হাতে কম কাজ করে–তাদের মাথাই টুপির ভেতরে এইভাবে ঘামে।

স্ত্রী আগের মতো ভালোবাসেন না তুমি জানলে কী করে?

ভালোবাসলে রোজ বুরুশ দিয়ে টুপির ধুলো ঝেড়ে দিতেন। কিন্তু এ-টুপিতে ধুলো চামাটি ধরে গেছে।

হয়তো বিয়েই করেনি।

দুর! বউকে তোয়াজ করার জন্যেই তো হাঁসের ডান পায়ে চিরকুট ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল ঘাড়ে করে।

বাড়িতে গ্যাস নেই কে বলল তোমাকে?

পাঁচ জায়গায় চর্বি মোমের দাগ রয়েছে। এক হাতে টুপি আর এক হাতে জ্বলন্ত মোম নিয়ে ওপর তলায় উঠেছেন বলেই এমন হয়েছে। বাড়িতে গ্যাসের আলো থাকলে কি চর্বি-মোমের ফেঁটা পড়ত তা থেকে?

হোমসের বুদ্ধির তারিফ করলাম। হোমস জবাব দিতে যাচ্ছে এমন সময়ে দড়াম করে খুলে গেল দরজা, ঝড়ের মতো ঢুকল পিটারসন। চোখ-মুখ লাল উত্তেজনায় অস্থির।

বললে রুদ্ধশ্বাসে, স্যার, স্যার, সেই রাজহাঁসটা।

সে কী! জ্যান্ত হয়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে উড়ে গেল নাকি?

এই দেখুন। হাঁসের গলার থলিতে আটকে ছিল! আমার বউ তো হতভম্ব! বলে হাতের তেলোয় একটা মটরের দানার মতো আশ্চর্য উজ্জ্বল নীলচে মণি দেখাল পিটারসন। যেন লক্ষ রোশনাই ছিটকে গেল হাত নাড়াতেই। সোজা হয়ে বসল শার্লক হোমস আঁতকে উঠে আমি বললাম, আরে সর্বনাশ! এই কি সেই নিখোঁজ রত্ন? কাউন্টেস অফ মোরকারের নীলকান্ত পদ্মরাগ?

ধরেছ ঠিক। ক-দিন ধরেই টাইমস কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। শুধু পুরস্কারই দেওয়া হবে হাজার পাউন্ড–যা ওর আসল দামের বিশ ভাগের এক ভাগও নয়।

মাথা ঘুরে গেল পিটারসনের। ধপ করে বসে পড়ল চেয়ারে।

হোমস বললে, কাউন্টেস তো শুনছি তাঁর আধখানা সম্পত্তিও দিতে রাজি এই মণির বিনিময়ে ব্যাপারটা সেন্টিমেন্টাল।

মণি তো হারিয়েছিল কসমোপলিটান হোটেলে? বললাম আমি।

হ্যাঁ। পাঁচ দিন আগে জন হার্নার নামে এক পাইপ সারানোর মিস্ত্রি নাকি রত্নটা লোপাট করে গয়নার বাক্স থেকে। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল পুরো ব্যাপারটা।

কাগজের ডাঁই থেকে একখানা কাগজ তুলে নিয়ে পড়ে শোনাল হোমস :

হোটেল কসমোপলিটানে মণি লুঠ! ছাব্বিশ বছর বয়স্ক প্লাম্বার জন হর্নারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে কাউন্টেস অফ মোরকারের নীলকান্ত পদ্মরাগ মণি চুরির অপরাধে। ঘটনাটা ঘটে এ-মাসের বাইশ তারিখে কসমোপলিটান হোটেলে। চুল্লির একটা শিক হঠাৎ ঢিলে হয়ে গিয়েছিল বলে হোটেল পরিচালক জেমস রাইডার ডেকে আনেন হর্নারকে। কিছুক্ষণ হর্নারের সঙ্গেই ছিলেন তিনি, তারপর অন্যত্র যান কাজের তাড়ায়। ফিরে এসে দেখেন হর্নার অদৃশ্য, আলমারির কপাট ভাঙা, আর একটা গয়নার বাক্স ডালা খোলা অবস্থায় পড়ে টেবিলে। এই দেখেই আতঙ্কে চেঁচিয়ে ওঠেন রাইডার, ছুটে আসে কাউন্টেসের পরিচারিকা ক্যাথরিন কুশাক। ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট হর্নারকে যখন গ্রেপ্তার করতে যান, তখন সে ভীষণ চেঁচামেচি করে, আর ধস্তাধস্তি করে। বিনা দোষে তাকে নাকি গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। কিন্তু আগেও একবার চুরির দায়ে হর্নার জেল খেটেছে

শুনে বিচারপতি তাকে উচ্চতর আদালতে সোপর্দ করেছেন। বিচারের সময়ে তার চোখে অনুতাপের যন্ত্রণা ফুটে উঠতে দেখা যায় এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

পড়া শেষ করে হোমস বললে, হুম! এ তো গেল আদালতের খবর। কিন্তু নীলকান্ত পদ্মরাগ হাঁসের পেটে গেল কী করে এবং হেনরি বেকার মশায় ওইরকম শ্রীহীন টুপি মাথায় দিয়ে সেই রাজহাঁস ঘাড়ে করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন কেন, এবার তা জানতে হবে। বেশ রহস্যজনক ব্যাপার, তাই না ওয়াটসন? সান্ধ্য কাগজগুলোয় বিজ্ঞাপন দিতে হবে দেখছি।

কী বলবে বিজ্ঞাপনে?

পেনসিল আর কাগজ দাও, লেখা যাক। এবার শোনো :

গুজ স্ট্রিটের মোড়ে একটা রাজহংসী আর একটা কালো পশমের টুপি পাওয়া গেছে। আজ সন্ধে সাড়ে ছটায় ২২১বি বেকার স্ট্রিটে এসে মিস্টার হেনরি বেকার নিয়ে যেতে পারেন।

কিন্তু হেনরি বেকারের চোখে পড়বে তো?

বন্ধুবান্ধবের চোখেও তো পড়তে পারে মিস্টার হেনরি বেকারের নাম দেখলেই তাকে খবরটা জানিয়ে দেবে। সবকটা সান্ধ্য দৈনিকে বেরুবে বিজ্ঞাপনটা।

মণিটা?

আমার কাছেই থাক। পিটারসন, একটা ভালো দেখে বদলি রাজহাঁস কিনে দিয়ে যেয়ো–ফেরত দিতে হবে তো।

পিটারসন বিদেয় হতেই ঝলমলে মণিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে হোমস বললে, সামান্য একটা কার্বনের ডেলাবই তো নয়—বয়স এখনও কুড়ি বছরও হয়নি—ওজনও মাত্র চল্লিশ গ্রেন পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ চীনের অ্যাময় নদীর তীরে পদ্মরাগ মণি চুনির মতো লাল হয়, এ হল নীলকান্ত। এইটেই এর বৈশিষ্ট্য। তাই এত কম বয়সেই এর জন্যে দুটো খুন, একবার অ্যাসিড নিক্ষেপ, একটা আত্মহত্যা এবং বেশ কয়েকবার ডাকাতি হয়ে গেছে। বড়োই কুটিল অতীত। কাজেই আপাতত থাকুক আমার সিন্দুকে। কাউন্টেসকে খবর পাঠাব পরে।

হর্নার কি নির্দোষ?

বলা মুশকিল। তবে হেনরি বেকার নির্দোষ বলেই মনে হয়। গরিব মানুষ, ভাবতে পারেননি যাকে কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন, তার দাম নিরেট সোনার হাঁসের চাইতেও বেশি। আসুক বিজ্ঞাপনের জবাব, তখন বোঝা যাবে।

তাহলে আমি রুগি দেখতে চললাম, আসব সন্ধের সময়ে। ব্যাপারটার রহস্যমোচন ঘটে কী করে দেখতে হবে।

যথাসময়ে বেকার স্ট্রিটের বাসাবাড়ির সামনে পৌঁছে দেখি লম্বা মতো এক ভদ্রলোক গলা পর্যন্ত বোতাম আঁটা কোট গায়ে দিয়ে মাথায় স্কচ টুপি১৩ পরে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি আসতেই দরজা খুলে গেল। দুজনেই উঠে গেলাম হোমসের ঘরে।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হোমস বললে, বসুন, মি. হেনরি বেকার। এত ঠান্ডায় বড্ড পাতলা কোট পরে বেরিয়েছেন–বসুন আগুনের সামনে। এই টুপি আপনার তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমারই।

ভদ্রলোকের বেশ দোহারা চেহারা, গোল কাধ, বিরাট মাথা, প্রশস্ত বুদ্ধিদীপ্ত মুখ, তলার দিকটা সরু হয়ে এসে ঠেকেছে ছুঁচোলো ধূসর-বাদামি দাড়িতে। নাক থুতনি ঈষৎ লালচে, হাত কাঁপছে থির থির করে। দেখে মনে পড়ে গেল হোমসের আন্দাজি কথাগুলো। শার্ট পরেননি–কোটের কলার তুলে দিয়ে গলা পর্যন্ত এঁটেছেন। কবজি খুবই সরু। কথা বলেন কাটাকাটা স্বরে–শব্দ বাছাইয়ের যেন বেশ বাছবিচার আছে, যেন ভাগ্যের হাতে মার খেয়েছেন শিক্ষিত খানদানি এক পুরুষ।

হোমস বললে, ভেবেছিলাম কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন।

কাষ্ঠ হেসে ভদ্রলোক বললেন, পয়সা কোথায় যে বিজ্ঞাপন দেব? আগে ছিল–এখন অযথা খরচ করতে মন চায় না। আমি ভেবেছিলাম গুন্ডার দল টুপি আর হাঁস নিয়ে পালিয়েছে।

হাঁসটা কিন্তু আমাদের পেটে চলে গেছে।

অ্যাঁ! লাফিয়ে উঠলেন হেনরি বেকার।

বদলি হাঁস একটা রেখেছি–ওই দেখুন। ওজনে একই।

আঃ, বাঁচালেন!

আপনার হাঁসের পালক, পা, গলার থলি অবশ্য রেখেছি। যদি চান তো—

অট্টহেসে হেনরি বেকার বললেন, কী যে বলেন! মরা পাখির পালক নিয়ে আমি কী করব? টাটকা পাখিটাকে দিন, বিদেয় হই।

আড়চোখে আমার দিকে চেয়ে নিল হোমস।

বলল, এই নিন আপনার জিনিস। আচ্ছা, হাঁসটা কিনলেন কোত্থেকে দয়া করে বলবেন? এ-রকম প্রথম শ্রেণির রাজহাঁস বড়ো একটা দেখা যায় না।

উঠে দাঁড়িয়ে হেনরি বেকার ততক্ষণে হাঁস আর টুপি বগলদাবা করে ফেলেছেন। বললেন, মিউজিয়ামের কাছে আলফা-ইনের মালিক উইন্ডিগেট একটা রাজহংসী ক্লাব খুলেছিল। ফি হপ্তায় কয়েক পেনি জমা রাখলেই বড়োদিনে পাওয়া যাবে একটা হাঁসপাখি। আমিও চাদা দিয়েছিলাম তাই পেয়েছিলাম ওই হাঁস। চললাম। বিদেয় হলেন হেনরি বেকার। হোমস বললে, দেখলে তো ভদ্রলোক নির্দোষ। মণির খবর রাখেন না। তোমার যদি খুব খিদে না-পেয়ে থাকে, চলো একটু খোঁজখবর নিয়ে আসা যাক।

চলো।

বেরিয়ে পড়লাম শীতের রাতে। ডাক্তার-পাড়ার মধ্যে দিয়ে অনেক রাস্তা পেরিয়ে পৌঁছোলাম আলফা-ইন সরাইখানায়১৫। দু-গেলাস বিয়ারের হুকুম দিয়ে মালিককে হোমস বললে, তোমার হাঁসের মতো বিয়ারটাও আশা করি অতি উত্তম হবে।

আমার হাঁস! আকাশ থেকে পড়ল সরাইওলা।

আরে হ্যাঁ। এইমাত্র হেনরি বেকারের কাছে তোমার সুখ্যাতি শুনে এলাম।

তাই বলুন। ও হাঁস তো আমি কিনেছি অন্য দোকান থেকে।

কোত্থেকে?

কভেন্ট গার্ডেনের ব্রেকিনরিজের কাছ থেকে। দু-ডজন হাঁস কিনেছিলাম।

আর কথা না-বাড়িয়ে বিয়ারে চুমুক দিল হোমস। শেষ করে বেরিয়ে এলাম বাইরে। হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছোলাম কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটে।

ব্রেকিনরিজ লোকটাকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হল না। বেশ বড়ো দোকানের মালিক। ঘোড়ার মতো চেহারা, মুখটায় যেন শান দেওয়া, পরিপাটি করে ছাঁটা জুলপি। একটা ছোকরা চাকরকে নিয়ে খড়খড়ি বন্ধ করছে।

গুড ইভনিং, বললে হোমস। হাঁস সব বিক্রি হয়ে গেছে দেখছি।

কাল সকালে আসুন, পাঁচশো দেব।

উঁহু, তাতে হবে না।

তাহলে পাশের দোকানে চলে যান।

কিন্তু সুপারিশ করা হয়েছে তোমাকেই।

কে করেছে?

আলফা-ইনের মালিক।

ও হ্যাঁ, দু-ডজন হাঁস কিনেছে বটে।

চমৎকার জাতের হাঁস। কোত্থেকে জোগাড় করেছিলে বল তো?

ভালো জ্বালা দেখছি! রেগে গেল দোকানদার।কোত্থেকে হাঁস পেয়েছি তা নিয়ে আপনার কী দরকার?

কিন্তু এত ছোট্ট ব্যাপারে এ-রকম রেগে উঠছ কেন বুঝছি না।

আরে মশাই এই একই কথা আজ কতবার শুনলাম জানেন? যান, সরে পড়ুন।

কারা তোমাকে জ্বালিয়েছে জানি না কিন্তু আমি এসেছিলাম বাজি জিততে।

বাজি জিততে! উৎসুক দেখা গেল দোকানদারকে।

আরে হ্যাঁ, হাঁসটা পাড়াগাঁয়ের, না শহরের–এই নিয়ে বাজি ধরেছে একজন। আমি বলছি গাঁইয়া পাখি–সে বলছে শহুরে।

তাহলে তো মশাই আপনিই হেরেছেন। এটা খাস লন্ডন শহরের হাঁস।

মোটেই না। এক গিনি বাজি ধরছি!

ধরেছেন? তবে দেখুন।

ঝপাঝপ অনেকগুলো খাতা খুলে ফেলল চোয়াড়ে দোকানদার। দেখিয়ে দিল ২২ ডিসেম্বর ১১৭ নম্বর ব্রিক্সটন রোডের মিসেস ওকশটের কাছ থেকে সাড়ে সাত শিলিং দিয়ে কিনেছিল দু-ডজন হাঁস–সেই হাঁসই বেচেছে উইন্ডিগেটকে বারো শিলিংয়ে।

অকাট্য প্রমাণ। নিজের চোখে ঠিকানা দেখল হোমস। মুখখানা ব্যাজার করে এক গিনি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে পেট ফাটা হাসি হাসল অনেকক্ষণ।

বললে, যখনই কারো জুলপি দেখবে ওইভাবে ছাঁটা আর পকেটে দেখবে গোলাপি রুমালের কোণ বুঝবে তাকে বাজির নেশায় কিস্তিমাত করা যাবে। এক-শো পাউন্ড ঘুস দিতে চাইলেও ওকে নোয়াতে পারতাম না। যাক গে এবার যাওয়ার দরকার মিসেস ওকশটের কাছে। যা শুনলাম, তাতে তো দেখছি আমি ছাড়াও আরও অনেকে হাঁসের ঠিকানা জানতে উঠে-পড়ে লেগেছে। কাজেই

আচমকা ভীষণ চেঁচামেচি শুনলাম। ঘুরে দেখি, দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসেছে ব্রেকিরিজ। ঘুসি তুলে ষাঁড়ের মতো গাঁক গাঁক করে গলাবাজি করছে যাকে লক্ষ করে চেহারার দিক দিয়ে সে নেহাতই ভিজে বেড়াল। মুখটা ইঁদুরের মতো। খর্বকায়। ভয়ে সিটিয়ে গেছে।

ফের যদি ঘ্যান ঘ্যান করতে আসেন তো কুকুর লেলিয়ে দেব। হাঁস কি আপনার কাছ থেকে কিনেছি? মিসেস ওকশটকে নিয়ে আসুন–যা বলবার তাঁকেই বলব।

গুঙিয়ে উঠল খুদে লোকটা, কিন্তু হাঁসের চালানে আমার হাঁসটাও যে মিশে গিয়েছিল।

সেটা মিসেস ওকশটকে গিয়ে বলুন।

মিসেস ওকশট তোমাকেই জিজ্ঞেস করতে বললে।

তাহলে প্রুশিয়ার রাজাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। বেল্লিক কোথাকার! বলে মারমুখো ভঙ্গিমায় তেড়ে গেল ব্রেকিরিজ। চম্পট দিল খর্বকায় লোকটা।

হোমস কানে কানে বললে, আঃ বাঁচা গেল। ব্রিক্সটন রোডে আর কষ্ট করে যেতে হবে না, বলেই পেছন নিল লোকটার। লম্বা লম্বা পা ফেলে ধরে ফেলল একটু পরেই। কাঁধে হাত রাখতেই আঁতকে উঠে লাফিয়ে গিয়ে সে ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে। গ্যাসবাতির আলোয় দেখা গেল নীরক্ত হয়ে গিয়েছে ইঁদুরের মতো মুখখানা।

নরম সুরে হোমস বললে, ব্রেকিরিজকে যা বলছিলেন, আমি তা শুনে ফেলেছি।

কে আপনি?

আমার নাম শার্লক হোমস। যে-খবর প্রাণপাত করেও কেউ জানতে পারে না–আমি তা জেনে ফেলি এবং সেইটাই আমার পেশা।

আমার ব্যাপার আপনি জানেন?

জানি বই কী। আলফা ইন থেকে মি. হেনরি বেকার যে-রাজহাঁসটি এনেছিলেন, সেটি সরাইওলা উইন্ডিগেট কিনেছিল ব্রেকিনরিজের কাছ থেকে।

আঃ কী উপকারই করলেন আমার! চলুন আমার বাড়ি, একটা চলন্ত ঘোড়ার গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলল হোমস, কিন্তু কথা বলছি কার সঙ্গে এখনও জানলাম না।

সামান্য দ্বিধা করল লোকটা। তারপর বলল, আমার নাম জন রবিনসন।

উঁহু, মধুক্ষরা স্বর হোমসের, আসল নামটা বলুন।

মুখ লাল হয়ে গেল খর্বকায় ব্যক্তির, জেমস রাইডার।

ঠিক, ঠিক, হোটেল কসমোপলিটানের পরিচারক। উঠুন গাড়িতে। যা জানতে চান, সব বলব।

জেমস রাইডার গাড়িতে উঠল বটে, কিন্তু মুখ দেখে বোঝা গেল মহা ধাঁধায় পড়েছে। এক চোখে আশা, আর এক চোখে ভয় নিয়ে পর্যায়ক্রমে চাইতে লাগল আমাদের মুখের দিকে। সঘন নিশ্বাস আর হাত কচলানোর মধ্যে ফুটে উঠল নার্ভাসনেস।

আধ ঘণ্টা লাগল বেকার স্ট্রিট পৌঁছোতে। ঘরে ঢুকে আসন গ্রহণ করার পর সোল্লাসে বলল হোমস, আপনি একটা সাদা হাঁসের পেছনে ধাওয়া করেছেন, তার ল্যাজের দিকে কালো ডোরা কাটা। ঠিক তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, লাফিয়ে উঠল জেমস রাইডার।

এই ঘরেই ছিল। খানদানি পাখি। মারবার পরেও একটা রত্ন পেড়ে গেছে। নীল ডিম!

আর একটু হলেই টলে পড়ে যেত রাইডার ম্যান্টলপিস আঁকড়ে ধরে সামলে নিল কোনোমতে। রীতিমতো টলছে তখনও। সিন্দুক খুলে অত্যাশ্চর্য নীলকান্ত পদ্মরাগ তুলে দেখাল হোমস। যেন লক্ষ রোশনাই ঠিকরে গেল পাথর থেকে। মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে রইল রাইডার।

শান্ত কণ্ঠে হোমস বললে, জেমস রাইডার, খেল খতম। আহা পড়ে যাবেন যে! ওয়াটসন, তুমি বরং ওঁকে একটু ব্র্যান্ডি গিলিয়ে দাও। এই ধাত নিয়ে এসব পথে আসা কেন বাপু?

ব্র্যান্ডিতে কাজ হল। ভয়ার্ত চোখে হোমসের দিকে চেয়ে রইল রাইডার।

গম্ভীর গলায় হোমস বললে, রাইডার, কাউন্টেসের নীলকান্ত পদ্মরাগের কথা আপনি জানলেন কী করে?

ক্যাথরিন কুশাক বলেছিল।

কাউন্টেসের সেই পরিচারিকা? পাক্কা শয়তান হওয়ার মতো সব উপাদানই আপনার মধ্যে আছে, জেমস রাইডার। হর্নারের অতীত দুষ্কর্ম আপনি জানতেন। তাই ইচ্ছে করেই কাউন্টেসের ঘরের চুল্লির একটা শিক আলগা করে ডেকে এনেছিলেন এই হর্নারকেই যাতে সন্দেহ তার ঘাড়েই পড়ে। সে বেরিয়ে যেতেই গয়নার বাক্স ভেঙে মণি সরিয়ে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেছিলেন।

দড়াম করে আছড়ে পড়ে খপাত করে বন্ধুবরের দু-পা আঁকড়ে ধরল জেমস রাইডার, আমাকে বাঁচান স্যার। আমি দেশ ছেড়ে চলে যাব। আর কক্ষনো এমন কাজ করব না।

দেখা যাবে কী করা যায়, বজ্রকণ্ঠে বললে হোমস। মণিটা হাঁসের পেটে গেল কী করে? হাঁসটাই-বা দোকানে চালান হল কীভাবে?

বলছি, স্যার, সব বলছি। মণি পকেটে নিয়ে মহা অশান্তিতে পড়েছিলাম। পুলিশ আমার বাড়ি পর্যন্ত সার্চ করতে পারে। কী করি? কোথায় রাখি? শুকনো মুখে গেলাম ব্রিক্সটন রোডে বোনের বাড়ি–ওকশটকে বিয়ে করেছিল সে। হাঁস-মুরগি পালে, বড়ো করে বিক্রি করে। বসে বসে পাইপ খাচ্ছি আর ভাবছি কী করা যায়, এমন সময়ে পায়ের কাছে হাঁস চলতে দেখে একটা জবর বুদ্ধি মাথায় এল। অনেকদিন ধরেই বোন বলছিল, এবার বড়োদিনে সবচেয়ে মোটা একটা হাঁস আমাকে এমনিই দেবে। মণিটা সেইরকম একটা হাঁসকে খাইয়ে দিলেই তো হয়। তারপর হাঁস নিয়ে বাড়ি ফেরা যাবেখন! যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। ল্যাজে কালো ডোরাকাটা একটা হাঁসকে চেপে ধরে মণিটা ঠেলে দিলাম গলায় গিলেও ফেলল কোঁৎ করে কিন্তু এমন প্যাক প্যাক করতে লাগল যে দৌড়ে এল আমার বোন। হাঁসটা সেই ফাঁকে আমার হাত ফসকে মিশে গেল অন্য হাঁসের মধ্যে। বোনকে বললাম, তুই যে একটা হাঁস দিবি বলেছিলি, এবার দে। ও বলল–বেশ তো নাও যেটা খুশি। আমি হাঁসটাকে ধরে এনে মেরে নিয়ে গেলাম বাড়ি। পেট কাটবার পর যখন পাথর খুঁজে পেলাম না–তখন বুঝলাম সর্বনাশ হয়েছে। ভুল করে অন্য হাঁস মেরে এনেছি–আসলটা বোনের বাড়িতেই রয়ে গেছে। তক্ষুনি গেলাম। দেখি, কোনো হাঁসই নেই। বোনকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললে, সব হাঁস চালান হয়ে গেছে কভেন্ট গার্ডেন মার্কেটের ব্রেকিনরিজের দোকানে।

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, ল্যাজে কালো ডোরাকাটা একটা হাঁস ছিল তার মধ্যে?

ছিল। ও-রকম দুটো হাঁস ছিল–হুবহু একরকম।

শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল আমার। বুঝলাম কী কাণ্ড ঘটেছে। ছুটলাম কভেন্ট গার্ডেনে। ব্রেকিনরিজ হাঁস বেচে দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই বলছে না কাকে বেচেছে। সারাদিন কত জিজ্ঞেস করেছি–বার বার হাঁকিয়ে দিয়েছে। আপনারাও শুনলেন কীরকম ব্যবহার করল আমার সঙ্গে। যে-জিনিসের জন্যে এতবড়ো পাপ করলাম ভালো করে তা দেখতে পর্যন্ত পেলাম না।

বলতে বলতে দু-হাতে মুখ ঢেকে ডুকরে উঠল জেমস রাইডার।

তারপর বেশ কিছুক্ষণ নৈঃশব্দ্য চেপে বসল ঘরে। টেবিলের কোণে আঙুল ঠুকে বাজনা বাজিয়ে চলল শার্লক হোমস।

তারপর উঠে গিয়ে দরজা খুলে বলল, দূর হও।

বাঁচালেন! ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন!

আবার কথা! বেরোও বলছি।

দুমদাম করে সিঁড়িতে আওয়াজ শুনলাম, দড়াম করে খুলেই বন্ধ হয়ে গেল সদর দরজা, পায়ের আওয়াজ মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

মাটির পাইপটা তুলে নিয়ে হোমস বললে, ওয়াটসন, দৈবাৎ এ-কেসে নাক গলিয়ে ফেলেছি কাজেই কর্তব্য করে গেলাম। এত ভয় পেয়েছে লোকটা যে হারের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে আর যাবে না–সে বেচারিও খালাস পেয়ে যাবে। পুলিশের মাইনে-করা চাকর আমি নই তাই ক্ষমা করলাম আসল চোরকে। যদি না-করি, যদি জেলে পাঠাই, তাহলে দেখবে সমাজে আর একটা দাগি চোরের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু এখন যা করলাম, এর ফলে আর কোনোদিন এ-পথ ও মাড়াবে না। এবার ঘণ্টা বাজাও। বুনো মুরগির মাংস দিয়ে তদন্ত শুরু করা যাক।

———–

টীকা

১. নীলকান্ত পদ্মরাগের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার : প্রথম প্রকাশ স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিন জানুয়ারি ১৮৯২ এবং নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ১৮৯২-এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। এ ছাড়া ওই সময়েই ফিলাডেলফিয়া এনকোয়ারার এবং অন্য কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় দ্য ক্রিসমাস গুজ দ্যাট সোয়ালোড আ ডায়মন্ড নামে। স্ট্র্যান্ডে প্রকাশিত হয়েছিল দ্য অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য ব্লু কার্বাঙ্কল নামে।

২. রাজহাঁসটা :ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংলন্ডে ক্রিসমাসের ডিনারে রাজহাঁসের রোস্ট খাওয়ার প্রথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তী সময়ে আমেরিকার প্রভাবে হাঁসের জায়গা নেয় টার্কি। পাখির রোস্টের সঙ্গে খাওয়া হত প্লাম-পুডিং এবং মাংসর পিঠে বা পাই।

৩. H.B.: অনেক হোমস-গবেষক লক্ষ করেছেন H.B. আদ্যক্ষর-বিশিষ্ট নামের চরিত্র দেখা গিয়েছে দ্য নোল

ব্যাচেলর এবং ব্ল্যাক পিটার গল্পে।

৪. লাইম-ক্রিম : মাথার চুলের এই জনপ্রিয় ক্রিমে লেবুর গন্ধ ব্যবহার করা হত।

৫. এত বড়ো যার মাথার সাইজ : ভিক্টোরীয় যুগের প্রচলিত ধারণা, যার মাথার আকার বড়, তার বুদ্ধি বেশি। এই ধারণা যে ভুল তা প্রথম বলেন ভিয়েনার অধিবাসী, চিকিৎসক ফ্রানজ যোসেফ গল।

৬. হাঁসের গলার থলি : হাঁসের গলার থলিতে এভাবে কিছু আটকে থাকার সম্ভাবনার বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন জীববিদ্যা-বিশারদ।

৭. নীলকান্ত পদ্মরাগ : পদ্মরাগ বা গানেট সাদা, লাল, সবুজ, হলুদ, কমলা, বাদামি বা হালকা বেগুনি রঙের হলেও নীল কখনো দেখা যায় না।

৮. টাইমস : ১৭৮৫-র পয়লা জানুয়ারি প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্র ডেইলি ইউনিভার্সাল রেজিস্টারের নাম ১৭৮৮ থেকে দ্য টাইমস হয়।

৯. আসল দামের বিশভাগের একভাগও নয় : পুরস্কারের বিশগুণ অর্থাৎ কুড়ি হাজার পাউন্ড যদি বারো ক্যারাটের দাম হয়, তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন কয়েকজন সমালোচক। সেই সময়ে, অর্থাৎ ১৮৯১-এ রাশিয়ার রাজদণ্ডে লাগানো ১৯৪ ক্যারাটের অরলফ ডায়মন্ডের দাম ধার্য হয়েছিল নব্বই হাজার পাউন্ড, হোপ ডায়মন্ডের দাম ধরা হয়েছিল ত্রিশ হাজার পাউন্ড।

১০. কসমোপলিটান হোটেলে : সেই সময়ে বিদেশ থেকে আসা রাজন্য-সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজন উঠতেন লন্ডনের ক্লারিজস হোটেলে। ফরাসি সম্রাজ্ঞী ইউজিনের সঙ্গে ১৮৬০-এ এই হোটেলেই সাক্ষাৎ করেন রানি ভিক্টোরিয়া। ১৮৮৯-এর অগাস্ট মাসে স্যাভয় হোটেল খোলা হওয়ার পর সেখানেও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ থাকতে শুরু করেন।

১১. কার্বনের ডেলা : হিরে হল কার্বনের ডেলা। কিন্তু গানেট বা পদ্মরাগ গঠিত হয় ম্যাগনেশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির সংমিশ্রণে।

১২. অ্যাময় নদী : অ্যাময় কোনো নদী নয়, দক্ষিণ চিনের একটি শহর। বর্তমান নাম জিয়ামেন (Xiamen)। প্রথম আফিম-যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের দখলে আসে অ্যাময়। এই শহরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীটির নাম জিউ-লুঙ।

১৩. স্কচ টুপি : উলের তৈরি গোল, নরম টুপি।

১৪. মিউজিয়ামের কাছে : লন্ডন শহরে একাধিক নামি মিউজিয়াম থাকলেও মিউজিয়াম বলতে প্রথমেই মনে আসে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের নাম। বিখ্যাত পদার্থবিদ স্যার হান্স স্লোন-এর (১৬৬০-১৭৫৩) ব্যক্তিগত সংগ্রহ এবং আরও কিছু জিনিস নিয়ে এই মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৩ সালে। মন্টেগু হাউসে এটি স্থানান্তরিত হয় ১৭৫৯-এর ১৫ জানুয়ারি।

১৫. আলফা-ইন সরাইখানা : আলফা-ইন নামটি কল্পিত হলেও ক্রিস্টোফার মর্লের মতে এটি মিউজিয়ম ট্যাভার্ন কিংবা

ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং লিটল রাসেল স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত প্লাও-এর সঙ্গে তুলনীয়।

১৬. কভেন্ট গার্ডেন : কভেন্ট গার্ডেন মার্কেট ছিল সেকালের সবজি, ফল এবং ফুলের এক বিশাল বাজার। এ ছাড়া মাংস, পোলট্রি এবং মুদিখানার জিনিসপত্রের বাজারও ছিল এখানে।

১৭. প্রুশিয়া : জার্মানির অন্তর্গত সর্ববৃহৎ রাজ্য প্রশিয়ার রাজধানী ছিল বার্লিন। ১৮৬১-তে প্রুশিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন প্রথম উইলিয়ম। অস্ট্রো-প্রুশিয়ান যুদ্ধ এবং

ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ান যুদ্ধে জয়ের পর প্রথম উইলিয়ম জার্মান সাম্রাজ্যের কাইজার হন ১৮৭১-এ।

১৮. ক্ষমা করলাম আসল চোরকে : হোমস-বিশেষজ্ঞ রবার্ট কিথ লেভিট হিসেব কষেছেন, চোদ্দোটি কেস-এ হোমস অপরাধীকে ছেড়ে দিয়েছেন।

# পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি

[দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পিপল]

১৮৮২ থেকে ১৮৯০ সালের মধ্যে শার্লক হোমস যেসব রহস্য সমাধানের ভার হাতে নিয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটিতে তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে প্রকাশের সুযোগ পায়, কয়েকটিতে তার ক্ষমতা থই পায়নি–অমীমাংসিত থেকে গিয়েছে। আবার কয়েকটিতে আংশিক সমাধান ঘটেছে। এই শেষের কেসগুলোর মধ্যে একটা বেশ চমকপ্রদ। ঘটনাচক্র কিন্তু আজও পুরো স্পষ্ট হয়নি–হবে বলেও আর মনে হয় না।

১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর শেষ হতে চলেছে। প্রচণ্ড ঝড় আর বৃষ্টি লন্ডন শহরের ওপর দাপাদাপি করে চলেছে সারাদিন। বউ বাপের বাড়ি যাওয়ায় আমি বেকার স্ট্রিটে এসে উঠেছি দিন কয়েকের জন্যে। চুল্লির ধারে বসে বই পড়ছি। হোমসও মুখখানা কালো করে বসে আছে। মেজাজ বেশ খিটখিটে।

এমন সময় ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল সদর দরজায়।

হোমস বললে, এ সময়ে কেউ যদি সমস্যা নিয়ে দ্বারস্থ হয়, বুঝতে হবে সে-সমস্যা খুবই গুরুতর।

করিডরে পায়ের আওয়াজ শুনলাম। তারপরেই দরজায় টোকা পড়ল।

আসুন, বলল হোমস।

বছর বাইশের এক যুবক ঘরে ঢুকল। রুচিবান, ফিটফাট, খানদানি চেহারা। হাতে ভেজা ছাতা, গায়ে জলঝরা বর্ষাতি। চোখ উদবিগ্ন, মুখ ফ্যাকাশে। খুব দুশ্চিন্তায় আছে যেন।

চোখে সোনার পাসনে চশমা লাগিয়ে বলল, এই ঝড়বাদলাকে গায়ে নিয়ে হুট করে ঘরে ঢুকে পড়ার জন্যে ক্ষমা করবেন।

যুবকের ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে আংটায় ঝুলিয়ে দিল হোমস।

বলল, দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চল থেকে আসছেন দেখছি।

আজ্ঞে হ্যাঁ, হর্সহ্যাম থেকে আসছি। মেজর নেডেগাস্ট আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তাকে মস্ত কেলেঙ্কারি থেকে আপনি বাঁচিয়েছিলেন। উনিই বললেন, আপনি কখনো হারেন না।

অতিরঞ্জন করেছেন। মোট চারবার হেরেছি আমি। তিনবার পুরুষের কাছে একবার একটি মহিলার কাছে।

তার চেয়ে অনেক বেশিবার জিতেছেন। আমার কেসেও আপনি তাই হবেন এই আশা নিয়ে আমি এসেছি। ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। আমাদের পরিবারে এ-রকম দুর্বোধ্য ব্যাপার কখনো ঘটবে ভাবতে পারিনি।

কৌতূহল বাড়িয়ে দিলেন দেখছি। বলুন আপনার দুর্বোধ্য কেস–শোনা যাক।

চেয়ার টেনে নিয়ে আগুনের সামনে পা মেলে বসল যুবকটি।

বলল, আমার নাম জন ওপেন-শ। যে-কেস নিয়ে আপনার কাছে এসেছি, তার জের চলেছে বাপ-কাকার আমল থেকে।

আমার বাবারা দু-ভাই। এলিয়াস আমার কাকা, জোসেফ আমার বাবা। কভেন্ট্রিতে সাইকেলের টায়ারের কারখানা চালিয়ে বাবা প্রচুর পয়সা করেন। পরে মোটা টাকায় কারবার বেচে দেন এবং বাকি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাবেন স্থির করেন।

কাকা বয়সকালে আমেরিকা গিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময়ে কর্নেল হয়েছিলেন।

যুদ্ধ শেষ হলে ফ্লোরিডায় বাড়ি ফিরে যান। বছর তিন চার সেখানে থাকার পর ১৮৬৯ কি ৭০ সালে ফিরে আসেন হর্সহ্যামের সাসেক্সে। জমিজমা কিনে বসবাস শুরু করেন। আমেরিকায় টাকা করেছিলেন, কিন্তু থাকতে পারেননি নিগ্রোবিদ্বেষের জন্যে। নিগ্রোদের ভোট দেওয়ার অধিকার তিনি মানতে পারেননি। কাকা ছিলেন বদমেজাজি, অসামাজিক

আর ঘরকুনো। খুব মদ খেতেন, তামাক খেতেন, কারো সঙ্গে দেখা করতে চাইতেন না–বাবার সঙ্গেও না। বাড়িতেই থাকতেন–নয়তো বাড়ির পাশের মাঠে ময়দানে প্রাত্যহিক ব্যায়াম সেরে নিতেন।

আমাকে কিন্তু স্নেহ করতেন কাকা। ইংলন্ডে আসার আট-নয় বছর পর বাবাকে বলে আমাকে ওঁর বাড়িতেই রেখেছিলেন। চাকরবাকর আর বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ব্যাবসার আলাপ আমিই চালাতাম। চাবি-টাবি সব আমার কাছেই থাকত। মাত্র যোলো বছর বয়সেই বলতে পারেন বাড়ির কর্তা হয়ে বসেছিলাম। সর্বত্র অবাধ গতি ছিল আমার ছাদের চিলেকোঠার ঘরটা ছাড়া। চাবির ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছি সে-ঘরে রাশি রাশি ভাঙা

তোরঙ্গ আর কাগজের তাড়া ছাড়া কিছুই নেই।

১৮৮৩ সালের মার্চ মাসের সকাল বেলা আমি আর কাকা টেবিলে বসে আছি, এমন সময়ে একটা চিঠি এল কাকার নামে। নির্বান্ধব ছিলেন বলে ওঁর নামে চিঠিপত্র বড়ো একটা আসত না। খামখানা তুলে নিয়ে বললেন, পন্ডিচেরি পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেছি–ভারতবর্ষ থেকে এসেছে।

বলে, খামের মুখ ছিঁড়লেন। ভেতর থেকে শুধু পাঁচটা শুকনো খটখটে কমলাবিচি ঝরে পড়ল টেবিলে–আর কিছু না।

আমি হেসে ফেললাম পত্রলেখকের রসিকতা দেখে। কিন্তু কাকার মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল। নিঃসীম আতঙ্কে চোয়াল ঝুলে পড়ল, চোখ যেন কোটর থেকে ঠেলে বেরিয়ে এল।

বললেন বিকট ভাঙা গলায়, K.K.K.! এবার আর রক্ষে নেই আমার। পাপের সাজা পেতেই হবে!

আমি তো অবাক। বললাম, কাকা ব্যাপার কী? এসব কী?

মৃত্যু! মৃত্যু! বলতে বলতে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন কাকা। ছুটে নিজের ঘরে চলে গেলেন। ভয়ের চোটে আমার বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। খামটা তুলে নিয়ে দেখলাম, আঠা দিয়ে জোড়া মুখের কাছে লাল কালিতে K অক্ষরটা তিনবার লেখা– ভেতরে ওই কমলার পাঁচটি বিচি ছাড়া কিছু নেই।

এর সঙ্গে মৃত্যুর কী সম্পর্ক থাকতে পারে ভেবে না-পেয়ে ওপরে যাচ্ছি, দেখলাম সিঁড়ি বেয়ে কাকা নামছেন। হাতে একটা জংধরা চাবি চিলেকোঠা খুলেছিলেন নিশ্চয় আর একটা ছোটো পেতলের বাক্স।

বললেন, এবার ওদের টেক্কা দোব। জন, মেরিকে বললো আমার ঘরে আগুন জ্বেলে দিতে। আর তুমি উকিল ফোর্ডহ্যামকে ডাকতে পাঠাও।

উকিল এল। কাকার ঘরে আমার তলব পড়ল। দেখলাম, আগুনের চুল্লির লোহার ঝাঝরির ওপর অনেক কাগজ পোড়া ছাই পড়ে আছে। পাশেই সেই পেতলের বাক্স ডালা খোলা অবস্থায় রয়েছে। আঁতকে উঠলাম ডালার ওপর K অক্ষরটা তিনবার খোদাই করা দেখে।

আমি ঘরে ঢুকতেই কাকা বললেন, শোনো জন, আমার সমস্ত সম্পত্তি দাদাকে দিয়ে যাচ্ছি। তার মানে তুমিই সব পাবে। যদি বোঝ শান্তিতে ভোগ করতে পারছ না–তোমার যে পরম শত্রু, তাকে সব দিয়ে দিয়ো। সাক্ষী হিসেবে উইলে সই করো।

আমি তো ভয়ে সিটিয়ে গেলাম কথার ধরন শুনে। সই দিলাম বটে, কিন্তু সেইদিন থেকে কাঠ হয়ে রইলাম। অষ্টপ্রহর কাকার হঠাৎ পরিবর্তন দেখে। নেশা করা, ঘরের মধ্যে নিজেকে চাবি দিয়ে রাখা, কারো সঙ্গে দেখা না-করা, আগের চাইতে বাড়ল। নতুন উপসর্গের মধ্যে দেখা গেল চেঁচামেচি। মাঝে মাঝে মদে চুর হয়ে রিভলভার হাতে বেরিয়ে এসে বাড়ির সামনে মাঠে ছুটতেন আর গলা ফাটিয়ে চেঁচাতেন। কারো ধার ধারেন না তিনি, কারো ভয়ে জুজু হয়ে থাকতে চান না। ঘোর কেটে গেলেই কিন্তু ফের ঘরে ঢুকে চাবিবন্ধ করে দিতেন। দারুণ শীতেও তখন তাঁকে দেখেছি ঘেমে-নেয়ে যেতে। ভয় যে রক্তে বাসা নিয়েছে, তা ওই মুখ দেখলেই বোঝা যেত।

একদিন রাত্রে এইরকম মাতলামি করতে করতে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলেন আর ফিরে এলেন না। বাগানের ডোবায় মাত্র দু-ফুট জলে মুখ গুঁজে পড়ে থাকতে দেখা গেল তাঁকে। শরীরে আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই। সাম্প্রতিক পাগলামির বৃত্তান্ত শুনে জুরি

বললেন আত্মহত্যা। আমার মনে কিন্তু ধোঁকা থেকে গেল। মৃত্যুর খপ্পর থেকেই বাঁচবার জন্যে উনি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন। শেষকালে কিনা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই মৃত্যুর খপ্পরেই পড়লেন।

যাই হোক, উইল অনুসারে কাকার সম্পত্তি আর ব্যাঙ্কে গচ্ছিত প্রায় হাজার চোদ্দো পাউন্ড বাবা পেলেন।

এই পর্যন্ত শুনে হোমস বললে, এ-রকম অদ্ভুত কাহিনি আগে কখনো শুনিনি। আচ্ছা, চিঠিখানা উনি কবে পেয়েছিলেন? মৃত্যু বা আত্মহত্যাটা কোন তারিখে হয়েছিল মনে আছে?

চিঠি এসেছিল ১৮৮৩ সালের ১০ মার্চ, মারা গেলেন ২ মে রাত্রে–মানে, ঠিক সাত সপ্তাহ পরে।

তারপর কী হল?

সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার পর আমার কথায় চিলেকোঠা তন্নতন্ন করে খুঁজলেন বাবা। সেই পেতলের বাক্সটা পাওয়া গেল। ডালার ভেতর দিকে একটা কাগজ সাঁটা। তাতে লেখা K.K.K.–তার নীচে লেখা পত্র, স্মারকলিপি, নিবন্ধ, রসিদ। কিন্তু ওই ধরনের কোনো কাগজ বাক্সে নেই–নিশ্চয় সব পুড়িয়ে ফেলেছেন। এ ছাড়া ঘরের মধ্যে যা পাওয়া গেল, তা সবই তার সৈনিকজীবন সংক্রান্ত। আর কিছু রাজনীতির কাগজপত্র।

১৮৮৫ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথম সপ্তাহে ব্রেকফাস্ট খেতে বসেছি আমি আর বাবা, এমন সময়ে একটা খাম এল তার নামে। ছিড়েই চেঁচিয়ে উঠলেন।

দেখলাম, ভয়ে চোখ বড়ো বড়ো হয়ে গেছে। এতদিন যা নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিলেন, এখন তাই দেখে হতভম্ব হয়ে গেছেন। হাতের তেলোয় রয়েছে শুধু পাঁচটা কমলা-বিচি।

তোতলাতে তোতলাতে কোনোমতে বললেন, এ... এ আবার কী!

K.K.K. নাকি? গলা শুকিয়ে এল আমার।

খামের ভেতর দেখে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এই তোর অক্ষরটা তিনবার লেখা রয়েছে। তার ওপরে এসব আবার কী লিখেছে?

ঘাড় বাড়িয়ে পড়লাম, সূর্য-ঘড়ির ওপর কাগজগুলো রাখো।

কাগজই-বা কী, সূর্য-ঘড়িই-বা কোথায়? বললেন বাবা।

সূর্য-ঘড়ি বাগানে একটা আছে বটে, কিন্তু কাগজ তো সব পুড়িয়ে ফেলেছেন কাকা।

যত্তো সব! অনেকটা সামলে নিয়ে বাবা বললেন, এটা সভ্য দেশ। গাড়োয়ানি ইয়ার্কির জায়গা নয়। কোত্থেকে এসেছে চিঠিটা?

ডাকঘরের স্ট্যাম্প দেখে বললাম–ডান্ডি থেকে!

ফেলে দাও! ইয়ার্কির আর জায়গা পায়নি।

পুলিশে খবর দেওয়া দরকার।

ছাড়ো তো! লোক হাসাতে হবে না।

আমি নিজে খবর দিতে চাইলাম–বাবা বেঁকে বসলেন, চিরকাল বড়ো গোঁয়ার। আমি কিন্তু সেইদিনই অমঙ্গলের অশনি সংকেত পেলাম চিঠিখানার মধ্যে।

চিঠি পাওয়ার তিন দিন পরে বাবা ছেলেবেলার বন্ধু মেজর ফ্রিবাডির সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। দ্বিতীয় দিনে টেলিগ্রাম এল মেজরের কাছ থেকে। গিয়ে শুনলাম বাবা আর নেই। খাদ থেকে পড়ে মারা গেছেন। জুরিরা বললেন, দুর্ঘটনা। আমার মন বলল, হত্যা। অথচ কোনো পায়ের ছাপ কোথাও নেই, আঘাতের কোনো চিহ্ন নেই, রাস্তাঘাটেও অচেনা মুখ দেখা যায়নি। ষড়যন্ত্র যে ক্রমশ চেপে বসছে, সমস্ত সত্তা দিয়ে তা উপলব্ধি করলাম।

এইভাবেই অনেক দুর্ভাগ্যের মধ্যে দিয়ে সম্পত্তি এল হাতে। বলতে পারেন, কেন বেচে দিয়ে সরে পড়লাম না। কিন্তু আমার মন বলছে, পালিয়ে গিয়ে কাকার অতীতের জেরকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

বাবার রহস্যজনক মৃত্যুর পর দু-বছর আট মাস বেশ সুখেই কাটল। কমলবিচির আতঙ্ক মন থেকে মুছে গেল। ভাবলাম বুঝি, অভিশাপটা শেষ পর্যন্ত রেহাই দিল বংশের শেষ পুরুষকে।

কিন্তু ভুল... ভুল... সব ভুল। কাল সকালে আবার এসেছে সেই খাম। এই দেখুন।

ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা খাম বার করে উপুড় করল যুবাপুরুষ। টেবিলে কড়মড় করে ঠিকরে পড়ল পাঁচটা শুকনো কমলালেবুর বিচি।

বলল, ডাকঘরের স্ট্যাম্প মারা হয়েছে লন্ডনের পুব অঞ্চলে। ভেতরে লেখা K.K.K.– কাগজপত্র সূর্য-ঘড়ির ওপর যেন থাকে।

চিঠি পেয়ে কী করলেন?

কিছুই না।

সে কী! কিচ্ছু করেননি?

কাঁপা হাতে মুখ ঢেকে শিউরে উঠল জন ওপেন-শ, কী করব বলতে পারেন? একটা কুটিল চক্রান্ত আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে ধরেছে আমাকে বড়ো অসহায়, বড়ো দুর্বল আমি। এমন একটা ক্রুর কুটিল অমঙ্গল আমাকে শেষ করে আনছে যার খপ্পর থেকে রেহাই বাবা কাকারাও পায়নি–আমিও পাব না।

আপনি কি চুপ করবেন? চিৎকার করে ওঠে শার্লক হোমস। এখন কি ভেঙে পড়ার সময়? বাঁচতে যদি চান, তো উঠে-পড়ে লাগুন।

পুলিশের কাছে ধরনা দিয়েছিলাম।

কী বলল তারা?

হেসেই উড়িয়ে দিল। বলল, ঠাট্টা করেছে কেউ।

ইডিয়ট! মানুষ যে এত বোকা হতে পারে ভাবাও যায় না।

অবশ্য সঙ্গে একজন কনস্টেবল দিয়েছে।

সঙ্গে এনেছেন তো?

না, বাড়িতে রেখে এসেছি। সেইরকমই অর্ডার আছে তার ওপর।

এবার ভীষণ রেগে গেল হোমস। শূন্যে মুষ্টি নিক্ষেপ করে চিৎকার করে বললে, তাহলে এখানে আসতে গেলেন কেন? এলেনই যদি তো চিঠি পাওয়ার সঙ্গেসঙ্গে এলেন না কেন?

আপনার নাম তখনও শুনিনি। মেজর প্রেনডেগাস্টের কাছে শুনেই দৌড়ে আসছি।

খুব করেছেন। রাগে গরগর করতে করতে বলল হোমস। চিঠি পাওয়ার পর দু-দুটো দিন বেবাক বসে কাটিয়েছেন। জোগাড়যন্ত্র আগেই করা উচিত ছিল। যত্তো সব! ছোটোখাটো সূত্র-টুত্র কিছু দিতে পারেন? ব্যাপারটা আন্দাজ করার মতো যা হয় কিছু?

পকেট থেকে একটা নীল কাগজের টুকরো বার করে টেবিলে রাখল জন।

কাকা যেদিন কাগজ পোড়ান, সেদিন কীভাবে জানি না এই কাগজটা উড়ে এসে মেঝেতে পড়েছিল। ছাইয়ের মধ্যেও এইরকম নীলচে রঙের আধপোড়া কাগজের অনেক টুকরো দেখেছিলাম। এই কাগজটাও মনে হয় ওইসবের মধ্যেই ছিল।

বাতির আলোয় ছেড়া কাগজটার ওপর আমরা দুই বন্ধু হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। একটা দিকই ভেঁড়া হয়েছে–যেন খাতার পাতা ছিড়ে নেওয়া হয়েছে। ওপরে লেখা মার্চ, ১৮৬৯ তলায় একট হেঁয়ালি :

৪ঠা ।। হাডসনের মত পালটায়নি। এসেছিল।

৭ই ।। বিচি পাঠানো হল ম্যাকাউলি, প্যারামোর আর জন সোয়েনকে।

৯ই ।। ম্যাকাউলি পরিষ্কার।

১০ই ।। জন সোয়েন সাফ।

১৩ই।। প্যারামোরকে দেখে এলাম। ঠিক আছে।

কাগজটা ফিরিয়ে দিল হোমস।

বলল, নষ্ট করার মতো সময় আর নেই। এক্ষুনি বাড়ি গিয়ে কোমর বেঁধে লেগে যান। কী করব? এই যে কাগজটা, এই সেই পেতলের বাক্সে রাখবেন। আর একটা কাগজে লিখবেন–সব কাগজ কাকা পুড়িয়ে ফেলেছেন, এইটেই কেবল রয়ে গেছে। লিখে কাগজটাকে পেতলের বাক্সে রেখে সবসুদ্ধ সূর্যঘড়ির ওপর সঙ্গেসঙ্গে রেখে আসবেন।

বেশ, তাই করব।

এ ছাড়া করণীয় আর কিছুই এখন নেই। আগে নিজে বাঁচুন, পরে বাপ কাকার মৃত্যুরহস্যের কিনারা করতে যাবেন।

উঠে দাঁড়াল জন, আপনি আমাকে নতুন শক্তি দিলেন।

একদম সময় নষ্ট করবেন না। মনে রাখবেন, মাথার ওপর সাংঘাতিক বিপদের খাঁড়া নিয়ে এখানে আপনি এসেছেন। সত্যিই জীবন বিপন্ন আপনার। বাড়ি ফিরবেন কী করে?

ট্রেনে।

ন-টা এখনও বাজেনি। রাস্তায় যদিও লোক থাকবে, তাহলেও খুব একটা নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না।

সঙ্গে হাতিয়ার আছে।

চমৎকার। কাল থেকে শুরু করব আপনার রহস্য সমাধান।

হর্সহ্যামে আসছেন?

না। রহস্যের চাবিকাঠি হর্সহ্যামে নেই–লন্ডনে রয়েছে। এখানেই কিনারা করব।

ঠিক আছে। দু-একদিনের মধ্যেই বাক্সের খবর দিয়ে যাব আপনাকে।

হ্যান্ডশেক করে বিদায় নিল যুবাপুরুষ। বাইরে তখন দামাল ঝড় আর পাগলা বৃষ্টির তাণ্ডব নাচ চলছে। খটাখট ঝমাঝম শব্দ শোনা যাচ্ছে জানলায়।

আগুনের দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ নিশ্চুপ হয়ে বসে রইল শার্লক হোমস। তারপর তাম্রকুট সেবন করে চলল শিবনেত্র হয়ে।

শেষকালে বললে, ওয়াটসন, সাইন অফ দি ফোর মামলার পর এ-রকম ভয়ংকর বিচিত্র মামলা আর হাতে আসেনি আমার।

জন ওপেন-শ-র মাথায় কোন বিপদের খাঁড়া ঝুলছে বলো তো?

ভায়া, যুক্তিবিদ্যায় তাকেই পারঙ্গম বলব যে ঘটনা-শৃঙ্খলের একটা আংটা দেখেই শৃঙ্খলের শেষ পর্যন্ত আঁচ করতে পারে। অস্থিবিদ্যায় যিনি পণ্ডিত, তিনি যেমন কঙ্কালের একটা হাড় দেখেই সব হাড়ের বর্ণনা দিতে পারেন–এও তেমনি একটা উঁচুদরের আর্ট। এ-আর্টে বড়ো আর্টিস্ট হতে হলে দরকারি সব খবর মগজে জমিয়ে রাখা দরকার। মার্কিন বিশ্বকোষের K খণ্ডটা তাক থেকে নামাও। এবার ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করা যাক। কর্নেল ওপেন-শ আমেরিকা ছেড়ে হঠাৎ চলে এলেন কেন? ইংলন্ডের পল্লিঅঞ্চলে নির্জনবাস শুরু করলেন কেন? বাড়ি ছেড়ে বেরোনো বন্ধ করলেন কেন? নিশ্চয় কারো

ভয়ে–তাই নয় কি? ভয়টা কী ধরনের, এই চিঠিগুলো থেকেই আঁচ করা যায়। পোস্ট অফিসগুলোর ছাপ মনে আছে?

প্রথমটা পণ্ডিচেরির, দ্বিতীয়টা ডান্ডির, তৃতীয়টা পূর্ব লন্ডনের।

এ থেকে কী আন্দাজ করা যায়?

সবগুলোই তো দেখছি জাহাজঘাটা। চিঠির লোক জাহাজে বসে চিঠি লিখেছে।অপূর্ব! এই তো বেরিয়ে গেল একটা সূত্র। এবার দেখো আর একটা ইঙ্গিতময় ব্যাপার। পন্ডিচেরি থেকে হুমকি দিয়ে খুন করতে সময় লেগেছে সাত সপ্তাহ। কিন্তু ডান্ডি থেকে হুমকি দিয়ে খুন করেছে মাত্র তিন চার দিনে। বলো কী বুঝলে এ থেকে?

আসতে সময় লেগেছে।

চিঠিকেও তো সেই পথেই আসতে হয়েছে।

তাহলে?

ভায়া, হুমকি যে দিয়েছে, সে এসেছে এমন একটা জাহাজে যে-জাহাজ চিঠি-বওয়া জাহাজের চেয়ে আস্তে চলে। মানে, পাল তোলা জাহাজ। চিঠি এসেছে কলে-চলা জাহাজে।

তা হতে পারে।

হতে পারে না, তাই হয়েছে। ওপেন-শকে এই কারণেই পইপই করে হুঁশিয়ার করলাম–জীবন তার সত্যিই বিপন্ন। কেন জান? ওর চিঠিটা এসেছে পূর্ব-লন্ডন থেকে। তার মানে আর সময় নেই।

সর্বনাশ! কিন্তু এই অমানুষিক অত্যাচারের কারণটা কী বলতে পার?

কারণ ওই কাগজপত্র। এই হুমকি আর খুনের পেছনে একজন নেই–অনেকজন আছে। চিহ্ন বা প্রমাণ না-রেখে এইভাবে পর-পর দুটো খুন করা আনাড়ি বা বোকার পক্ষে সম্ভব হয়। এরা গোঁয়ার, বুদ্ধিমান, ধনবান। বাক্সের কাগজপত্র তারা ফিরে চায়–যার কাছেই থাকুক না কেন। কাজেই K.K.K. অক্ষর তিনটে কোনো বিশেষ একজনের নামের আদ্যক্ষর নয়–একটা সংস্থার নাম।

কী সংস্থা?

ঝুঁকে পড়ল হোমস।

বলল, ওয়াটসন, কু-ক্লুক্স-ক্ল্যানয়ের নাম কখনো শুনেছ?

না।

বিশ্বকোষের পাতা উলটোল বন্ধুবর।

বলল, এই দেখো কু ক্লুক্স ক্ল্যান! আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রিগার টেপবার সময় একরকম ধাতব শব্দ হয় তার সঙ্গে মিল রেখেই এই নামের সৃষ্টি। আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের পর পতন ঘটে ভয়ংকর এই সংস্থাটির। উদ্দেশ্য নিগ্রো হয়েও যারা ভোট দিতে চায়, তাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা। যাকে দেশ থেকে তাড়াতে অথবা খুন করতে চাইত তার কাছে আগে হুমকি পাঠানো হত অদ্ভুত চিহ্ন মারফত। কখনো কমলা-বিচি, কখনো তরমুজ-বিচি, কখনো ওক-গাছের পাতা। হুমকি চিহ্ন পেয়ে যারা তোয়াক্কা করত না, অদ্ভুতভাবে তাদের সরিয়ে দেওয়া হত ধরাধাম থেকে। অনেক চেষ্টা করেও দমন করা যায়নি সংস্থাটিকে–আকাশে বজ্রের মতোই এরা ছিল ভয়ংকর আর অমোঘ। ১৮৬৯ সালে সংস্থাটি আচমকা টুকরো টুকরো হয়ে যায় কারণ জানা যায়নি। মাঝে মাঝে অবশ্য মাথা চাড়া দিয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে।

বিশ্বকোষ বন্ধ করে হোমস বললে, কর্নেল ওপেন-শ আমেরিকা থেকে চলে আসেন ১৮৬৯ অথবা ৭০ সালে। সংস্থাটি ভেঙেছে ১৮৬৯ সালে। এ থেকে কি বোঝা যায় না যে তিনিও এর মধ্যে ছিলেন এবং সংস্থার অনেকের নামধাম সমেত কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে এসে ঘাপটি মেরেছিলেন ইংলন্ডে? নিশ্চয় ওদেশের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির রাতের ঘুম ছুটে গেছে সেইদিন থেকে কাগজ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে তখন থেকেই।

আমরা যে-পাতাটা ছেঁড়া দেখলাম—

ডায়েরির পাতা। খুন আর হুমকির রেকর্ড। আজ আর কথা নয় ওয়াটসন। বেহালাটা দাও, এই জঘন্য আবহাওয়া আর তার চাইতে জঘন্য মানুষ জাতটাকে ভুলে-থাকা যাক।

সকাল বেলা আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হল। সূর্য ম্লান মুখে উঁকি দিল কুয়াশা ছুঁড়ে। ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রাতরাশ খাওয়ার টেবিলে আগেই হাজির হয়েছে হোমস।

আমাকে দেখেই বললে, ওহে, আজ থেকেই ওপেন-শ মামলার তদন্ত শুরু করব–এই লন্ডন শহরেই।

সেদিনকার সদ্য-আসা খবরের কাগজখানা তুলে নিয়ে বললাম, কীভাবে?

দেখি খোঁজখবর নিয়ে।

হঠাৎ চোখ পড়ল দৈনিকের একটা শিরোনামায়। রক্ত হিম হয়ে গেল আমার।

আঁতকে উঠে বললাম, হোমস—হোমস–বড্ড দেরি করে ফেললে!

তাই নাকি! হাতের কাপ টেবিলে নামিয়ে রাখে হোমস। কণ্ঠস্বর সংযত, কিন্তু মুখভাব দেখে বুঝলাম ভেতরে তার কী আলোড়ন শুরু হয়ে গেল।

কাল রাতে ওয়াটারলু ব্রিজে হঠাৎ একটা চিৎকারের সঙ্গেসঙ্গে ঝপাং করে একটা শব্দ শোনা যায়। কনস্টেবল দৌড়ে যায় জলের ধারে। লোক নামিয়েও তখন তাকে পাওয়া যায়নি। পরে জলপুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। পকেটের মধ্যে একটা খাম ছিল। তা থেকেই জানা যায়, তার নাম জন ওপেন-শ। বাড়ি হর্সহ্যামের কাছে। পুলিশের বিশ্বাস, শেষ ট্রেন ধরার জন্যে ধড়ফড় করতে গিয়ে অন্ধকারে আর জল-ঝড়ে পথ হারিয়ে নদীর পাড়ে চলে যায়। সেখানেই পা ফসকে পড়ে গেল জলে। দেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়নি।

চোখ তুলে শার্লক হোমসের মুখের চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। কথা বলতে পারলাম না কিছুক্ষণ। এভাবে তাকে ভেঙে পড়তে কখনো দেখিনি আমি।

তারপর আর বসে থাকতে পারল না চেয়ারে। অস্থিরভাবে পায়চারি করতে লাগল ঘরময়। মুখ লাল, আঙুল অস্থির–ক্রমাগত হাত মুঠো করছে আর খুলছে।

আর বলছে, বাঁচবার জন্যে এসেছিল আমার কাছে–কিন্তু আমিই তাকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলাম। ধড়িবাজ শয়তানের দল! ব্রিজের ওপর লোক ছিল বলে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে জলের ধারে নদীর পাড়ে–কিন্তু কীভাবে সেটা বুঝছি না! ঠিক আছে, দেখা যাক কে হারে কে জেতে!–চললাম ওয়াটসন।

কোথায়? পুলিশের কাছে?

পুলিশ! আমিই আমার পুলিশ।

সারাদিন ডাক্তারি নিয়ে কাটালাম। হোমস ফিরল রাত দশটা নাগাদ। চোখ-মুখ উদ্রান্ত, যেন একটা ঝোড়ো কাক। একটা শুকনো রুটি নিয়ে জলে ভিজিয়ে গিলতে লাগল কোঁৎকোঁৎ করে।

বলল, সকালে সেই যে খেয়েছি–পেটে আর কিছু পড়েনি। খাবার কথা মনেও ছিল না।

রহস্যের সমাধান হল?

অনেকটা হয়েছে। শয়তানগুলোকে কবজায় এনেছি, এবার হুমকি পাঠাব ওদেরই রীতিতে। ওপেন-শদের খুন করার বদলা এবার নেব।

বলতে বলতে একটা কমলালেবু নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে ফেলল হোমস। কোয়ার মধ্যে থেকে পাঁচটা বিচি নিয়ে ভরল একটা খামে। ভেতরের ভাঁজে লিখল শা.হো. পাঠাচ্ছে জে.কা.কে।

খামের মুখ এঁটে ওপরে লিখল :

ক্যাপ্টেন জেমস কালহাউন, লোন-স্টার জাহাজ, স্যাভানা, জর্জিয়া।

শুকনো হেসে বলল, জাহাজঘাটায় এসেই পাবে এই চিঠি। ওপেনশ-দের মতো ওকেও ভয়ে উৎকণ্ঠায় অর্ধেক হয়ে যেতে হবে। শয়তান কোথাকার।

কালহাউন লোকটা কে, হোমস?

পালের গোদা, নাটের গুরু। চক্রান্ত এর স্যাঙাত্রাও করেছে, লজ্জায় আনব প্রত্যেককেই। পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বার করে দেখাল আমাকে। কাগজ ভরতি কেবল নাম আর তারিখ।

পুরানো ফাইল আর দলিল ঘেঁটে কাটিয়েছি সারাদিন। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারিতে পন্ডিচেরিতে নোঙর ফেলেছিল অনেকগুলো পালের জাহাজ। তার মধ্যে একটা জাহাজের নাম যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রের নামানুসারে–লোন-স্টার।

তারপর?

ডান্ডিতে ১৮৮৫ সালের জানুয়ারিতেও এই লোন-স্টার নোঙর ফেলেছিল দেখে নিঃসন্দেহ হলাম। খোঁজ নিলাম লন্ডন বন্দরে। হ্যাঁ, এখানেও এসেছে লোন-স্টার। তৎক্ষণাৎ গেলাম জাহাজঘাটায়। শুনলাম সকালে রওনা হয়েছে স্যাভানার দিকে–মানে, দেশে ফিরছে।

অতএব!

টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি স্যাভানায়–পুলিশ ওত পেতে থাকবে। কলের জাহাজে আমার এই চিঠিও ওদের পাল তোলা জাহাজের আগে পৌঁছে যাবে। ক্যাপ্টেন কালহাউন আর তার দুজন সহকারীই কেবল আমেরিকার লোক–বাদবাকি সবাই অন্য দেশের খালাসি। কাল রাতে এই তিনজন জাহাজে ছিল না–সে-খবর নিয়েছি! কাজেই ওপেন-শ-কে খুনের অপরাধে ত্রিমূর্তিকে গ্রেপ্তারের জন্যে পুলিশ তৈরি হয়েই থাকবে স্যাভানায়।

কিন্তু হায় রে কপাল। নিয়তির লিখন ছিল অন্যরকম। কুচক্রী কালহাউন কোনোদিনই জানতে পারেনি তার চাইতেও ধুরন্ধর এক ব্যক্তি ধরে ফেলেছে তার শয়তানি। পাঁচটা কমলাবিচি কোনোদিন তার হাতে পৌঁছোয়নি। সে-বছরের সেই দামাল ঝড় সমুদ্রের বুকে যে তাণ্ডব নাচ নেচেছিল, তার খপ্পর থেকে রেহাই পায়নি পালতোলা জাহাজ লোন-স্টার। বিধ্বস্ত একটা খোলকে ঢেউয়ের ডগায় ভাসতে দেখা গিয়েছিল কেবল–গায়ে লেখা ছিল–লোন-স্টার!

–––––

টীকা

১. পাঁচটা কমলা-বিচির ভয়ংকর কাহিনি : ইংলন্ডে প্রকাশিত স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের নভেম্বর ১৮৯১ সংখ্যায় এবং আমেরিকান স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের ডিসেম্বর ১৮৯১ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয় দ্য ফাইভ অরেঞ্জ পি।

২. ১৮৮২ থেকে ১৮৯০ : ১৮৮১-তে ঘটেছিল আ স্টাডি ইন স্কারলেট-এর ঘটনা। সেটির কথা ড. ওয়াটসন কেন যে বাদ দিলেন তা জানা যায়নি।

৩. হর্সহ্যাম : সাসেক্স কাউন্টির পশ্চিমাংশে অবস্থিত ছোটো শহর হর্সহ্যামের উপকণ্ঠে জন্মেছিলেন বিখ্যাত কবি পার্সি বুসি শেলি। এখানকার সংগ্রহশালায় শেলির স্মৃতিবিজড়িত নানা জিনিসের সঙ্গে তার লেখা বহু গ্রন্থের প্রথম বা অন্য পুরোনো সংস্করণ সযত্নে রাখা আছে।

৪. একটি মহিলার কাছে : কোনো কোনো গবেষক দ্বিমত পোষণ করলেও, বেশিরভাগের ধারণা, এই মহিলা হলেন আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া গল্পের আইরিন অ্যাডলার।

৫. কভেন্ট্রিতে : প্রাচীন শহর কভেন্ট্রি বিখ্যাত সাইকেল কারখানা ছাড়া, রিবন, ফিতে, পোশাক, ঘড়ি প্রভৃতির উৎপাদন কেন্দ্র হিসেবে। কভেন্ট্রি শহরেই ট্যাক্স কমানোর দাবিতে নগ্ন অবস্থায় অশ্বারোহণ করেছিলেন লেডি গোডিভা। শহরের কেন্দ্রে, দিনে-দুপুরে লেডি গেডিভার ওই দুঃসাহসিক কাজের সময়ে শহরের মানুষ দরজা-জানলা বন্ধ করে নিজেদের গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। কিন্তু লুকিয়ে দেখেছিল সেই দৃশ্য। তাকে বলা হয় পিপিং টম। বাক্যবন্ধটির উদ্ভব এই শহর থেকেই।

৬. কর্নেল হয়েছিলেন : এলিয়াস ওপেনশ ছাড়াও আরও বহু ইংরেজ, আইরিশ এবং স্কটসম্যান আমেরিকার গৃহযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

৭. পন্ডিচেরি : ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পন্ডিচেরি ছিল ফরাসি উপনিবেশ। দ্য সাইন অব ফোর-এ উল্লেখ পাওয়া যায় পন্ডিচেরি লজ নামক একটি বাড়ির।

৮. কাগজ বাক্সে নেই : এলিয়াস কেন যে সব কাগজপত্র নিয়ে এসেছিল আর কেনই-বা সেই লুকিয়ে রাখা কাগজ পুড়িয়ে ফেলেছিল, সে-সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না।

৯. ডান্ডি : স্কটল্যান্ডের এক বন্দর-নগরী।

১০. জুরিরা : এই জুরিরা সম্ভবত করোনারের সহকারী।

১১. কু ক্লুক্স ক্ল্যান : আমেরিকার টেনেসি রাজ্যের পুলাস্কি শহরে ১৮৬৬ সালে গঠিত হয় কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী সংস্থা কু ক্লুক্স ক্ল্যান। দলের নামের উদ্ভব গ্রিক শব্দ কুকলস থেকে, যার অর্থ বৃত্ত। এই দলটি ভেঙে যাওয়ার পর ১৯১৫ সালে জর্জিয়ায় এর পুনর্গঠন করেন উইলিয়ম জে. সিমন্স।

১২. কাগজপত্র নিয়ে পালিয়ে এসে : কু ক্লুক্স ক্ল্যানের ছ-জন প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যতম জন সি. লেস্টার দল ভেঙে যাওয়ার পর ১৮৮৪ সালে এই দল সম্পর্কে বিভিন্ন গোপন

তথ্য সংবলিত একটি গ্রন্থ রচনা এবং প্রকাশ করেন। তার জন্য কিন্তু লেস্টারকে কেউ দোষারোপ বা হত্যার চেষ্টা করেনি।

১৩. ওয়াটারলু ব্রিজে : টেমস নদীর ওপর ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত এই সেতুর অপর নাম ব্রিজ অব সাইজ। এই ব্রিজের রেলিং টপকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে ঘটা অগণ্য আত্মহত্যা থেকে এই নামের উৎপত্তি।

১৪. পুরানো ফাইল আর দলিল ঘেঁটে : জাহাজ চলাচল বিষয়ক যাবতীয় নথির প্রাচীনতম ভাণ্ডার হল লয়েডস রেজিস্টার। ১৭৬০ থেকে প্রচলিত এই সংস্থা এক-শো টন বা তার চেয়ে বড়ো যাবতীয় বাণিজ্যপোতের রেকর্ড রেখে চলেছে। বর্তমানে ইন্টারনেটেও লভ্য লয়েডস-এর তথ্যভাণ্ডার।

# পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য বেরিল করোনেট]

হোমস, জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললাম, একটা বদ্ধ পাগল আসছে!

ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত পুরে কুঁড়ের বাদশার মতো উঠে এল শার্লক হোমস। ফেব্রুয়ারি মাস। সবে সকাল হয়েছে। রাস্তায় গত রাতের বরফ রোদ্দুরে ঝকঝক করছে। বেকার স্ট্রিট অবশ্য অনেকটা সাফ হয়ে এসেছে। লোকজন কেউ নেই–পিচ্ছিল ফুটপাথের বিচিত্র ব্যক্তিটি ছাড়া।

লোকটার চেহারা এবং জামাকাপড়ে বনেদিয়ানার ছাপ। কিন্তু কখনো হাত ছুড়ছেন, কখনো ছুটছেন, কখনো হোঁচট খাচ্ছেন, কখনো মাথা নাড়ছেন, কখনো মুখভঙ্গি করছেন। পাগল আর কাকে বলে।

বাড়ির নম্বর দেখতে দেখতে আসছেন দেখছি, বললাম আমি।

আমার কাছেই আসছেন, সোৎসাহে হাত ঘষে বললে হোমস।ওই শোনো ঘণ্টা বাজছে।

মুখের কথা ফুরোল না। বাড়ি কেঁপে উঠল সদর দরজার প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনিতে। ক্ষণপরেই হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে ঢুকলেন ভদ্রলোক। ঢুকেই এমনভাবে মাথার চুল

ছিড়তে লাগলেন, দেওয়ালে মাথা কুটতে লাগলেন যে আমরা ধরে না-ফেললে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটে যেত।

চেয়ারে জোর করে বসিয়ে হোমস বললে, সুস্থির হোন। খুব বিপদে পড়ে এসেছেন বুঝতে পারছি।

বিপদ বলে বিপদ! মি. হোমস, আমাকে পাগল ঠাউরেছেন নিশ্চয়। কিন্তু আমার মাথা কাটা যেতে বসেছে। কলঙ্কের যে আর শেষ থাকবে না। অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত একটি মানুষকেও বড়ো ভয়ংকরভাবে ভুগতে হবে এইজন্যে।

দয়া করে আপনার পরিচয়টা দিন।

আমি আলেকজান্ডার হোল্ডার, থ্রেডনীডল স্ট্রিটের হোল্ডার অ্যান্ড স্টিভেনশন ব্যাঙ্কের সিনিয়র পার্টনার।

নামটা পরিচিত। লন্ডন শহরের দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাইভেট ব্যাঙ্কের অংশীদারের নাম জানে না, এমন লোক এ-শহরে খুব কমই আছে। কিন্তু এমন কী কাণ্ড ঘটেছে যে মাথার চুল ছিঁড়ছেন এহেন বিশিষ্ট নাগরিক?

উন্মুখ হয়ে রইলাম ব্যাঙ্কারের দুর্দৈব শোনবার জন্যে।

উনি বললেন, ব্যাপারটা এত জরুরি যে পুলিশের কাছে আপনার নাম শুনেই পাতাল রেলে চলে এসেছি। স্টেশন থেকে গাড়িতে না-এসে হেঁটে আসছি হড়হড়ে রাস্তায়, পাছে গাড়ি আস্তে চলে–এই ভয়ে। তাই হয়তো হাঁপিয়ে গেছি।

আপনারা তো জানেন ব্যাঙ্কের লাভ বাড়াতে হলে টাকা খাটাতে হয়। দামি দামি জিনিস বাঁধা রেখে অনেক খানদানি মানুষই আমাদের কাছ থেকে টাকা ধার নেন।

গতকাল সকালে আমার কাছে এলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি শুধু ইংলন্ডেই প্রাতঃস্মরণীয় নন, সারাপৃথিবী তাকে চেনে! নামটা নাই-বা বললাম।

উনি এসেই আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড° ধার চাইলেন। বললেন, দেখুন, এ-টাকা আমি বন্ধুবান্ধবের কাছে চাইলেও পেতে পারি কিন্তু তাতে আমার মানসম্মান আর থাকবে না।

আমি বললাম, কিন্তু আমার নিজের তত টাকা নেই। ব্যাঙ্ক থেকে দিতে হলে যে কিছু একটা বাঁধা রাখতে হবে।

উনি তখন কালো মরক্কো চামড়ার একটা বাক্স দেখিয়ে বললেন, পান্না মুকুটের নাম নিশ্চয় শুনেছেন?

নিশ্চয়! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্পদ এই পান্না মুকুট।

বাক্সটা খুলে মূল্যবান সেই মুকুট বার করে উনি বললেন, এতে উনচল্লিশটা মস্ত আকারের পান্না আছে। এ ছাড়া সোনা কতখানি আছে, দেখতেই পাচ্ছেন। সব মিলিয়ে এর যা দাম, তার অর্ধেক ধার চাইছি আপনার কাছে। সুদসমেত টাকা ফিরিয়ে দেব চারদিন পরে সামনের সোমবার। ওইদিন কিছু টাকা হাতে আসবে আমার। এই বন্ধকিতে চলবে?

কী যে বলেন!

মিস্টার হোল্ডার, মনে রাখবেন, এ-মুকুট জাতীয় সম্পত্তি। একটা পান্নাও যদি খোয়া যায়, দুনিয়া ছুঁড়ে এলেও ঠিক ওই জিনিসটি আর পাওয়া যাবে না। কাজেই কথাটা যেন এ-ঘরের বাইরে আর না-যায়। সোমবার সকালে আমি নিজেই আসব।

ক্যাশিয়ারকে ডেকে হাজার পাউন্ডের পঞ্চাশটা নোট নিতে হুকুম দিলাম। উনি যাওয়ার পর মুকুটটা আমার প্রাইভেট ভল্টে বন্ধ করে রাখলাম। একটু ভয়ও হল। অমূল্য এই সম্পদের দায়িত্ব

-নিলেই ভালো হত।

সন্ধে হল। বাড়ি ফেরার সময়ে মুকুটটা সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। ব্যাঙ্ক ডাকাতি আকছার হচ্ছে। তাই দিনকয়েকের জন্যে এহেন বস্তুকে আমার কাছে রাখব মনস্থ করলাম।

আমার বাড়িতে চাকরবাকরদের মধ্যে তিনজন ঝি আছে। এদের মধ্যে লুসি পার বলে যে-মেয়েটি, তাকে নিয়েই আমার যত দুশ্চিন্তা। মেয়েটির কাজকর্ম ভালো আবার দেখতেও ভালো। ফলে, জনকয়েক নাগর দিনরাত ঘুর ঘুর করে গাড়ির আনাচেকানাচে। চাকরবাকর সবাই কিন্তু শোয় বাড়ির বাইরে।

আমি বিপত্নীক। একমাত্র ছেলে আর্থার বখে গেছে। লোকে বলে, আশকারা দিয়ে আমিই তাকে একটা বাঁদর তৈরি করেছি। গোঁয়ার, উড়নচণ্ডী, রেস খেলা, জুয়ো খেলা–সব গুণই তার আছে। বদ সঙ্গী তার অনেক–এদের মধ্যে স্যার জর্জ বার্নওয়েল লোকটি ওর প্রাণের বন্ধু যদিও তিনি বয়সে বড়ো! এঁর খপ্পর থেকে আর্থার বেরোতে পারছে না। এইসব কারণেই আমার কারবারে ওকে আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

আর্থারকে সিধে করে দিতে পারত আমার ভাইঝি মেরি। ভাই মারা যাওয়ার পর থেকে সে আমার বাড়িতেই মানুষ হয়েছে আমারই মেয়ের মতো। বড়ো ভালো মেয়ে। রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী। আর্থার তাকে দু-বার বিয়ে করতে চেয়েছে–দু-বারই সে নারাজ হয়েছে। অথচ বিয়েটা হয়ে গেলে আর্থারকে সৎপথে টেনে আনতে পারত মেরি। এই একটি ব্যাপারে মেরি আমার মনে দাগা দিয়েছে। এখন অবশ্য জল এতদূর গড়িয়েছে যে আর কিছুই করার নেই।

মুকুটটা বাড়িতে আসবার পর এই নিয়েই কথা হচ্ছিল খাওয়ার টেবিলে। লুসি পার কথা শুরুর আগেই চলে গিয়েছিল ঘর ছেড়ে দরজা বন্ধ করেছিল কি না খেয়াল করিনি।

মুকুট আমার কাছে, এইটুকুই কেবল বলেছিলাম আর্থার আর মেরিকে বাঁধা রেখে গেছেন যিনি, তার নামটা বলিনি।

শুনেই লাফিয়ে উঠল আর্থার আর মেরি দুজনেই। দেখবার জন্যে আবদার ধরল। আমি রাজি হলাম না।

আর্থার তখন জিজ্ঞেস করল, রেখেছ কোথায় মুকুটটা?

আমার আলমারিতে।

ও বললে, চুরি না হয়ে যায়।

আমি বললাম, চাবি দেওয়া আছে।

ও বলল, গুদোম ঘরের চাবি দিয়ে ছেলেবেলায় আমি নিজেই ও-আলমারি কতবার খুলেছি। পুরোনো আলমারি তো একটা-না-একটা চাবি ঠিক লেগে যায়।

আর্থারের কথাবার্তাই এইরকম।

রাত্রে মুখখানা কালো করে আমার কাছে এল আর্থার। দু-শো পাউন্ড ধার চাইল। না-দিলে নাকি ক্লাবে মাথা কাটা যাবে! ভীষণ রেগে হাঁকিয়ে দিলাম তক্ষুনি। এক মাসে তিনবার এইভাবে টাকা নিয়ে গেছে–আর একটি পয়সাও নয়।

মুখ অন্ধকার করে ও বলে গেল, কিন্তু বাবা, টাকাটা আমাকে জোগাড় করতেই হবে–যে করেই হোক।

আলমারি খুলে দেখে নিলাম পান্না-মুকুট ঠিক জায়গায় আছে কি না। তারপর নিজেই বেরোলাম বাড়ির সব দরজা জানলা বন্ধ হয়েছে কি না দেখবার জন্যে। কাজটা মেরির–কিন্তু কাল রাতে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না।

হল ঘরে এসে দেখি জানলা খুলে কী দেখছে মেরি। আমি যেতেই জানলা বন্ধ করে দিয়ে বললে, কাকা, লুসিকে কি বাইরে যেতে বলেছিলে?

না তো।

কিন্তু এইমাত্র খিড়কি দরজা দিয়ে বাড়ি ঢুকল লুসি। নিশ্চয় কারো সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। খুব খারাপ। অভ্যেসটা বন্ধ করা দরকার!

কালকে তুমি কড়কে দিয়ে। দরজা জানলা সব বন্ধ হয়েছে?

হ্যাঁ বাবা।

ঘরে চলে এলাম। ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম আমার এমনিতেই পাতলা, তার ওপর মন উচাটন হওয়ায় ঘুম গাঢ় হয়নি মোটেই। আচমকা তাই কোথায় যেন একটা আওয়াজ শুনে ঘুম ছুটে গেল আমার। রাত তখন দুটো। পুরো ঘুম ভাঙার আগেই থেমে গেল শব্দটা কোথায় যেন একটা জানলা বন্ধ হওয়ার আওয়াজ সেটা। কান খাড়া করে রইলাম। পাশের ঘরে শুনলাম পা টিপে টিপে চলার আওয়াজ।

বুকটা ধড়াস করে উঠল তৎক্ষণাৎ। খাট থেকে নেমে দৌড়ে গেলাম পাশের ঘরে। দেখলাম গ্যাসের আলোয় মুকুট হাতে নিয়ে গায়ের জোরে বেঁকানোর চেষ্টা করছে আর্থার। পরনে শার্ট আর প্যান্ট।

দেখেই বিকট চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। চমকে উঠল আর্থার। হাত ফসকে মুকুট পড়ে গেল মেঝেতে। তুলে নিয়ে দেখলাম তিনটে পান্নাসমেত একটা কোণ উধাও।

চিৎকার করে বলেছিলাম, রাসকেল কোথাকার! আমার মাথা হেঁট করে ছাড়লি শেষকালে! ভাঙলি এমন জিনিসকে ! চোর! কোথায় গেল পান্না তিনটে?

আমি চোর? গলাবাজি করে বললে আর্থার।

আলবাত তুই চোর, কুলাঙ্গার কোথাকার!

না, না, না। কিছু চুরি যায়নি।

আবার মুখের ওপর কথা! তিনটে পান্না ভেঙে নিয়েছিস, আরও ভাঙতে যাচ্ছিলিস– নিজের চোখে দেখেছি।

বাবা, যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছ। কিন্তু আর নয়। কালই এ-বাড়ি ছেড়ে আমি চলে যাব।

বাড়ি ছেড়ে যাবি? তার আগে তোকে পুলিশে দোব!

দিতে পার। কিন্তু আমার পেট থেকে একটা কথাও বার করতে পারবে না। দেখি পুলিশ চুরির কিনারা করতে পারে কি না। কথাগুলো আর্থার বলল বেশ আবেগের সঙ্গে যা তার ধাতে নেই।

চেঁচামেচি শুনে মেরি দৌড়োতে দৌড়োতে ঢুকল আমার ঘরে। পান্না মুকুট আর আর্থারকে দেখেই বুকফাটা চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে। চাকরবাকরও দৌড়ে এল তৎক্ষণাৎ। পুলিশ ডাকিয়ে আনলাম ওদের দিয়ে। ইনস্পেকটর আসতেই আর্থার বললে, সত্যিই কি আমি তাকে পুলিশের হাতে দোব? আমি বললাম–নিশ্চয়। পান্না মুকুট দেশের সম্পত্তি প্রকাশ্যভাবেই চুরির তদন্ত হোক।

আর্থার তখন মিনতি করে বললে, পাঁচ মিনিটের জন্যে বেরোতে দেবে? তাতে তোমার ভালোই হবে জানবে।

না। হয় পালাবি, নয় চোরাই মাল লুকিয়ে ফেলবি। তার চেয়ে বরং বল কোথায় রেখেছিস। আমার মুখে চুনকালি পড়বে, দেশ জুড়ে হইচই পড়বে, আমার চাইতে অনেক উঁচু মহলের এক ভদ্রলোকের মানসম্মান ধুলোয় লুটোবে। আর্থার, এখনও বল কোথায় রেখেছিস কেলেঙ্কারি বাড়াসনি।

মুখ ফিরিয়ে নিল আর্থার। বুঝলাম সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। সঙ্গদোষে ও এখন পাকা বদমাশ। পুলিশকে বললাম তাদের যথাকর্তব্য করতে। সারাবাড়ি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। ওর ঘর তল্লাশ করা হল, দেহ সার্চ করা হল–কিন্তু পান্না তিনটে আর পাওয়া গেল না। ভয় দেখিয়েও আর্থারের পেট থেকে কিছু বের করা গেল না! ওকে হাজতে পাঠিয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে আসছি আপনার কাছে। মি. হোমস, আপনি আমাকে বাঁচান। এক হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করেছি রত্ন উদ্ধারের জন্যে। এ ছাড়াও আপনার পারিশ্রমিক আমি দোব। আমাকে বাঁচান! মাথা চেপে ধরে গোঙাতে লাগলেন ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক।

ভুরু কুঁচকে আগুনের দিকে তাকিয়ে রইল শার্লক হোমস।

তারপর বললে, বাড়িতে বাইরের লোক কীরকম আসে?

আমার পার্টনারের ফ্যামিলি আর আর্থারের বন্ধু স্যার জর্জ বার্নওয়েল ছাড়া কেউ আসে না। বাওয়েল ইদানীং ঘনঘন আসছেন।

সামাজিকতা রাখেন কীরকম? পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা?

ওটা আর্থার করে। আমি আর মেরি বাড়িতেই থাকি।

কমবয়েসি মেয়ের পক্ষে অভ্যেসটা একটু অস্বাভাবিক।

মেরি খুব শান্ত স্বভাবের মেয়ে, বয়সও খুব কম নয়। এই তো চব্বিশে পড়েছে।

আপনার কথা শুনে মনে হল, ঘটনাটায় প্রচণ্ড শক পেয়েছে মেরি।

ভীষণ আঘাত পেয়েছে। আমার চেয়েও বেশি।

আপনাদের দুজনেরই বিশ্বাস আর্থারই দোষী?

নিজের চোখে দেখেছি তাকে পান্না মুকুট হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে।

সেটা কিন্তু অকাট্য প্রমাণ নয়। মুকুটের বাদবাকি অংশে চোট লেগেছে?

বেঁকে গেছে।

বাঁকা অংশ সিধে করার চেষ্টা করছিল বলে মনে হয়নি আপনার?

অতই যদি সাধু হবে তো বলতেই পারত।

তা ঠিক। এটাও ঠিক যে দোষ করে থাকলে এক-আধটা মিথ্যেও তো বলতে পারত বলল না কেন? ওর ওই চুপ করে থাকাটার মানে অনেক গভীর। যে-শব্দ শুনে আপনার ঘুম ভেঙেছে, সে-শব্দ কীসের পুলিশ কি তা ধরতে পেরেছে?

ওদের মতে, আওয়াজটা আর্থারের শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করার শব্দ।

গল্প হিসেবে মন্দ নয়। রাতদুপুরে বাড়িসুদ্ধ লোককে জাগিয়ে দেওয়ার মতো আওয়াজ করে দরজা বন্ধ করল এমন একটা লোক যে কিনা চুপিসারে চুরি করতে চাইছে রত্ন মুকুট। পান্না তিনটের অদৃশ্য হওয়া সম্পর্কে কী বলে পুলিশ?

সারাবাড়ির তক্তা পর্যন্ত খুলে দেখেছে কোথাও লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না।

বাড়ির বাইরে দেখবার কথা একবারও ভেবেছে কি?

নিশ্চয়। তন্নতন্ন করে দেখা হয়েছে বাগান।

দেখুন মশায়, আপনারা যা ভেবেছেন, এ-কেস ততটা সোজা নয়। বেশ জটিল। আপনার ছেলে খাট থেকে নেমে ভীষণ ঝুঁকি নিয়ে এল আপনার ড্রেসিং রুমে, আলমারি খুলে পান্না মুকুট বের করে গায়ের জোরে তা থেকে তিনটে পান্না খসিয়ে নিয়ে এমন একটা জায়গায় লুকিয়ে রাখল যার সন্ধান কেউ পাচ্ছে না আবার ফিরে এল ছত্রিশটা পান্না সমেত মুকুট হাতে ধরা পড়বার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ড্রেসিং রুমে। মশায়, সম্ভব বলে মনে হয় কি?

তা ছাড়া আর কী হতে পারে তাহলে বলুন! নিঃসীম নৈরাশ্যে যেন ভেঙে পড়লেন বেচারি ব্যাঙ্কার। উদ্দেশ্য যদি মহৎ থাকে তো খুলে বলল না কেন?

সেইটাই এখন আমাদের দেখতে হবে, বললে হোমস। চলুন, আপনার বাড়ি যাওয়া যাক।

বাড়িটা চৌকোনো, সাদা পাথরের। সামনে বরফ ঢাকা লন। দু-দিকে দুটো লোহার ফটক। ডান দিকে আর বাঁ-দিকে দুটো গলি। বাঁ-দিকেরটা গেছে আস্তাবলের দিকে–লোকজনের যাতায়াত সেখানে কম। ডান দিকেরটা গেছে বাগানের দিকে–এদিকেই বাইরের লোক চলে বেশি। হোমস এই গলি দিয়ে বাগানে গেল তো গেলই কাঁহাতক আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়, মি. হোল্ডার আমাকে নিয়ে বসলেন খাবার ঘরে। এমন সময়ে একজন সুন্দরী তরুণী ঢুকল ঘরে। বিষণ্ণ মুখটি ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। সজল কালো

চোখেও বিষাদ ফুটে বেরোচ্ছে। নীরক্ত ঠোঁট। মুখ দেখেই বোঝা যায় ভেতরে ভেতরে একেবারেই ভেঙে পড়েছে মেয়েটি। কিন্তু ধাত শক্ত বলেই বাইরে অতটা প্রকাশ করছে না।

ঘরে ঢুকেই সোজা গেল মি. হোল্ডারের কাছে। মাথায় হাত বুলিয়ে বললে, কাকা, আর্থারকে ছেড়ে দিতে বলেছ?

দুর! আগে ফয়সালা হোক–তারপর।

কিন্তু আমি জানি সে নির্দোষ।

তাহলে মুখে কথা ফুটছে না কেন?

পুলিশে ধরিয়ে দিয়েছ বলে হয়তো ঘা খেয়েছে মনে।

অকারণে তো দিইনি। মুকুট ওর হাতেই দেখেছি আমি।

হাতে নিয়ে দেখছিল। ওকে ছাড়িয়ে আনো, কাকা। ও নির্দোষ।

মেরি, পান্না তিনটে না-পাওয়া পর্যন্ত আর্থারকে ছাড়া হবে না। লন্ডন থেকে বড়ো গোয়েন্দা নিয়ে এনেছি রত্ন উদ্ধারের জন্যে। যতক্ষণ না পাচ্ছি, কাউকে ক্ষমা করব না।

ইনি?

না, এঁর বন্ধু। এখন পাশের গলি দেখছেন।

গলি দেখছেন? ভুরু দুটো ধনুকের মতো বেঁকিয়ে ফেলল সুন্দরী।গলিতে কী আছে?–এই যে, এসে গেছেন। আপনিই লন্ডন থেকে এসেছেন? আমার ভাই যে নির্দোষ, প্রমাণ করতে পারবেন তো? আমি যে জানি সে কোনো দোষ করেনি।

আমিও তাই বিশ্বাস করি, মিস হোল্ডার, ঘরে ঢুকে পা ঠুকে ঠুকে জুতো থেকে বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে বললে হোমস। সেইজন্যেই দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে।

স্বচ্ছন্দে করুন–তাতে যদি আমার ভাই খালাস পায়, ক্ষতি কী?

কাল রাতে আপনি কোনো আওয়াজ শোনেননি?

না। কাকার চেঁচামেচি শুনে দৌড়ে আসি–তার আগে কিছু শুনিনি।

রাতে সব জানলা বন্ধ করেছিলেন তো?

নিশ্চয়।

আজ সকালেও সব বন্ধ ছিল।

হ্যাঁ।

এ-বাড়ির একজন দাসীর একটা মনের মানুষ আছে শুনেছি। কাল রাতে আপনিই খবরটা দিয়েছিলেন কাকাকে বাইরে বেরিয়েছিল নাকি তার সঙ্গে দেখা করতে।

রত্নমুকুটের কথা কাকা ওর সামনেই বলে ফেলেছিল।

তাই নাকি? তার মানে আপনার ধারণা মনের মানুষটিকে খবরটা পৌঁছে দেয় এই দাসী–মুকুট সরায় দুজনে যোগসাজশ করে?

মি. হোল্ডার বলে উঠলেন, ধারণা-টারণার কোনো দরকার আছে কি? আমি নিজের চোখে দেখেছি আর্থারকে মুকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে।

হোমস বললে, আর্থারের কথা পরে হবে মি. হোল্ডার। মিস হোল্ডার, মেয়েটি বাড়ি ফিরেছিল কি রান্নাঘরের দরজা দিয়ে?

হ্যাঁ। দরজা বন্ধ হয়েছে কি না দেখতে গিয়ে দেখলাম বাড়ি ফিরছে টিপে টিপে। লোকটাকেও আবছাভাবে দেখেছিলাম অন্ধকারে।

চেনেন তাকে?

চিনি। সবজি বেচে। নাম, ফ্রান্সিস প্রসপার।

দরজার একটু বাঁ-দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল–রাস্তার ওপর?

হ্যাঁ।

একটা পা কাঠের?

সুন্দরীর ভাবব্যঞ্জক কালো চোখে ভয়ের ছায়া পড়ল যেন।

হাসল। বলল, আপনি জাদুকর নাকি? জানলেন কী করে?

হোমস কিন্তু হাসল না। শীর্ণ মুখটি উদ্দীপ্ত হয়ে রইল আতীব্র আগ্রহে।

বলল, বাইরেটা আর একবার দেখবখন। তার আগে নীচের তলার জানলাগুলো দেখে নিই–তারপর দেখব ওপরতলা।

দ্রুত পদক্ষেপে এক জানলা থেকে আর এক জানলায় সরে গেল হোমস। থমকে দাঁড়াল বড়ো জানালাটার সামনে এখান থেকে দেখা যায় পাশের সরু গলি। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং লেন্স বের করে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল গোবরাট।

তারপর বললে, চলুন এবার ওপরে যাওয়া যাক।

ব্যাঙ্কারের ড্রেসিং রুমের আসবাবপত্র অতি সাধারণ। আয়না আলমারি আর কার্পেট। আলমারির তালাটার দিকে চোখ পাকিয়ে চেয়ে রইল হোমস।

বলল, খোলার চাবি কোনটা?

আমার ছেলে যে-চাবির কথা নিজের মুখে বলেছে–গুদামঘরের চাবি।

আছে এখানে?

ড্রেসিং টেবিলের ওপর রয়েছে।

চাবিটা তুলে নিয়ে আলমারি খুলল শার্লক হোমস।

বলল, খোলার সময়ে একদম আওয়াজ হয় না–সেই কারণেই ঘুম ভাঙেনি আপনার। মুকুটটা নিশ্চয় এই বাক্সতে আছে। দেখি কীরকম, বলে বাক্স খুলে অপূর্ব সুন্দর

রত্নমুকুট বের করে চেয়ে রইল অনিমেষে। দেখবার মতোই মুকুট বটে। এ-রকম উৎকৃষ্ট পান্না আমি জীবনে দেখিনি। একটা কোণ ভাঙা–তিনটে পান্না খসিয়ে নেওয়া হয়েছে ওইখান থেকে।

মি. হোল্ডার, কোণটা ভাঙুন দিকি, বললে হোমস।

আঁতকে উঠলেন ব্যাঙ্কার ভদ্রলোক, ও-কথা মুখে আনাও পাপ।

তাহলে আমিই ভাঙছি, বলেই হঠাৎ সর্বশক্তি দিয়ে কোণটা ভাঙতে গেল হোমস, কিন্তু পারল না। বলল, আমার আঙুলের জোর নেহাত কম নয়, মি. হোল্ডার। কিন্তু এ-জিনিস ভাঙতে গেলে আরও সময় দরকার। সাধারণ মানুষ পারবে না ভাঙতে। ভাঙবার পরেও পিস্তল ছোঁড়ার মতো একটা প্রচণ্ড শব্দ হবে। এত কাণ্ড ঘটে গেল আপনার খাট থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে, অথচ আপনি জানতে পারলেন না?

আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না।

মিস হোল্ডার, আপনি কী বলেন?

কাকার মতো আমিও ধাঁধায় পড়েছি।

ছেলেকে যখন দেখেছিলেন, তখন কি তার পা খালি ছিল? জুতো বা চটি কিছু পরে ছিল কি?

প্যান্ট আর শার্ট ছাড়া কিছু না।

ধন্যবাদ, ভাগ্য সহায় আমাদের, তাই কেসটা সহজেই সুরাহা করা যাবে। মি. হোল্ডার, এবার বাইরেটা ফের দেখে আসা যাক।

গেল কিন্তু একলাই–সবাই মিলে গেলে নাকি অত পায়ের ছাপে সব একাকার হয়ে যাবে। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এল জুতো ভরতি বরফ আর মুখভরা হেঁয়ালি নিয়ে।

বললে, মি. হোল্ডার, যা দেখবার সব দেখা হয়ে গেছে। এবার আপনার কাজটা বাড়ি ফিরে সারব।

কিন্তু রত্ন তিনটে কোথায় বলে যাবেন তো?

তা তো বলতে পারব না।

সে কী! জন্মের মতো খোয়া গেল বলতে চান! ছেলেটা? তার কী হবে?

একবার যা বলেছি, তার অন্যথা হবে না।

কাল রাতের ব্যাপার একটু খোলসা করে বলুন তাহলে!

কাল সকাল ন-টা থেকে দশটার মধ্যে বেকার স্ট্রিটে আমার সঙ্গে দেখা করুন। যা বলবার তখনই বলব। রত্ন উদ্ধারে নিশ্চয় কার্পণ্য করব না। যা খরচ হবে, দেবেন তো?

আরে মশাই, যথাসর্বস্ব যদি চান, তাও পাবেন!

তাহলে এখন চলি। হয়তো সন্ধে নাগাদ একবার আসতে হতে পারে।

বেশ বুঝলাম, মনে মনে রত্ন-রহস্যের মীমাংসা করে এনেছে বন্ধুবর। বেশ কয়েকবার কথা বলাতে চেষ্টা করলাম ফেরবার পথে, কিন্তু এড়িয়ে গেল প্রতিবার। বাড়ি ফিরেই ঢুকল নিজের ঘরে। মিনিট কয়েক পরে বেরিয়ে এল পাক্কা লোফারের ছদ্মবেশে।

বললে, তোমাকে সঙ্গে নিতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। হয়তো ঠিক পথেই চলেছি, অথবা আলেয়ার পেছনে ধাওয়া করছি। যাই হোক ফিরব ঘণ্টা কয়েক পরে। তাক থেকে মাংস নিয়ে দুটো পাউরুটির মধ্যে রেখে স্যান্ডউইচ বানিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে উধাও হল শার্লক হোমস।

ফিরে এল আমার চা পানের সময়ে। ফুর্তি যেন ফেটে পড়ছে। হাতে এক পাটি ইলাস্টিক লাগানো বুট জুতো। ঘরের কোণে জুতোটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বসে গেল চা খেতে।

বলল, যাওয়ার পথে ঢুঁ মেরে গেলাম।

আবার কোনদিকে?

ওয়েস্ট এন্ডের ওপাশে। ফিরতে দেরি হতে পারে।

কাজ এগোল?

মোটামুটি। ব্যাঙ্কারের পাড়ায় গেছিলাম এখন, বাড়ি মাড়াইনি। রহস্যটা ছোট্ট হলেও চমৎকার। যাকগে, আপাতত এই বিতিগিচ্ছিরি ধড়াচূড়া ছেড়ে নিজের পোশাকে ঢোকা যাক।

মুখে না-বললেও চকচকে চোখ আর রক্তিম গাল দেখেই বুঝলাম কাজ ভালোই এগোচ্ছে। দ্রুত উঠে গেল ওপরতলায়। একটু পরেই দড়াম করে বন্ধ হল হল ঘরের দরজা। তার মানে, আবার অভিযানে বেরোল শার্লক হোমস।

মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেও যখন ফিরল না, তখন শুয়ে পড়লাম। তদন্তে ডুব দিলে অনেক রাত অনেক দিন এইভাবেই ও বাইরে কাটায়। পরের দিন সকাল বেলা প্রাতরাশের টেবিলে দেখলাম এক কাপ কফি আর দৈনিক কাগজ নিয়ে বসে রয়েছে দিব্যি তাজা চেহারায়।

ওয়াটসন তোমাকে ফেলেই খেতে বসে গেছি বলে কিছু মনে কোরো না। মনে আছে তো, মক্কেল ভদ্রলোক আজ একটু সকাল সকাল আসবেন?

বললাম, আরে, ন-টা তো বেজে গেছে। এসে গেলেন বোধ হয়, ওই শোনো ঘণ্টা বাজছে।

ব্যাঙ্কারই বটে। কিন্তু আঁতকে উঠলাম মুখ দেখে। এ কী চেহারা হয়েছে। মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়েছে, চোয়াল আরও ঝুলে পড়েছে, চুল পর্যন্ত যেন আরও সাদা হয়ে এসেছে। পা যেন আর চলছে না—নিঃসীম অবসাদেশরীর ভেঙে পড়েছে। চেয়ার এগিয়ে দিতেই বসে পড়লেন ধপ করে।

বললেন ভাঙা গলায়, জানি না কী পাপের জন্যে এত সাজা পাচ্ছি। দু-দিন আগেও আমার ভেতর সুখ আর সম্পদ উথলে উঠেছিল–দুনিয়ার কারো ধার ধারিনি। আজ আমার কেউ নেই। মানসম্মানও নেই। দুঃখ শোক কখনো একলা আসে না–পরের পর আসে। ভাইঝিটা চলে গেল।

চলে গেল?

হ্যাঁ। বিছানা স্পর্শ করেনি। ঘর ফাঁকা। কাল রাতে রাগের মাথায় বলে ফেলেছিলাম, আর্থারকে বিয়ে করলে ছেলেটা আজ সুখে থাকত। বলাটা বোধ হয় ঠিক হয়নি। চিঠিতে সে-কথাটাও লিখেছে :

আমার প্রাণপ্রিয় কাকা,

বেশ বুঝেছি আমার জন্যেই আজ তুমি এই ঝামেলায় পড়েছ। যতই তা ভাবছি, ততই বুঝেছি এ-বাড়িতে আমার আর থাকা উচিত নয়। কোনোদিনও আর শান্তি পাব না। তাই জন্মের মতো চললাম। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভেবো না–সে-ব্যবস্থা হয়েছে। তার চেয়েও বড়ো কথা, আমাকে খুঁজতে যেয়ো না চেষ্টাটা বৃথা হবে। জীবনে মরণে জানবে আমি তোমার পরম স্নেহের সেই,

—মেরি

মি. হোমস, মানে কী চিঠিটার? আত্মহত্যা?

মোটেই না। বলতে পারেন, জটিল সমস্যার চমৎকার সমাধান। মি. হোল্ডার, আপনার রাহুর দশা এবার কাটতে চলেছে।

অনেক খবর জানেন মনে হচ্ছে? পান্নাগুলো কোথায়?

এক-একটা পান্নার জন্যে হাজার পাউন্ড দিতে পারবেন তো?

দশ হাজার দোব।

অত দরকার হবে না। পুরস্কার বাবদ কিছু টাকা ধরলে সব মিলিয়ে হাজারেই হবে। চেকবই এনেছেন? এই নিন কলম। চার হাজারের একটা চেক লিখে দিন।

ভ্যাবাচ্যাকা মুখে চেক লিখে দিলেন ব্যাঙ্কার। ডেস্কের ড্রয়ার থেকে একটা বস্তু বার করল হোমস। তেকোনা সোনায় বসানো তিনটে পান্না। ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর।

তীব্র আনন্দে পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠে জিনিসটা খামচে ধরলেন মক্কেল ভদ্রলোক।

বাঁচালেন! ওঃ, আমার প্রাণটা আপনি বাঁচিয়ে দিলেন!

কড়া গলায় হোমস বললে, মি. হোল্ডার, আপনাকে আর একটা দেনা মেটাতে হবে।

তৎক্ষণাৎ কলম তুলে নিলেন ব্যাঙ্কার, বলুন কত দিতে হবে?

দেনাটা আমার কাছে নয়–আপনার অত্যন্ত মহৎ ওই ছেলের কাছে।

বলেন কী! আর্থার তাহলে চুরি করেনি?

সে-কথা কালকে বলেছিলাম–আজও বলছি।

তাহলে চলুন, এখুনি গিয়ে বলে আসি।

ও জানে। আমি গেছিলাম আজকে। দু-একটা ব্যাপারে ধোঁকা কাটছিল না—আপনার ছেলেই তা পরিষ্কার করে দিয়েছে। আপনি গিয়ে রত্ন উদ্ধারের খবরটা দিলে নিজেই মুখ খুলবেখন।

রহস্যটা কী এবার বলবেন?

নিশ্চয় বলব, খুব আঘাত পাবেন শুনলে। স্যার জর্জ বার্নওয়েল আর আপনার ভাইঝির মধ্যে আঁতাত ছিল। দুজনেই পালিয়েছে একসঙ্গে।

মেরি? অসম্ভব!

অসম্ভব হলেও সত্যি। স্যার জর্জ বার্নওয়েলকে আপনারা চেনেন না। ইংলন্ডের কুখ্যাত জঘন্য বদমাশদের তিনি অন্যতম। বিবেক বলে কোনো বস্তু নেই। জুয়ো খেলে পথে বসেছেন। বহু মেয়ের সর্বনাশ করেছেন। এখন করলেন আপনার ভাইঝির। প্রায় প্রতিদিন সন্ধের সময়ে দেখাসাক্ষাৎ হত দুজনের।

বিবর্ণ হয়ে গেলেন মি. হোল্ডার, অবিশ্বাস্য! একেবারেই অবিশ্বাস্য!

তাহলে শুনুন সেই রাতের ঘটনা। আপনি শুতে গেছেন জেনে ভাইঝিটি জানলা খুলে মুকুটের খবরটা দিয়েছিল তাকে। লোভী তিনি। শুনেই চেয়ে বসলেন রত্নমুকুট। এই সময়ে আপনি এসে পড়ায় জানলা বন্ধ করে দিয়ে দাসীর খবরটা আপনাকে দেয় মেরি।

আর্থারের সঙ্গে আপনার কথা কাটাকাটির পর দুজনেই শুয়ে পড়লেন। ক্লাবে দেনার কথা ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল আর্থারের ঘুম উড়ে গেল চোখ থেকে। এমন সময়ে পায়ের শব্দ শুনে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এসে দেখে বোন যাচ্ছে আপনার ড্রেসিং রুমে। তাড়াতাড়ি গায়ে জামা চড়িয়ে খালি পায়ে পিছু নেয় আর্থার। আড়াল থেকে দেখে আলমারি খুলে মুকুট নিয়ে নীচে গেল মেরি, জানলা খুলে পাচার করে দিল বাইরে। মেরি নিজের ঘরে না-যাওয়া পর্যন্ত লোকটার পিছন ধাওয়া করতে পারেনি সে। তারপরেই জানলা খুলে লাফ দিল বাইরে। দেখেই চিনল বার্নওয়েলকে। ধস্তাধস্তির সময়ে ঘুসি মেরে বার্নওয়েলের চোখের ওপর বেশ খানিকটা জায়গা কেটেও দেয়–মুকুট ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে আসে বাড়ির ভেতরে। এত কাণ্ড সে করেছে শুধু আপনার সর্বনাশ হতে চলেছে দেখে চেঁচামেচিও করতে পারেনি মেরির জন্যে। তাকে যে সে ভালোবাসে। একেই বলে শাঁখের করাত।

ড্রেসিং রুমে ফিরে এসে দেখল মুকুটের কোণ ভাঙা। হাত দিয়ে যখন বাঁকা দিকটা সিধে করার চেষ্টা করছে ঠিক তখন আপনি চড়াও হলেন তার ওপর। এত বড়ো কাজ করার প্রশংসা পেল না–পেল চোর বদনাম। পুলিশে ধরিয়ে দিলেন নিজের হাতে। তাই প্রচণ্ড

অভিমানে একটি কথাও সে বলেনি–মেরিকেও ধরিয়ে দেয়নি কিন্তু পাঁচ মিনিটের জন্যে বাইরে বেরোতে চেয়েছিল মুকুটের ভাঙা কোণটা রাস্তা থেকে খুঁজে আনার জন্যে ও ভেবেছিল টানাটানিতে ভেঙে গিয়ে নিশ্চয় পড়ে আছে গলির মধ্যেই।

আপনার বাড়ি গিয়ে রান্নাঘরের দরজার পাশে বরফের ওপর ছাপ দেখে বুঝলাম, একজন নারী একজন পুরুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করেছে সেখানে। পুরুষটির একটি পা কাঠের গোল দাগ পড়েছে বরফে। লুসি আর তার মনের মানুষের ব্যাপারটা তাহলে সত্যি।

কিন্তু গলির মধ্যে ঢুকে দেখলাম আশ্চর্য এক কাহিনি। বরফের ওপর আঁকা দু-জোড়া পায়ের ছাপ। একজন বুট পরে গেছে–বুটের ছাপ মাড়িয়ে দৌড়েছে খালি পায়ে একজন। আপনার ছেলের পায়ে জুতো বা চটি ছিল না–আপনিই বলেছেন। অর্থাৎ বুট-পরা লোকটার পেছন পেছন সে দৌড়েছে। কিছুদূর যেতেই বরফের মধ্যে বেশ খানিকটা গর্ত দেখে বুঝলাম দারুণ ঝটাপটি চলেছে সেখানে। ফোঁটা ফোঁটা রক্তও পড়ে আছে। বুট-পরা লোকটা এরপর একাই চলে গেছে–ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তার পায়ের ছাপের পাশে পড়তে পড়তে গেছে। অর্থাৎ মারপিটে সে জখম হয়েছে। খালি পা ফিরে এসেছে। অর্থাৎ আপনার ছেলে ফিরে এসেছে।

আপনার বাড়ি গিয়ে জানলার গোবরাট দেখেছিলাম আতশকাচ দিয়ে। চিহ্ন দেখে বুঝলাম, কেউ যেন লাফ দিয়ে জানলা টপকে বাইরে গেছে। এ থেকেই মনে হয়েছিল, ওপর থেকে কোনো একজন মুকুট এনে বাইরে কারুর হাতে চালান করেছিল। আর্থার

তা দেখে ফেলে পিছু নেয়। মারপিট করে মুকুট ছিনিয়ে আনে। টানাটানিতে মুকুট ভেঙে যায়। কিন্তু তারা কারা? ওপর থেকে মুকুট নামিয়ে আনল কে? বাইরে থেকে মুকুট নিয়ে পালাচ্ছিলই-বা কে?

ভাবতে ভাবতে জবাব পেয়ে গেলাম। মুকুট আপনি নিশ্চয় নামাননি। দাসীদের কেউ চুরি করে থাকলে আপনার ছেলে তার নাম গোপন করে নিজে হাজতে যাবে কেন? তাহলে সে এমন কেউ যার মুখ চেয়ে সে কেলেঙ্কারি গোপন করতে চেয়েছে। মেরিকে সে ভালোবাসে। মেরির জন্যে সে হাজতে যেতেও পারে। মনে পড়ল, মেরিকেই আপনি রাত্রে জানলার সামনে দেখেছিলেন। আর্থার আর মুকুট দেখে এই মেরিই চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু মুকুটটা কার হাতে চালান করেছিল মেরি? বাড়িতে স্যার জর্জ বার্নওয়েল ঘন ঘন আসে–মেরির সঙ্গেও দেখা করে আপনি বলেছেন। বার্নওয়েলের কুখ্যাতি আমার অজানা নয়। বুটের ছাপ নিশ্চয় তারই পান্না তিনটেও তার কাছে।

লোফারের ছদ্মবেশ ধারণ করে গেলাম স্যার জর্জ বার্নওয়েলের বাড়ি। চাকরটার সঙ্গে ভাব জমালাম। শুনলাম আগের রাতে মুখ ফাটিয়ে বাড়ি এসেছেন স্যার জর্জ। ঘুস দিয়ে তার এক পাটি বুট নিয়ে গেলাম আপনার বাড়ি পাশে। দেখলাম, বুটের ছাপের সঙ্গে স্যার জর্জের বুট হুবহু মিলে গেল।

লাফিয়ে উঠলেন মি. হোল্ডার, আরে হ্যাঁ, কাল সন্ধের দিকে একটা লোফার ঘুর ঘুর করছিল বটে গলিতে।

আমিই সেই লোফার। বাড়ি ফিরে ভদ্রলোক সেজে সোজা গেলাম বার্নওয়েলের কাছে। আমি জানতাম সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। কড়া কথাতেও যখন কাজ হল না, কিছুতেই স্বীকার করতে চাইলেন না–উলটে তেড়ে মারতে এলেন–তখন পিস্তল বার করে রগে ঠেকালাম।

ফেরত চাইলাম পান্না তিনটে বিনিময়ে দোব তিন হাজার পাউন্ড। শুনেই চমকে উঠলেন স্যার জর্জ। ভাবতেই পারেননি এত টাকা পাওয়া যেত। বলে ফেললেন, মাত্র ছ-শো পাউন্ডের বিনিময়ে হাতছাড়া করে ফেলেছেন তিনটে পাথর!

ঠিকানা আদায় করে গেলাম পাথর যে কিনেছে তার কাছে। কথা দিলাম, পুলিশি হামলা হবে—কিন্তু তিন হাজার পাউন্ডে পাওয়া যাবে পান্না তিনটে। বাড়ি এসে ঘুমোলাম রাত দুটোয়।

উঠে পড়লেন মি. হোল্ডার, মি. হোমস, আপনার ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। যা ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেক বেশি বুদ্ধিমান আপনি। ইংলন্ডকে এক মস্ত কলঙ্কের হাত থেকে আজ আপনি বাঁচিয়ে দিলেন। চলি এখন ছেলেটার কাছে ক্ষমা চেয়ে আসি। জানি না মেরি এখন কোথায়।

স্যার জর্জ বার্নওয়েলের কাছে। পাপের সাজা সেখানেই পাবে, বলল–শার্লক হোমস।

———————-

টীকা

১. পান্না-মুকুটের আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চার : দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য বেরিল করানেট স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের মে, ১৮৯২ সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. হোল্ডার অ্যান্ড স্টিভেনশন ব্যাঙ্ক : এই নামে কোনো ব্যাঙ্ক ইংলন্ডে আদৌ ছিল না। সেই সময়ে এই ধরনের যে জনপ্রিয় ব্যাঙ্কটির নাম পাওয়া যায়, সেটি হল গ্লাইন, মিলস অ্যান্ড কোম্পানি।

৩. পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড : সে-কালের পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড, আজকের হিসেবে প্রায় সাত মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কাছাকাছি।

৪. মরক্কো চামড়া : বিশেষভাবে পাকানো বা tan করা ছাগলের চামড়া।

৫. পান্না : বেরিলিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়ামের সিলিকেট বেরিল। এর ক্রিস্টাল ছয় কোনা বিশিষ্ট। সবুজ রঙের বেরিলকে পান্না বলা হয়। নীলচে সবুজ বেরিল পরিচিত অ্যাকোয়ামেরিন নামে। নানা ধরনের বেরিলের মধ্যে সবচেয়ে দামি পাথর হল পান্না।

৬. দু-বার বিয়ে করতে চেয়েছে : ভিক্টোরীয়-ইংলন্ডে তুতো-ভাইবোনদের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। প্রসঙ্গত, রানি ভিক্টোরিয়া এবং তার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট ছিলেন তুতো-ভাইবোন। একই সম্পর্ক ছিল চার্লস ডারউইন এবং তার স্ত্রী এমা ওয়েজউডের।

৭. আমার আঙুলের জোর নেহাত কম নয় : শার্লক হোমসের হাতের জোরের পরিচয় পাওয়া যায় দ্য স্পেকলড ব্যান্ড গল্পে ফায়ারপ্লেস খোঁচানোর শিক সোজা করার ঘটনায়।

৮. দড়াম করে বন্ধ হল হল ঘরের দরজা : দোতলায় হোমসের ঘর থেকে সোজা হল ঘরে নামবার জন্য আলাদা কোনো দরজা থাকার কথা নয়।

# বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য

[দ্য ম্যান উইথ দ্য টুইসটেড লিপ]

১৮৮৯ সালের জুন মাস। রাত হয়েছে। হাই তুলে ভাবছি এবার শোওয়া যাক, এমন সময়ে এক ভদ্রমহিলা এল বাড়িতে। মুখে কালো ওড়না।

ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকেই দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল আমার বউকে।

ডুকরে উঠে বললে, বড়ো বিপদে পড়েছি রে! বাঁচাতেই হবে!

ওড়না সরিয়ে অবাক হয়ে গেল আমার গিন্নি, কেট হুইটনি যে! কী ব্যাপার?

কেট হুইটনি ও আমার স্ত্রী এক ক্লাসে পড়েছে, অনেকদিনের বন্ধু। ওর স্বামীটি দারুণ নেশাখোর। আফিমের রস মিশিয়ে তামাক খাওয়া ধরেছিল শখ করে, এখন আর ছাড়তে পারে না। আমি ওদের পারিবারিক চিকিৎসক।

কাঁদতে কাঁদতে কেট বললে, উনি আজ দু-দিন বাড়ি ফেরেননি। নিশ্চয় বার অফ গোল্ডে পড়ে আছেন।

বার অফ গোল্ড নেশার আড্ডা। যত রাজ্যের কুলি মজুর যায় সস্তায় কুঁদ হয়ে থাকতে। ও-রকম একটা বীভৎস জায়গায় কেট একলা যেতে চায় না স্বামীকে আনতে, তাই দৌড়ে এসেছে। আমার কাছে।

কেটকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। নিজেই একটা ভাড়াটে গাড়ি নিয়ে গেলাম বার অফ গোল্ডে। জায়গাটা লন্ডন ব্রিজের পূর্বদিকে জেটির পাশে একটা সংকীর্ণ অন্ধকার গলির মধ্যে।

সরু গুহার মতো একটা রাস্তা দিয়ে নামলাম নেশার আড্ডায়। কী বীভৎস কদর্য পরিবেশ ভাষায় বর্ণনা দেওয়া যায় না! নীচু ছাদ, লম্বা ঘর। আফিংয়ের বাদামি ধোঁয়ায় চোখ চলে না। ম্যাড়মেড়ে আলোয় কোনোমতে দেখলাম সারি সারি লোক এলিয়ে রয়েছে নানা ভঙ্গিমায়। ঘোলাটে নিপ্রাণ চোখ। ছোটো ছোটো আগুনের টুকরো জ্বলছে দপ দপ করে–আফিং পুড়ছে। অর্থহীন বুকনি শোনা যাচ্ছে। এক কোণে জ্বলন্ত কাঠকয়লার সামনে একজন রোগা, লম্বা, বুড়ো মুঠিতে চিবুক আর হাঁটুতে হাত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে।

আমি আড্ডায় পা দিতেই একজন চাকর আফিংয়ের নল এনে ধরল আমার সামনে। আমি সরিয়ে নিলাম। খুঁজে বার করলাম কেটের নেশাখোর স্বামীকে। আমাকে দেখেই ভীষণ অবাক হয়ে বললে, আরে ওয়াটসন যে! কটা বাজে বল তো?

রাত এগারোটা!

সে কী! কী বার আজকে?

শুক্রবার।

বল কী! এর মধ্যে দু-দিন পেরিয়ে গেল! না, না, নিশ্চয় ভুল বলছ–এই তো ক-ঘণ্টা হল বসেছি, মাত্র ক-টা টাইপ খেয়েছি।

ওকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় হঠাৎ জামায় টান পড়ল।

ফিসফিস করে কে যেন বললে, এগিয়ে গিয়ে ফিরে তাকাও।

চমকে উঠলেও এক-পা এগিয়ে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। দেখি, সেই রোগা, শুকনো, পিঠ-বাঁকা বুড়োটা ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। দু-হাঁটুর মাঝে আফিংয়ের নল–যেন খসে পড়েছে শিথিল হাত থেকে। আড়াল করে দাঁড়াতেই চক্ষের নিমেষে ঘটল রূপান্তরটা। দেখলাম, বুড়ো আর নেই। সে জায়াগায় সিধে হয়ে বসে আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে প্রিয় বন্ধু শার্লক হোমস। চোখের ঘোলাটে ভাব, কপালের বলিরেখা, সারাদেহের বার্ধক্য নিমেষে তিরোহিত হয়েছে।

আর একটু হলে চেঁচিয়ে উঠতাম। ইশারায় এগিয়ে আসতে বলে আবার আগের অবস্থায় ফিরে গেল হোমস আবার নজদেহে বলিরেখাঙ্কিত মুখে, নিষ্প্রভ চোখে মিশে গেল সারি সারি নেশাখোরদের ভিড়ে।

খাটো গলায় বললাম, এখানে কী করতে এসেছ?

আরে আস্তে কথা বল। বন্ধুটাকে বিদেয় করো আগে–কথা আছে।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে এসেছি যে।

ও-গাড়িতেই বাড়ি পাঠিয়ে দাও। গাড়োয়ানকে বল তোমার ঘরণীকেও যেন খবর দেয়–আজ রাতটা আমার সঙ্গেই কাটাবে।

শার্লক হোমসের কথার অন্যথা কখনো করতে পারিনি এতই প্রবল ওর ব্যক্তিত্ব। তা ছাড়া বন্ধুবরের নতুন অ্যাডভেঞ্চার সম্বন্ধে কৌতূহলও পেয়ে বসল আমাকে। বাইরে এসে গাড়োয়ানকে বুঝিয়ে বললাম, কী করতে হবে, বউকে কী বলতে হবে। তারপর একটু দাঁড়ানোর পরেই দেখলাম নেশার আড্ডা থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসছে ছদ্মবেশী শার্লক হোমস।

পাশাপাশি হেঁটে দুটো রাস্তা পেরিয়ে আসার পর এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে পিঠের কুঁজ ঝেড়ে ফেলে সিধে হয়ে দাঁড়াল হোমস এবং অট্টহেসে বললে, ভাবছ বুঝি কোকেনের সঙ্গে এরপর আফিং ধরলাম?

ওখানে তোমাকে দেখে খুবই অবাক হয়েছি।

আমিও কম হইনি তোমাকে দেখে।

আমি তো এসেছি ওই বন্ধুটার সন্ধানে।

আর আমি এসেছি এক শত্রুর সন্ধানে।

শত্রু! কোন শত্রু?

যার সন্ধানে এসেছি, তাকে স্বমূর্তি নিয়ে খুঁজতে গেলে ঝামেলায় পড়তাম লস্করটা শাসিয়ে রেখেছিল। তাই এসেছিলাম ছদ্মমূর্তিতে। এই বাড়ির পেছনে পলের জেটির কোণে একটা চোরা দরজা দিয়ে রাতের অন্ধকারে কত লাশ যে পাচার হয়ে যায়, কেউ তার হিসেব রাখে না। টেমস নদীর ধারে এর চাইতে ভয়ংকর মানুষখুনের জায়গা আর নেই। নেভিল সিনক্লেয়ারের লাশও হয়তো ওইখান দিয়েই পাচার হয়েছে। যাক সে-কথা, গাড়িটা গেল কোথায়?

বলে,মুখে আঙুল পুরে শিস দিয়ে উঠল হোমস–অন্ধকারে ভেসে এল আর একটা শিসের আওয়াজ। একটু পরেই ঘড় ঘড় শব্দে একটা একঘোড়ার হালকা গাড়ি এসে দাঁড়াল সামনে।

ওয়াটসন, আসবে নাকি?

যদি কাজে লাগি, নিশ্চয় আসব।

বিশ্বাসী সহয়োগীর দরকার সবসময়েই, বিশেষ করে যদি সে জীবনীকার হয়। সিডার্সে আমি যে-ঘরে আছি, সেখানে খাট আছে দু-খানা–কাজেই তোমার অসুবিধে হবে না।

সিডার্সে কেন?

ওখানেই থাকেন মি. সেন্ট ক্লেয়ার। তদন্ত করছি ওখান থেকেই।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? আমি যে এখনও অন্ধকারে।

অন্ধকার এখুনি কাটবে, বন্ধু। নাও উঠে পড়ো। জন, তোমাকে আর দরকার নেই। এই নাও আধ ক্রাউন। কাল এগারোটায় এসো।

হোমস নিজেই চাবুক হাঁকিয়ে ঘোড়া ছোটাল এঁকাবেঁকা, অন্ধকার রাস্তা দিয়ে। তন্ময় হয়ে রইল আপন চিন্তায় একটা কথাও বলল না শহর ছাড়িয়ে না-আসা পর্যন্ত।

তারপর যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। মনে হল চিন্তার ফসল ফলছে–মনের ধাঁধা কেটেছে। তামাকের পাইপ ধরিয়ে বললে, ওয়াটসন, সত্যিই তুমি আদর্শ সহযোগী। কী চমৎকার চুপ করে ছিলে এতক্ষণ। ক্ষমতা আছে বটে। কিন্তু মুশকিল কী জানো, ভদ্রমহিলাকে কী বলে বোঝাই যে সর্বনাশ যা হবার তা হয়েই গেছে।

আমি কিন্তু এখনও আঁধারে।

বলছি, বলছি। সূত্র পেয়েছি অনেক, কিন্তু এমন জড়িয়ে রয়েছে যে খুলতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে।

বেশ তো, খুলেই বলো না।

১৮৮৪ সালের মে মাসে নেভিল সেন্ট ক্লেয়ার নামে এক অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক এসে লীতে বাড়ি ঘরদোর কিনে বেশ বড়োলোকের মতোই বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পরে ওই তল্লাটেরই একটি মেয়ে বিয়ে করেন এবং দুটি বাচ্চাও হয়। ভদ্রলোক ব্যাবসাসূত্রে রোজ সকালে লন্ডন যান। বিকেল পাঁচটা চোদ্দোর গাড়িতে ফিরে আসেন। বয়স ৩৭। সচ্চরিত্র। খাঁটি ভদ্রলোক—পাড়ায় সুনাম আছে। ব্যাঙ্কে টাকা আছে।

গত সোমবার ভদ্রলোক লন্ডন রওনা হওয়ার সময়ে বলে গেলেন ছেলের জন্যে একবাক্স চৌকো কাঠ নিয়ে ফিরবেন–খেলনার বাড়ি তৈরির জন্যে। বেরিয়ে যাওয়ার পরেই একটা টেলিগ্রাম এল একটা দামি পার্সেল এসেছে, জাহাজঘাটা থেকে ছাড়িয়ে আনতে হবে। মিসেস সিনক্লেয়ার নিজেই লন্ডনে গেলেন। পার্সেল ছাড়িয়ে জাহাজ কোম্পানির অফিস থেকে বেরোলেন চারটে পঁয়ত্রিশে। জায়গাটা মোটেই ভালো নয়। জাহাজঘাটা তো। তোমার সঙ্গে যেখানে আজ দেখা হল, তার কাছেই। তাই গাড়ির সন্ধানে এদিক-ওদিক তাকাতে গিয়ে হঠাৎ কানে ভেসে এল একটা চাপা ভয়ার্ত চিৎকার। চমকে উঠলেন ভদ্রমহিলা। চোখ তুলতেই দেখলেন একটা দোতলা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে তার স্বামী হাত নাড়ছেন–কী যেন বলতে চাইছেন। মুখ-চোখ ভয়ে উত্তেজনায় ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে। গায়ে কোট আছে, কিন্তু বাঁ-কলার নেই। আফিংয়ের আড্ডাটা এই বাড়ির তলাতেই–যেখানে আজ তুমি গেছিলে।

ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। একটু বুঝলেন যে স্বামী বিপদগ্রস্ত। তৎক্ষণাৎ দিশেহারা হয়ে ছুটলেন বাড়ির ভেতরে। কিন্তু দোতলায় ওঠা আর হল না। সিঁড়ি থেকেই বদমাশ লস্করটা তার একজন স্যাঙাতকে নিয়ে বার করে দিল তাকে বাড়ির বাইরে।

ছুটতে ছুটতে রাস্তা থেকে পুলিশ ডেকে এনে ফের বাড়িতে ঢুকলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। কিন্তু দোতলায় উঠে দেখা গেল সেখানে থাকে একজন কদাকার পঙ্গু। সিনক্লেয়ার বলে কেউ নাকি সেখানে আসেনি, একবাক্যে বললে লস্কর আর বীভৎস-দর্শন পঙ্গুটি।

এই সময়ে একটা আবিষ্কার করে বসলেন মিসেস সিনক্লেয়ার। চিৎকার করে দৌড়ে গেলেন টেবিলের দিকে। দেখা গেল সেখানে একবাক্স কাঠের চৌকো ব্লক পড়ে রয়েছে এই খেলনাটাকেই বাড়ি ফেরার সময়ে কিনে আনবেন বলেছিলেন মি. সিনক্লেয়ার।

এবার সন্দেহ হল পুলিশের। ঘরদোর খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ির পেছনেই টেমস নদী। একটা জানলা সেইদিকেই এবং জানলার গরাদে কাঁচা রক্তের দাগ। শোবার ঘরেও পাওয়া গেল মি. সিনক্লেয়ারের ঘড়ি, টুপি, মোজা, জুতো–কেবল তাকে বাদে। অথচ জামাকাপড়ে এমন কোনো চিহ্ন নেই যা দেখে বোঝা যায় দারুণ একটা ধস্তাধস্তি হয়ে গেছে।

লস্করটার পূর্ব ইতিহাস সুবিধের নয়। তার আচরণ সন্দেহজনক সিঁড়ির মুখে সে-ই পথ আটকেছিল মিসেস সিনক্লেয়ারের। বিকলাঙ্গ ভাড়াটে হিউ বুন সম্বন্ধে সে কোনো খবর রাখে না–মি. সিনক্লেয়ারের জামাকাপড় কীভাবে ওখানে গেল, তাও জানে না।

কদাকার বিকট ভাড়াটে লোকটা আসলে পেশাদার ভিখিরি। রাস্তার মোড়ে রোজ বসে টুপি পেতে। চকচকে কালো চোখ, একমাথা কমলা রঙের চুল, মুখে যেন কথার খই ফুটছে, মুখজোড়া একটা ভীষণ কাটার দাগ আছে–চামড়া গুটিয়ে যাওয়ার ফলে ওপরের ঠোঁটটা বেঁকে উঠে গেছে ওপরদিকে। পুলিশের চোখে ধূলো দেওয়ার জন্যে বেশ কিছু মোমের দেশলাই নিয়ে বসে থাকে রোজ একই জায়গায়। লক্ষ করেছি ওর ওই বীভৎস চেহারার অনুপাতে চটপটে চতুর কথাবার্তা আর কালো চোখের চাহনির জন্যে অন্য ভিখিরিদের চেয়ে ওর দিকেই নজর পড়ে বেশি। রোজগারও বেশি। মনে রেখো, এই

লোকই থাকে আফিং আড্ডার দোতলায় যেখানে শেষবারের মতো দেখা গেছে মিস্টার সিনক্লেয়ারকে।

কিন্তু বিকৃত যার অঙ্গ, তার দ্বারা এ কাজ কি সম্ভব?

সামান্য একটু খুঁড়িয়ে চলে–তা ছাড়া স্বাস্থ্য ভালোই। ডাক্তারি মতে কিন্তু যাদের একটা প্রত্যঙ্গ পড়ে যায়, অন্য প্রত্যঙ্গের জোরে তার অভাব পুষিয়ে নেয়।

তারপর?

হিউ বুনকে সঙ্গেসঙ্গে গ্রেপ্তার করা উচিত ছিল। গ্রেপ্তার যখন করা হল, তার আগেই বদমাশ ওই লস্করটার সঙ্গে তার শলাপরামর্শ হয়ে গেছে, বুনের জামার হাতায় রক্তের দাগ কেন–এ-প্রশ্নের উত্তরে সে বললে, আঙুল কেটে গেছে বলে। সেই রক্তই জানলার গরাদেও লেগেছে। মি. সিনক্লেয়ার নামধারী যাকে দেখেছেন বলে চেঁচাচ্ছেন মিসেস সিনক্লেয়ার–সে-রকম কেউ তার ঘরে আসেনি। ভদ্রমহিলার মতিভ্রম অথবা দৃষ্টিভ্রম–দুটোর একটা ঘটেছে।

পুলিশ ইনস্পেকটর বুদ্ধি করে বাড়িতে থেকে গেলেন জোয়ারের জল নেমে গেলে কাদায় কিছু পাওয়া যায় কি না দেখবার জন্যে। পেলেনও। একটা কোট। মি. সিনক্লেয়ারের। ডেডবডি কিন্তু পাওয়া গেল না। কোটের পকেটে কী ছিল আন্দাজ করতে পার?

না।

রাশি রাশি খুচরো পয়সা। কোট ভেসে যায়নি ওই কারণেই ভারী হয়ে গিয়েছিল। মড়াটা ভেসে গেছে।

কিন্তু কোট সমেত একটা মড়াকে ফেলে দেওয়া হল জলে–বাদবাকি জামা জুতো মোজা পাওয়া গেল ওপরের ঘরে–এটাই-বা কী ব্যাপার?

ধরো, মড়াটা আগে জানলা দিয়ে ফেলেছে বুন। তারপর ভিক্ষের পয়সা দিয়ে কোটটাকে ভারী করেছে–এমন সময়ে নীচে চেঁচামেচি শুনে তাড়াতাড়ি করে অন্য জামাকাপড় শোয়ার ঘরে লুকিয়ে রেখে কোটটাকে ফেলে দিয়েছে জানলা দিয়ে যাতে ভারী বলে কাদায় আটকে যায়।

তা হতে পারে।

বুন এখন হাজতে। কিন্তু কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না মরতে মি. সিনক্লেয়ার আফিংয়ের আড্ডায় গেলেন কেন। বুন লোকটাও শান্ত স্বভাবের ভিখিরি–আজ পর্যন্ত কোনো বেচাল দেখা যায়নি। সব মিলিয়ে এমন রহস্যের গোলকধাঁধা সৃষ্টি হয়েছে যে খেই পাচ্ছি না।

কথা বলতে বলতে গাড়ি পৌঁছে গেল সিডার্সে। নুড়িবিছানো পথ ধরে একটা বড়ো বাড়ির দিকে এগোল গাড়ি। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন স্বর্ণকেশী এক ভদ্রমহিলা। দুজন

পুরুষ মূর্তিকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে অস্ফুট হর্ষধ্বনি করে উঠেছিলেন। তারপরেই আমাকে দেখে আর হোমসের কালো মুখ লক্ষ করে মুখটা অন্ধকার হয়ে গেল।

কী খবর আনলেন? ভালো, না খারাপ?

দুটোর কোনোটাই নয়।

আমার সঙ্গে ভদ্রমহিলার পরিচয় করিয়ে দিলেন হোমস। বাড়ির ভেতর যাওয়ার পর খাবার ঘরে ঢুকলাম।

তারপরেই আচমকা জিজ্ঞেস করলেন মিসেস সিনক্লেয়ার, মি. শার্লক হোমস, আপনাকে দু-একটা কথা সোজা জিজ্ঞেস করব, সোজা উত্তর দেবেন। ঘোরপ্যাচের দরকার নেই। ধাক্কা সইবার মতো শক্ত ধাত আমার আছে–মূছা যাব না।

কী ব্যাপার বলুন তো?

আমার স্বামী বেঁচে আছে?

হকচকিয়ে গেল শার্লক হোমস। হেলান দিয়ে বসল ঝুড়ি-চেয়ারে। কার্পেটে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণচোখে তাকিয়ে ফের বললেন মিসেস সিনক্লেয়ার, খুলে বলুন!

খুলেই বলছি ম্যাডাম, আমি জানি না।

কী মনে হয় আপনার? মারা গেছে?

সেইরকম মনে হয়।

খুন হয়েছে?

অতটা বলব না। হতেও পারে।

কবে মারা গেছে বলে মনে হয়?

সোমবার।

মি. হোমস, এ-চিঠি তাহলে আজকে তার কাছ থেকে পেলাম কী করে বলতে পারেন?

ইলেকট্রিক শক খেলে মানুষ যেমন ছিটকে যায়, সেইভাবে তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল শার্লক হোমস, বলেন কী!

এক টুকরা কাগজ নাড়তে নাড়তে হাসিমুখে বললেন মিসেস সিনক্লেয়ার, হা, আজই পেয়েছি।

দেখতে পারি?

নিশ্চয়।

সাগ্রহে কাগজটা হাত থেকে ছিনিয়ে নিল হোমস। আমিও গিয়ে দাঁড়ালাম পাশে। ডাকঘরের ছাপ গ্রেভসএন্ডের তারিখ সেই দিনেরই।

হাতের লেখা তো দেখছি জঘন্য, যেমন মোটা, তেমনি ধ্যাবড়া, আপন মনেই বললে হোমস। এ নিশ্চয় আপনার স্বামীর নয়?

না, কিন্তু খামের মধ্যে যেটি এসেছে, সেটি আমার স্বামীই লিখেছে।

ঠিকানা লেখবার সময়ে একে-ওকে জিজ্ঞেস করতে হয়েছে দেখছি।

কেন বললেন?

নামটা লেখা হয়েছে বেশ ঘন কালো কালিতে–আপনা থেকেই শুকিয়ে গেছে। বাকি লেখাটা ধূসর রঙের–তার মানে ব্লটিং পেপার ব্যবহার করা হয়েছে। নামধাম একটানা লিখে গিয়ে ব্লটিংপেপার চেপে ধরলে নামের জায়গাটা কেবল এত নিকষ কালো হত না। অর্থাৎ নাম লেখার পর ঠিকানা জানবার জন্যে সবুর করতে হয়েছে। ব্যাপারটা সামান্য

কিন্তু সামান্য ব্যাপারের মধ্যেই বেশি গুরুত্ব থাকে। এবার চিঠি নিয়ে পড়া যাক। আরে! আরে! চিঠি ছাড়াও খামের মধ্যে আরও কিছু একটা পাঠানো হয়েছিল দেখছি।

আংটি—আমার স্বামীর।

চিঠির লেখা আপনার স্বামীর তো?

হ্যাঁ। খুব তাড়াতাড়ি লিখলে এইভাবে লেখে।

চিঠিখানা পড়ল হোমস, সুপ্রিয়া, ভয় পেয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিরাট একটা ভুল হয়েছে। শুধরোতে সময় লাগবে। ধৈর্য ধরো।—নেভিল। পেনসিল দিয়ে লেখা হয়েছে অক্টেভ সাইজের বইয়ের পুস্তনিতে—কাগজে জলছাপও দেখছি না। হুম! ডাকে ফেলেছে আজকে—যে ফেলেছে তার বুড়ো আঙুলটা রীতিমতো নোংরা। বাঃ! খামের মুখ যে সেঁটেছে, তার আবার তামাক চিবোনোর অভ্যেসও আছে। লেখাটা তাহলে আপনার স্বামীর?

নিশ্চয়।

চিঠি যখন আজকে ডাকে ফেলা হয়েছে, তখন অন্ধকারে আলো দেখা যাচ্ছে তবে পুরোপুরি বিপদমুক্ত হয়েছেন—এ-কথা বলা যায় না।

বেঁচে তো আছে।

সেটা বলাও মুশকিল। হাতের লেখা নকল হতে পারে। আঙুল থেকে আংটিও খুলে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু আমি বলব হাতের লেখা ওরই।

হয়তো চিঠি লিখেছিলেন আগে, ডাকে ফেলা হয়েছে আজকে। এর মাঝে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

আপনি বড়ো ভয় দেখান, মি. হোমস। এত বড়ো সর্বনাশ হলে আমি টের পেতাম না বলতে চান? জানেন, যাওয়ার দিন পাশের ঘরে হাত কেটে ফেলেছিল, খাবার ঘরে বসে ঠিক টের পেয়েছিলাম, মনে হল, নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে ওর। দৌড়ে গিয়ে দেখি সত্যিই আঙুল কেটে বসে আছে। মারা গেলে তো বুঝতে পারবই।

ঠিক কথা। অনেক সময়ে দেখা গেছে মেয়েদের মন যুক্তিকেও টেক্কা দেয়। কিন্তু বেঁচেই যদি আছেন তো চিঠি লিখতে গেলেন কেন? আসতে কী হয়েছে?

সেইখানেই তো ধোঁকা লাগছে।

আচ্ছা, দোতলার সেই বাড়িটায় আপনি ওঁকে খোলা জানলা দিয়ে দেখেছিলেন, তাই না?

হ্যাঁ।

জানলা খোলা থাকা সত্ত্বেও আপনাকে নাম ধরে না-ডেকে শুধু চেঁচিয়ে উঠলেন কেন? চেঁচানিটা কী ধরনের? বিপদে পড়ে সাহায্য চাওয়ার মতো কি?

হাত নাড়াটা সেই ধরনের।

এমনও তো হতে পারে আপনাকে দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়ে দু-হাত শুন্যে উঠিয়েছিলেন?

অসম্ভব কিছু নয়।

তারপরেই কেউ যেন পেছন থেকে হ্যাচকা টান মেরে সরিয়ে নিল?

যেভাবে দুম করে সরে গেল জানলা থেকে, মনে হল পেছনে কেউ ছিল–টেনে নিল। নিজেই লাফ মেরে পেছিয়ে গেছেন কি না জানছেন কী করে? ঘরে ঢুকেও তো আর কাউকে দেখেননি?

বিকট চেহারার সেই লোকটা ছিল–নিজে কবুল করেছে।

ওই অঞ্চলে বা ওখানকার আফিংয়ের আড্ডায় উনি আগে কখনো যেতেন?

না।

আর কথা হল না। খাওয়ার পর ঢুকলাম শোবার ঘরে। খাটের ওপর বালিশ আর কুশন সাজিয়ে তার ওপর আয়েশ করে বসল হোমস–সামনে রাখল অনেকখানি তামাক। বুঝলাম সারারাত তামাক খাবে আর ধ্যান করবে কূট-সমস্যা নিয়ে। চোখে ঘুম নামার সময়েও দেখলাম শিবনেত্র হয়ে ঠায় বসে–গল গল করে নীলচে ধোঁয়া উঠছে কড়িকাঠের দিকে।

ভোরবেলা চোখ মেলে দেখলাম, ঠিক এইভাবেই বসে আছে সে শুধু যা সামনের তামাকস্তূপ উধাও হয়েছে।

চলো ওয়াটসন, একটু বেরোনো যাক, প্রসন্ন কণ্ঠ হোমসের কাল রাতের সমস্যাপীড়িত মুখচ্ছবিও আর নেই।

তখন ভোর চারটে। বাড়ির কেউ ওঠেনি। সহিসকে গাড়ি প্রস্তুত করতে বলে এল হোমস। জামা-জুতো পরতে পরতে বললে, ওয়াটসন, ইউরোপের সবচেয়ে হাঁদারাম লোকটা এখন তোমার সামনে। সমস্যার সমাধান করে এনেছি বললেই চলে–চাবির সন্ধান পাওয়া গেছে।

চাবিটি এখন কোথায়?

কলতলায়। সেখান থেকে নিয়ে আমার ব্যাগে রেখেছি। দেখি এবার সমস্যার তালা খুলতে পারি কি না!

গাড়ি ছুটল লন্ডন অভিমুখে। যেতে যেতে হোমস শুধু বললে, কেসটা খুবই বিচিত্র। প্রথমটা খুবই ধাঁধায় ফেলেছিল।

থানায় পৌঁছে ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিটের ঘরে ঢুকল হোমস।

বলল, হিউ বুন এখন হাজতে তো?

হ্যাঁ। খুব শান্ত ধরনের আসামি–কিন্তু এত নোংরা যে কহতব্য নয়।

কেন বলুন তো?

আরে মশাই কিছুতেই মুখের তেলকালি ধোয়াতে পারলাম না। কোনোমতে কেবল হাতজোড়া বোয়ানো গেছে।

এখন একবার দেখা যাবে?

আসুন।

ব্যাগ হাতে ইনস্পেকটরের পেছন পেছন চলল হোমস এল হাজতখানায়। আমি আছি সঙ্গে। সরু করিডর–দু-পাশে সারি সারি বন্ধ দরজা। একটা দরজার ওপর থেকে তক্তা সরিয়ে ইনস্পেকটর বললে–ঘুমোচ্ছে এখনও।

আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমোচ্ছে ভিখিরি হিউ বুন। সে কী মুখ! দুনিয়ার কদর্যতা জড়ো হয়েছে বক্র ওষ্ঠ আর বিরাট ক্ষতচিহ্নটার মধ্যে। চোখ থেকে থুতনি পর্যন্ত কেটে গিয়েছিল–ক্ষতস্থান শুকিয়ে যেতে চামড়া টেনে ধরেছে। ওপরের ঠোঁট উলটে গেছে। তিনটে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন দাঁত খিচিয়ে রয়েছে। দারুণ জ্বলজ্বলে এক মাথা লালচে চুল কপাল আর চোখ ঢেকে রেখেছে। গায়ে রঙিন শার্ট আর ছেড়া কোট। ননাংরামি দিয়েও কুৎসিত মুখ ঢাকা যায়নি।

বিউটিফুল, তাই না? বলে ইনস্পেকটর।

সেইজন্যেই তো তৈরি হয়ে এসেছি–রূপটাকে ফুটিয়ে তোলা দরকার। বলে ব্যাগ খুলে একটা বিরাট স্পঞ্জ বার করল হোমস।

এ আবার কী? হেসে ফেলে ইনস্পেকটর।

আস্তে খুলুন দরজাটা–শব্দ না হয়।

প্রায় নিঃশব্দে চাবি ঘুরিয়ে দরজা খুলে দিল ইনস্পেকটর। ঘরের কোণে জলপাত্রে স্পঞ্জ ডুবোল হোমস এবং আচমকা গায়ের জোরে ঘষতে লাগল ঘুমন্ত বন্দির মুখখানা।

সেইসঙ্গে সে কী চিৎকার, আলাপ করিয়ে দিই আসুন, ইনিই নিখোঁজ মি. নেভিল সিনক্লেয়ার।

যেন ম্যাজিক দেখলাম চোখের সামনে। স্পঞ্জের জোরালো ঘর্ষণে দেখতে দেখতে যেন একটা খোসা উঠে গেল ভিখিরিটার মুখ থেকে ভোজবাজির মতো মিলিয়ে গেল তেলকালি আর দগদগে কাটার দাগটা। হ্যাচকা টানে অন্তর্হিত হল লাল টকটকে পরচুলা।

লজ্জায় অপোবদনে বিছানায় উঠে বসল খাঁটি ভদ্রলোকের চেহারা নিয়ে এক ব্যক্তি। পরমুহূর্তেই বুঝল–খেল খতম। আর্ত চিৎকার করে আছড়ে পড়ল বিছানায়।

ইনস্পেকটর হতবাক হয়ে গেছিল। এখন যেন সম্বিৎ ফিরে পেল, আরে সর্বনাশ! ইনিই তো নেভিল সিনক্লেয়ার ছবিতে এই চেহারাই তো দেখেছি।

বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মরিয়া সুরে নেভিল সিনক্লেয়ার বললেন, বেশ করেছি। আমার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে তো বলুন।

অভিযোগ? মুচকি হেসে ইনস্পেকটর বলল, সেটা তো প্রায় আত্মহত্যার অভিযোগ হয়ে দাঁড়ায় নিজেই নিজেকে গুমখুন করেছেন।

হোমস বললে, না তা নয়। অভিযোগটা স্ত্রীকে ঠকানোর। তাকে সব বলা উচিত ছিল।

কী করে বলি বলুন, যদি ছেলে-মেয়েরা জেনে ফেলে? মাথা কাটা যাবে যে।

এখন কি আর কিছু চাপা থাকবে। কেলেঙ্কারি যদি এড়াতে চান তো থানায় এজাহার দিয়ে যান ইনস্পেকটর মনে করলে আদালত পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়াতে দেবেন না। আপনিও ছাড়া পাবেন।

ককিয়ে উঠলেন সিনক্লেয়ার, বলল, বলব, সব বলব। এ-কথা ছেলে-মেয়েদের কানে উঠলে বাড়িতে আর মুখ দেখাতে পারব না। তার চাইতে ফাঁসিতে মরা ভালো।

শুনুন কী হয়েছিল ব্যাপারটা! এক সময়ে আমি খুব দেশ বেড়িয়েছি, অভিনয় করেছি, সাংবাদিকতাও করেছি। লেখাপড়াও করেছিলাম ভালোভাবে। একদিন ভিখিরিদের নিয়ে প্রবন্ধ লেখার ফরমাশ হল আমার ওপর। ভেবে দেখলাম, ভিখিরিদের নাড়িনক্ষত্র জানতে হলে ভিখিরি সাজাই ভালো। অভিনয় করতে জানতাম বলে ভিখিরির ছদ্মবেশটা ধরলাম ভালোই, ভিক্ষেও করলাম সারাদিন, খুচরো পয়সা গুনতে গিয়ে চোখ কপালে উঠল! মাত্র সাত ঘণ্টায় ছাব্বিশ শিলিং চার পেনি!

যাই হোক, অভিজ্ঞতাটা হঠাৎ একদিন কাজে লেগে গেল। দেনার দায়ে রাতের ঘুম উড়ে গেছিল। পঁচিশ পাউন্ড দেনা মিটিয়ে দিলাম দশ দিনের ভিক্ষের টাকায়।

এরপর থেকেই পুরোপুরি ভিক্ষাবৃত্তি শুরু করলাম। প্রথমটা একটু দোটানায় পড়েছিলাম। অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেছিল টাকার লোভ আর আত্মসম্মানে। শেষ পর্যন্ত সহজে টাকা রোজগারের লোভ আর ছাড়তে পারলাম না। সাংবাদিকতা করেও এত টাকা কখনো পাব না। রোজ বাড়ি থেকে বেরোতাম ভদ্রলোক সেজে, আফিংয়ের আড্ডার দোতলায় ভিখিরি সাজতাম, বিকেল হলে ওখান থেকেই ফের ভদ্রলোক সেজে বাড়ি ফিরতাম। লস্করটার মুখ বন্ধ রেখেছিলাম পয়সা খাইয়ে।

এইভাবেই একদিন বাড়ি কিনলাম, বিয়ে করলাম, বাবা হলাম। আমার রোজগার এখন বছরে সাতশো পাউন্ড। আমার চেহারা আর কথার জন্যেই এত রোজগার সম্ভব হয়েছে।

গত সোমবার ভিখিরির সাজপোশাক ছেড়ে ভদ্রলোক সাজছি, এমন সময়ে জানলা দিয়ে রাস্তায় স্ত্রীকে দেখলাম। এদিক-ওদিক কাকে খুঁজছে দেখে ভড়কে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠি। সঙ্গেসঙ্গে জানলা থেকে সরে এসে লস্করকে বলি স্ত্রীকে যেন ওপরে উঠতে না-দেয়। নীচে যখন চেঁচামেচি চলছে, আমি তখন নতুন করে ভিখিরি সাজছি–এ এমনই ছদ্মবেশ যে বউ পর্যন্ত ঠকে যাবে জানতাম। কিন্তু পাছে পুলিশের হাঙ্গামা হয়, তাই খুচরো পয়সা দিয়ে কৌটোটা ভারী করে ফেলে দিলাম নদীতে। অন্য জামাকাপড়গুলো ফেলবার আগেই এসে হাজির হল পুলিশ। গ্রেপ্তার হওয়ার আগেই লস্করটাকে একটা চিঠি লিখে দিই স্ত্রীর নামে সেইসঙ্গে খুলে দিয়েছিলাম হাতের আংটিটা যাতে উদবেগে না-থাকে।

চিঠি তো পেয়েছেন কালকে।

কালকে। সে কী! তাহলে এই সাতটা দিন তো ভীষণ উদবেগে কেটেছে বেচারির।

লস্করের পেছনে পুলিশ ঘুরছিল যে–চিঠিখানা তাই কাউকে দিয়ে কালকে পোস্ট করেছে, বললে ইনস্পেকটর। যাই হোক, ব্যাপারটা আমি ধামাচাপা দিতে পারি যদি এ-কাজ জন্মের মতো ছেড়ে দেন। হিউ বুন হওয়া আর চলবে না।

কথা দিচ্ছি।

মি. হোমস, এতবড়ো ধাঁধাটা সমাধান করলেন কী করে বলুন তো?

বালিশের পাহাড়ে বসে এক আউন্স তামাককে ধোঁয়া বানিয়ে, বলে হাসতে হাসতে আমাকে নিয়ে থানা থেকে বেরিয়ে এল শার্লক হোমস।

———–-

টীকা

১. বক্রোষ্ঠ ব্যক্তির রহস্য : দ্য ম্যান উইথ দ্য টুইস্টেড লিপ ১৮৯১-এর ডিসেম্বর মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। নিউইয়র্কের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে এই গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল দ্য স্ট্রেঞ্জ টেল অব আ বেগার নামে ১৮৯২-এর জানুয়ারি সংখ্যায়।

২. আফিমের রস : পপি-গাছের কঁচা বীজের থেকে নিষ্কাষিত আফিমের রস বা লডেনাম (Laudanum) ভিক্টোরীয় ইংলন্ডে বেদনানাশক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

৩. লন্ডন ব্রিজের : প্রথম লন্ডন ব্রিজ টেমস নদীর ওপর নির্মিত হয়, রোমান শাসকদের রাজত্বে ৪৩ খ্রিস্টাব্দে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতির পর এই ব্রিজের বহুবার মেরামত এবং পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। টেমসের ওপরে লন্ডনে প্রথম প্রস্তর নির্মিত সেতুটির নির্মাণ শেষ হয় ১২০৯ সালে। ওই ব্রিজের সামান্য উত্তরে অবস্থিত যে-সেতুর কথা বর্তমান কাহিনিতে বলা হয়েছে, সেটি তৈরি হয় ১৮৩১-এ।

৪. আফিং-এর নল : লম্বা নলের প্রান্তে আটকানো ধাতব বাটির মধ্যে আফিম রেখে নলের অপর প্রান্ত দিয়ে আফিং সেবন করা হয়। আফিং সংক্রান্ত নানাবিধ বিধিনিষেধ থাকলেও ইংরেজরা চিন এবং অন্যান্য দেশে নিয়মিত আফিং রপ্তানি করে এসেছে।

৫. একঘোড়ার হালকা গাড়ি : এই গাড়ি সম্ভবত ডগ-কার্ট। দু-চাকার এই গাড়িতে পিঠোপিঠি অবস্থায় দুজনের বসবার ব্যবস্থা। পিছনের আসনটি ভাঁজ করে কুকুর নিয়ে যাওয়ার কাজে ব্যবহৃত হত, তাই এই গাড়ির নাম ডগ-কার্ট হয়েছে।

৬. অক্টেভ সাইজের : ছাপা কাগজ আট ভাজ করে সেলাই করা বই। দু-ভাজের বইকে ফোলিয়ো সাইজ এবং চার ভজের বইকে কোয়ার্টো সাইজ বলা হয়।

৭. ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিট : এই গল্প ছাড়া দ্য ব্লু কার্বাঙ্কল এবং দ্য ইঞ্জিনিয়ার্স থাম্ব গল্পে ইনস্পেকটর ব্র্যাডস্ট্রিটকে দেখা গিয়েছে। তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইনস্পেকটরের পোস্টিঙের অঞ্চল বদলে যেতে দেখা যায়।

# বসকোম ভ্যালির প্রহেলিকা

[দ্য বসকোম ভ্যালি মিস্ট্রি]

শার্লক হোমসের টেলিগ্রামটা এল সকাল বেলা—আমি তখন স্ত্রীকে নিয়ে প্রাতরাশ খেতে বসেছি।

দিন দুয়েকের জন্য বসকোম ভ্যালি যাবে? এইমাত্র টেলিগ্রাম পেলাম। তলব পড়েছে। প্যাডিংটন থেকে সওয়া এগারোটায় গাড়ি আছে।

স্ত্রী-র উৎসাহে যাওয়াই মনস্থ করলাম। আফগানিস্তানে সামরিক জীবনে একটা জিনিস খুব ভালো রপ্ত করেছি। ঝট করে জিনিসপত্র গুছিয়ে রওনা হতে পারি। তাই যথাসময়ে স্টেশনে পৌঁছে দেখলাম প্ল্যাটফর্মে পদচারণা করছে শার্লক হোমস। আঁটসাঁট ধূসর পোশাকে দীর্ঘ কৃশ শরীরটা আরও তালঢ্যাঙা দেখাচ্ছে।

উঠে বসলাম ট্রেনে। কামরায় আমরা ছাড়া আর কেউ নেই। তন্ময় হয়ে একগাদা কাগজ পড়ে চলল হোমস, মাঝে মাঝে কী সব টুকে নিতে লাগল। তারপর দলা পাকিয়ে কাগজের তাড়া বাঙ্কের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, কেসটা সম্পর্কে কিছু শুনেছ?

কোনো কাগজই পড়িনি ক-দিন।

মনে হয় খুব সহজ, সেইজন্যেই খুব জটিল।

ধাঁধায় ফেললে দেখছি।

কিন্তু কথাটা খাঁটি। যে-কেস চোখে পড়ার মতো, জানবে জলের মতো সোজা। কিন্তু যা সাদাসিদে গোলমাল তাতেই বেশি। এ-কেসে অভিযোগ আনা হয়েছে যিনি মারা গেছেন, তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে।

খুনের মামলা?

সেইরকমই মনে করা হয়েছে। কিন্তু তলিয়ে না-দেখা পর্যন্ত আমি সেরকম কিছু মনে করার পাত্র নই। কেসটা শোনো।

বসকোম ভ্যালির সবচেয়ে বড়ো জায়গিরদার হলেন জন টার্নার। অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক টাকা রোজগার করে এনে জমিজমা কিনে চাষবাস করছেন। একটা গোলবাড়ি ভাড়া দিয়েছেন চার্লস ম্যাকার্থি নামে এক ভদ্রলোককে–ইনিও অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরেছেন। সেখানে আগে আলাপ ছিল–এখানেও তাই প্রতিবেশী হয়ে রয়ে গেলেন। টার্নারের টাকাপয়সা বেশি থাকলেও তা মেলামেশার অন্তরায় হল না। দুজনেরই বউ গত হয়েছেন। টার্নারের এক মেয়ে, ম্যাকার্থির এক ছেলে–দুজনেরই বয়স আঠারো। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কেউই খুব একটা মিশতেন না। টার্নারের বাড়িতে চাকরবাকর ছ-জন। ম্যাকার্থির দুজন।

গত সোমবার তেসরা জুন ম্যাকার্থি বিকেল তিনটে নাগাদ বসকোম হ্রদে যান–চাকরকে বলে যান কার সঙ্গে নাকি দেখা করার কথা আছে। আর ফেরেননি।

গোলাবাড়ি থেকে হ্রদ সিকি মাইল দূরে। দুজন দেখেছে ম্যাকার্থিকে যেতে। একজন বুড়ি–নাম জানা নেই। আর একজন বাগানের মালি। ম্যাকার্থির বেশ কিছু পেছনে তার ছেলে জেমসকেও যেতে দেখেছে সে হাতে বন্দুক ছিল। বাপকে যেন চোখে চোখে রেখে হাঁটছিল ছেলে।

মালির মেয়েও দেখেছে বাপবেটাকে হ্রদের ধারে। বনের মধ্যে ফুল তুলছিল মেয়েটা। সেখান থেকেই দেখতে পায় কথা কাটাকাটি হচ্ছে বাপবেটায় ছেলে এমনভাবে একবার হাত তুলল। যেন এই বুঝি মেরে বসবে বাপকে। ভয়ের চোটে মেয়েটা দৌড়ে এসে মাকে সবে ঘটনা বলতে শুরু করেছে, এমন সময়ে ছুটতে ছুটতে জেমস এসে বললে–বাবাকে এইমাত্র মরে পড়ে থাকতে দেখে এসেছে বনের ধারে। জেমসের তখন বিহ্বল অবস্থা, মাথায় টুপি নেই, বগলে বন্দুক নেই, হাতে আর আস্তিনে কঁচা রক্ত লেগে আছে। জেমসের সঙ্গে গিয়ে দেখা গেল, সত্যিই ম্যাকার্থির মৃতদেহ পড়ে রয়েছে হ্রদের ধারে খুব ভারী কিন্তু ভোতা ধরনের কোনো অস্ত্র দিয়ে বেশ কয়েকবার ঘা মেরে খুলি ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেন ছেলের বন্দুকের কুঁদোর মার। বন্দুকটাও পাওয়া গেল একটু তফাতে ঘাসের ওপর। ছেলেকে গ্রেপ্তার করে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সব শুনে আমি বললাম, এ অবস্থায় জেমসকেই দোষী বলতে হয়।

সেভাবে দেখতে গেলে হয়তো অবিচারই করা হবে। জেমস দোষী হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। শুধু পরিস্থিতি দেখলে হবে না, অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে। টার্নারের মেয়ে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের লেসট্রেডকে দিয়ে তদন্ত করাচ্ছে। তারই নির্বন্ধে আমার এখন ছুটতে হচ্ছে। ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে।

কিন্তু হালে পানি পেলে হয়–শেষ পর্যন্ত তোমাকে সুনাম খোয়াতে হবে মনে হচ্ছে। কেস ততা জলের মতো পরিষ্কার।

হাসল হোমস। বলল, পরিষ্কার ব্যাপারেই অনেক কিছু চোখের বাইরে থেকে যায়। লেসট্রেড যা দেখেনি, আমার চোখে তা পড়তে পারে। যেমন ধর না কেন তোমার শোবার ঘরের জানলাটা যে ডান দিকে, এ জিনিস হয়তো লেসট্রেডের চোখ এড়িয়ে যাবে কিন্তু আমার চোখ এড়ায়নি।

সত্যিই অবাক হলাম, কিন্তু তুমি জানলে কী করে?

তোমার নাড়িনক্ষত্র জানি যে আমি। মিলিটারিতে থাকার ফলে পরিষ্কার থাকা তোমার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গেছে। রোজ দাড়ি কামাও। এইসব মাসে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে কামাও। কিন্তু দেখছি তোমার দাড়ি তেমন কামানো হয়নি। তার মানে কি এই নয় যে, যে-জানলায় দাঁড়াও সেখানে রোদ থাকে না সকালে? খুঁটিয়ে দেখলে এমনি অনেক কিছু আবিষ্কার করা যায়, এই কেসেও সে-সুযোগ আছে বলে আমার বিশ্বাস।

কীরকম?

ছেলেটাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে গোলাবাড়ি ফিরে আসার পর অকুস্থলে নয়। তখন সে বলেছিল, সে নাকি জানত তাকে গ্রেপ্তার হতে হবে।

তার মানেই খুনের অপরাধ স্বীকার করে নেওয়া হল।

কিন্তু তারপরেই বলেছে খুন সে করেনি।

কিন্তু তাতে সন্দেহ যায় না বরং বাড়ে।

মোটেই না–সন্দেহ একেবারে চলে যায়। গ্রেপ্তারের সময়ে মেজাজ দেখালেই বরং সন্দেহ হত–পাগলকে পাগল বললেই রেগে যায়। কিন্তু বাপের সঙ্গে কথা কাটাকাটির পরেই বাপ খুন হয়েছে–সুতরাং যে কেউ বলবে খুনি সে-ই–এই সোজা কথাটা সোজা ভাবে যে বলতে পারে, বুঝতে হবে তার মনে পাপ নেই।

কিন্তু ফাঁসি কি আটকানো যায়? এর চেয়ে কম সন্দেহের জোরে অনেকে ফাঁসিকাঠে উঠেছে।

অন্যায় সন্দেহেও অনেকে ফাঁসিতে ঝুলেছে। ছেলেটি কী বলে? এই কাগজটা পড়লেই বুঝবে,বলে কাগজের তাড়ার একটা জায়গা আমাকে দেখিয়ে দিল হোমস।

জেমস ম্যাকার্থি গ্রেপ্তার হওয়ার পর বিবৃতি দিয়েছিল। এটা সেই জবানবন্দি। সে বলেছে :

তিন দিন পরে বাড়ি ফিরে দেখলাম বাবা বাড়ি নেই। একটু পরে গাড়ির আওয়াজ শুনে দেখলাম, বাবা ফিরেছে। কিন্তু গাড়ি থেকে নেমেই হনহন করে ফের বেরিয়ে গেল। কোন দিকে গেল বুঝতে পারলাম না। বন্দুক নিয়ে আমি বেরোলাম হ্রদের পাড়ে গিয়ে খরগোশ শিকার করব বলে। রাস্তায় মালির সঙ্গে দেখা হল। আমি বাবার পেছনে পেছনে চলেছিলাম, সে বলেছে। কথাটা ঠিক নয়। আমি জানতামই না বাবা আমার সামনে আছে। হ্রদের কাছাকাছি গিয়ে একটা কু ডাক শুনলাম। এভাবে বাবা আমাকে ডাকে–আমিও বাবাকে ডাকি। তাই হনহন করে এগিয়ে গিয়ে দেখি লেকের ধারে বাবা দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে অবাক হল, রেগে গেল, মারতে এল। বাবার মেজাজ খুব উগ্র। আমি তাই কথা না-বাড়িয়ে চলে এলাম। কিন্তু কিছুদূর আসতে-না-আসতেই বিকট চিৎকার শুনলাম পেছনে। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম সাংঘাতিক জখম হয়েছে বাবা–মাথা ছাতু হয়ে গেছে বললেই চলে! বন্দুকটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম, বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম, প্রায় সঙ্গেসঙ্গে মারা গেল বাবা। কাছেই বাড়িটা মি. টার্নারের মিনিট কয়েক বসে থাকার পর গেলাম সেখানে। সব বললাম। বাবার শত্রু নেই, এটুকু আমি জানি। বন্ধুও তেমন নেই।

করোনার তখন জিজ্ঞেস করে, প্রাণটা বেরিয়ে যাওয়ার আগে বাবা কিছু বলেছিলেন?

ইদুর সম্বন্ধে কী যেন বলছিল।

মানে কি বুঝলে?

ভুল বকছিল।

বাবার সঙ্গে ঝগড়াটা হল কী নিয়ে?

বলব না।

বলতেই হবে।

তার সঙ্গে এ ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই।

সেটা কোর্ট বুঝবে। জবাব না-দিলে তোমার ক্ষতি হবে।

হোক।

কু ডাক দিয়ে বাবা তোমাকে ডাকত, তুমিও বাবাকে ডাকতে?

হ্যাঁ! কিন্তু বাবা তো জানতেন না তুমি বাড়ি ফিরেছ? ডাকলেন কেন?

ঘাবড়ে গেল জেমস। বললে, বলতে পারব না।

বিকট চিৎকার শুনে ফিরে এসে সন্দেহজনক কিছু দেখেছিলে?

সে-রকম কিছু দেখিনি।

তাহলে কী দেখেছিলে?

আমি তখন পাগলের মতো বাবার দিকে দৌড়োচ্ছি–কোনোদিকে খেয়াল নেই। সেই সময়ে মনে হল যেন বাঁ-দিকে ধূসর রঙের কী-একটা পড়ে আছে অনেকটা আলখাল্লার মতো। বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে জিনিসটা আর দেখিনি।

মি. টার্নারের বাড়ি যাওয়ার আগেই দেখলে জিনিসটা নেই।

হ্যাঁ।

ঠিক কী বলে মনে হয় জিনিসটা?

কাপড়ের মতো কিছু।

ডেডবডি থেকে কত তফাতে?

প্রায় বারো গজ তফাতে।

বন সেখানে কদ্দূর?

ওইরকমই। তাহলে বলতে চাও তুমি থাকতে থাকতেই জিনিসটা উধাও হয়ে গেল?

আমি কিন্তু সেদিকে পেছন করে বসে ছিলাম।

জেরা এইখানেই শেষ।

পড়া শেষ করে বললাম, করোনার ঠিক ঠিক পয়েন্টেই চেপে ধরেছে। এক, বাবা তাকে দেখেনি, অর্থচ ডাকল কেন? দুই, ঝগড়ার বৃত্তান্ত চেপে যাওয়া। তিন, মরবার সময়ে ইঁদুর সম্বন্ধে কথা বলেছিলেন ম্যাকার্থি–মানেটা ছেলে বোঝেনি।

হোমস হাসিমুখে বললে, যে-অসংগতিগুলো দেখে তুমি আর করোনার খড়্গহস্ত হয়েছ ছেলেটির ওপর সেগুলোই কি ওর সত্যি কথা বলার প্রমাণ? পুরো ব্যাপারটা বানিয়ে বলার মতো কল্পনাশক্তিই যদি ওর থাকত, তাহলে ওই তিনটে অসংগতি চাপাচুপি দিয়ে চমৎকার তিনটে গল্প শুনিয়ে দিতে পারত। মিথ্যে যে বলে, সে কি গল্পের মধ্যে সন্দেহের

বীজ রেখে উদ্ভট অসংগতি শোনাতে চায়? না হে, ছেলেটা সত্যিই বলেছে। এখন আর এ নিয়ে কোনো কথা নয়। এই বইটা পড়তে বসলাম, বিশ মিনিটে সুইনডনে পৌঁছে লাঞ্চ খাব।

রস শহরে যথাসময়ে পৌঁছোলাম। বেজির মতো ক্ষিপ্র, ইনস্পেকটর লেসট্রেড° দাঁড়িয়েছিল প্ল্যাটফর্মে। চোখে সেয়ানা চাহনি! আগে নিয়ে গেল সরাইখানায়। ঘর ঠিক করাই ছিল। চা খেতে খেতে বললে, এখুনি গাড়ি আসছে। সোজা অকুস্থলে চলুন।

আজ রাতে গাড়ির দরকার হবে বলে মনে হয় না।

তাই বলুন। কাগজ পড়েই তাহলে সমাধানে পৌঁছে গেছেন? খুবই সোজা কেস। কিন্তু মেয়েটা নাছোড়বান্দা। আপনার সঙ্গে কথা না-বলা পর্যন্ত রেহাই দিচ্ছে না। এই যে এসে গেছে।

একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল সরাইখানায়। হুড়মুড় করে ঢুকল একজন পরমাসুন্দরী তরুণী। উদবেগ উৎকণ্ঠায় সামলাতে পারছে না নিজেকে।

মি. শার্লক হোমস? পর্যায়ক্রমে আমাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে হোমসকে ঠিক চিনে নিল মেয়েটা, খুব আনন্দ হচ্ছে আপনাকে দেখে। জেমস নির্দোষ। এইটুকু বয়স থেকে ওকে চিনি। মাছি পর্যন্ত যে মারতে পারে না, সে করবে খুন? মি. হোমস, শুধু এই বিশ্বাস নিয়েই আপনি তদন্ত শুরু করুন।

নিশ্চয় করব, জেমস যে নির্দোষ তাও প্রমাণ করব।

ওর জবানবন্দি পড়ে কি আপনার মনে হয়নি ও নির্দোষ?

সেইরকমই মনে হয়েছে।

কী! বলেছিলাম না? লেসট্রেডের দিকে ফিরে তাচ্ছিল্যের সুরে বললে মেয়েটা।

লেসট্রেড কঁধ ঝাঁকিয়ে বললে, মি. হোমস একটু তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাচ্ছেন।

কিন্তু হক কথা বলেছেন। জেমস নির্দোষ। বাবার সঙ্গে ঝগড়ার কারণটা কেন বলেনি জানেন? ওর মধ্যে আমিও আছি বলে।

কীরকম? শুধোয় হোমস।

জেমসের বাবা চান আমার সঙ্গে জেমসের বিয়ে হোক। কিন্তু আমরা ছেলেবেলা থেকে ভাইবোনের মতো পরস্পরকে ভালোবেসে এসেছি। বাপবেটায় প্রায়ই ঝগড়া হত এই নিয়ে।

তোমার বাবা কী বলত?

তার মত নেই। জেমসের বাবা ছাড়া কারোরই মত নেই, বলতে বলতে সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে গেল মিস টার্নারের।

কালকে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছি।

ডাক্তার রাজি হবেন বলে মনে হয় না।

কেন?

গত কয়েক বছর ধরেই শরীর খুব খারাপ। তারপর এই ধাক্কায় একেবারে বিছানা নিয়েছেন। হাল ছেড়ে দিয়েছেন ডাক্তার। ভিক্টোরিয়ায় থাকার সময় থেকেই তো বন্ধুত্ব মিস্টার ম্যাকার্থির সঙ্গে।

ভিক্টোরিয়ায়? খবরটা কাজে লাগবে।

খনির কাজে ছিলেন। সোনার খনি, তাই না? টাকা রোজগার করেছেন সেইখানেই?

হ্যাঁ।

ধন্যবাদ। এ-খবরটাও কাজে লাগবে।

জেমসের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করতে যাবেন জেলখানায়? ওকে বলবেন আমি জানি ও নির্দোষ।

বলব, নিশ্চয় বলব!

আর বসব না, চলি। বাবার অবস্থা ভালো নয়। বলতে বলতে বেগে বেরিয়ে গেল মিস টার্নার। একটু পরেই শুনলাম চাকার আওয়াজ মিলিয়ে যাচ্ছে দূরে।

গম্ভীর গলায় লেসট্রেড বললে, কাজটা ভালো করলেন না মি. হোমস। মিথ্যে আশা দিলেন মেয়েটাকে!

লেসট্রেড, জেমসকে খালাস করতে পারব এ-বিশ্বাস আমার আছে। জেলখানায় গিয়ে দেখা করার অনুমতি পাব কি আমি?

শুধু আপনি আর আমি পাব।

তাহলে চল বেরিয়ে পড়া যাক। ট্রেন পাওয়া যাবে?

পাবেন। ওয়াটসন, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরছি আমি।

এই দুটো ঘণ্টা যেন আর কাটতে চাইল না আমার। ওদেরকে ট্রেনে তুলে দিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে সরাইখানায় ফিরলাম। চটকদার উপন্যাস পড়বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মন চলে আসতে লাগল খুনের রহস্যে। বিরক্ত হয়ে বই ফেলে ভাবতে বসলাম। হোমসের খাতিরেই যদি ধরি ছেলেটা সত্যি বলছে, তাহলে সে বাবার কাছ থেকে চলে আসার সময় থেকে আরম্ভ করে বাবার চিৎকার শুনে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভয়ানক কিছু একটা ঘটেছিল। আবার, বাবার কাছে পিছন ফিরে বসে থাকার সময়েও কেউ সেখানে এসে পেছন থেকে ধূসর জিনিসটা সরিয়ে নিয়ে গেছে। ভারি আশ্চর্য ব্যাপার তো! জিনিসটা কী? খুনির পোশাক? আমি নিজে ডাক্তার। কাজেই আঘাতের ধরনটা অনুধাবন করতে গিয়ে দেখলাম, চোট লেগেছে খুলির পেছনকার বাঁ-দিকের হাড়ে–গুড়িয়ে গেছে গুরুভার অস্ত্রের আঘাতে। অথচ ছেলেটিকে দেখা গেছে বাপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতে। অবশ্য এ-যুক্তির কোনো মানে নেই। বাপ পেছন ফিরতেই হয়তো হাতিয়ার চালিয়েছিল জেমস। কিন্তু মরবার ঠিক আগে ইঁদুর নিয়ে বিড়বিড় করতে গেলেন কেন মি. ম্যাকার্থি? এ সময়ে আচমকা আঘাতে কেউ তো আবোল-তাবোল বকে না? কী বলতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক?

হোমস একা ফিরল অনেক দেরিতে–লেসট্রেড শহরে থেকে গেছে।

আসন গ্রহণ করে বললে, অকুস্থলে পৌঁছোনোর আগে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেলে মুশকিলে পড়ব।–জেমসের সঙ্গে দেখা হল জেলখানায়।

কী মনে হল? অন্ধকারে আলো দেখাতে পারল জেমস?

একেবারেই না। প্রথমে মনে হয়েছিল খুনিকে আড়াল করার চেষ্টা করছে। পরে দেখলাম নিজেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছে। খুব চৌকস নয় ছেলেটা, কিন্তু সুদর্শন। মনটা পরিষ্কার।

মিস টার্নারের মতো মেয়েকে বিয়ে করতে যে চায় না, তার পছন্দরও খুব একটা তারিফ করা যায় না।

ওহে ওর মধ্যেও একটা হৃদয়বিদারক ঘটনা রয়েছে। ছোকরা বোর্ডিং স্কুলে থাকার সময়ে ব্রিস্টলের একটা হোটেলের মেয়ের পাল্লায় পড়ে। তাকে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে পর্যন্ত করে। বোকা আর বলে কাকে। কাউকে কথাটা বলাও যাচ্ছে না। এদিকে বদমেজাজি বাবার কাছে ধমক খেতে হচ্ছে মিস টার্নারকে বিয়ে করতে চাইছে না বলে। হাত-পা ছুঁড়ে লেকের পাড়ে প্রতিবাদ জানিয়েও লাভ হয়নি। সত্যি কথাটা বললেই তো বাড়ি থেকে বার করে দেবে বাবা–গুমরে গুমরে তাই মরছে। তিন দিন ব্রিস্টলে স্ত্রীর সঙ্গে কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পরেই খুন হয়ে গেল বাবা। কাগজে খবরটা পড়ল হোটেলের মেয়ে। জেমসের ফাসি হবেই বুঝতে পেরে নিজে থেকেই কেটে পড়ল। চিঠি লিখে জানিয়েছে, ওর আগের স্বামী বর্তমান কাজেই জেমসের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।

বেশ তো, জেমস যদি খুন না-করেই থাকে, তাহলে করলটা কে?

দুটো ব্যাপার নিয়ে তোমাকে ভাবতে বলব। এক নম্বর হল, জেমসের বাবা জানতেন না ছেলে বাড়ি ফিরেছে–তা সত্ত্বেও তিনি কু করে ডেকেছিলেন। দু-নম্বর হল, লেকের পাড়ে যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন সে আর যেই হোক তার ছেলে নয় কারণ উনি জানতেন ছেলে এ-তল্লাটেই নেই। আজ আর এ-নিয়ে কোনো কথা নয়।

সকাল বেলা গাড়ি নিয়ে এল লেসট্রেড। আকাশ নির্মেঘ। রাতেও বৃষ্টি হয়নি। গোলাবাড়ি আর হ্রদের দিকে রওনা হলাম আমরা।

যেতে যেতে লেসট্রেড বললে, মি. টার্নার আর বাঁচেন কি না সন্দেহ।

বয়স অনেক হয়েছে বুঝি? হোমস বললে।

ষাট বছর তো বটেই। শরীরের ওপর অনেক অত্যাচার করেছেন বিদেশে থাকার সময়ে। এমনিতেই কাহিল ছিলেন, বন্ধু ম্যাকার্থির মৃত্যুতে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। বন্ধুর জন্যে কম করেননি–গোলাবাড়ির ভাড়া পর্যন্ত নেন।

বটে। খবরটা শুভ।

বিনা ভাড়ায় শুধু থাকতেই দেননি, আরও অনেক উপকার করেছেন ম্যাকার্থির–পাঁচজনে বলেছে।

তাই নাকি! একটা ব্যাপারে কি তোমার খটকা লাগেনি লেসট্রেড?

কী বলুন তো?

এত উপকার করা সত্ত্বেও মেয়ের সঙ্গে মি. ম্যাকার্থির ছেলের বিয়ে দিতে মি. টার্নার রাজি নন। অথচ মি. ম্যাকার্থি বিয়ের কথা সমানে বলে যাচ্ছেন–যেন খুবই স্বাভাবিক প্রস্তাব। মেয়েটি কিন্তু মি. টার্নারের সব সম্পত্তি পাবে। কী? আঁচ করতে পারলে?

ঘটনার ঠেলায় অস্থির হয়ে পড়েছি, আঁচ করার হেপাজত আর পোয়াতে পারব না।

তা ঠিক। ঘটনার ঠেলায় তুমি হিমশিম খাচ্ছ, গম্ভীর গলা হোমসের।

চটে গেল লেসট্রেড। আপনি কিন্তু এখনও মরীচিকা দেখছেন। যা ভাবছেন, তা নয়।

কুয়াশার চাইতে তো ভালো! হেসে বললে হোমস। এই যে, এসে গেছে গোলাবাড়ি।

বেশ বড়ো গোলাবাড়ি। দোতলা। সদ্য শোকের ছাপ সর্বত্র। দরজায় ধাক্কা দিতেই ঝি বেরিয়ে এল। হোমস তার কাছে দু-জোড়া জুতো চাইল। মারা যাওয়ার সময়ে মি. ম্যাকার্থি যে বুট পরে ছিলেন, সেইটা। আর তার ছেলের একজোড়া বুট।

জুতো এল। ফিতে বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাত আট রকম মাপ নিল হোমস। তারপর রওনা হলাম লেকের দিকে।

এবং পালটে গেল ওর চোখ-মুখের চেহারা। বরাবর দেখেছি এই ধরনের সন্ধানী অভিযানে নামলেই ও যেন শিকারি কুকুরের মতো আত্মনিমগ্ন আর হন্যে হয়ে উঠে। তখন কারো কথা কানে ঢোকে না–বেশি কথা বলতে গেলে খেঁকিয়ে ওঠে। ভুরু কুঁচকে ইস্পাত-কঠিন চোখে মাটির দিকে তাকিয়ে, দু-কাঁধ বাঁকিয়ে, নাকের পাটা ফুলিয়ে হনহন করে হেঁটে যায় হেঁট মাথায়। এইভাবেই মাঠে নামল, গেল লেকের ধারের জঙ্গলে। জলা জায়গায় অসংখ্য পদচিহ্ন। হোমসের নজর সব দিকেই। কখনো জোরে যাচ্ছে, কখনো আস্তে। মাঠটাকেও চক্কর দিয়ে এল একবার। রকম-সকম দেখে অবজ্ঞার হাসি হাসছে লেসট্রেড। আমার কৌতূহল কিন্তু বেড়েই চলেছে। শার্লক হোমসকে আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। অকারণে সে কিছু করে না।

বসকোম লেকটাকে একটা বড়োসড়ো দিঘি বললেই চলে। একদিকে জায়গিরদার মি. টার্নারের বাড়ি আর একদিকে মি. ম্যাকার্থির গোলাবাড়ি। লেক ঘিরে আগাছা, ঘাস, জঙ্গল আর জলাজমি। এইখানে একটা ঘাস জমির ওপর পাওয়া গেছে মৃতদেহ। বেশ ভিজে জায়গা। হোমস শিকারী কুকুরের মতো আবার দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করেছে। অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছে। ঘাসজমির উপর পায়ের দাগ বিস্তর।

হঠাৎ ফিরল লেসট্রেডের দিকে, এখানে কী করতে এসেছিলে?

দেখছিলাম হাতিয়ারটা যদি পাওয়া যায়।

খুব কাজ করেছ! পায়ের ছাপগুলোর বারোটা বাজিয়ে বসে আছ। নিজের পায়ের ছাপেই সব জায়গা ভরিয়ে তুলেছ! উফ! এর চাইতে একপাল মোষ এলেও বুঝি এ-রকম হত না! চিনতে পারছ এই জুতোর দাগটা? তোমার জুতো! আর এই যে বনরক্ষক মশায় দলবল নিয়ে কর্তব্য করে গেছেন–এখানে–ডেডবডির চারধারে ছয় থেকে আট ফুট পর্যন্ত জায়গায় যত পায়ের ছাপ ছিল, মাড়িয়ে দফারফা করে গেছেন। আ! এই যে একজোড়া পায়ের ছাপ পাওয়া গেছে। একদম আলাদা দাগ দেখছি, বলতে বলতে ভিজে মাটিতে বর্ষাতি বিছিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল হোমস। আতশকাচ বার করে মাটির ওপরকার বুট চিহ্ন দেখতে দেখতে যেন স্বগতোক্তি করে বলল, এই হল গিয়ে ছেলেটার জুতোর দাগ। দু-বার যাতায়াত করেছে–তারপরে টেনে দৌড়েছে দৌড়েছে বলেই গোড়ালির ছাপ প্রায় ওঠেনি চেটোর ওপরেই ভর পড়েছে বেশি। তার মানে, ছোকরা খাঁটি কথাই বলেছে। বাপের চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছিল। আর এইখানে পায়চারি করছিলেন মি. ম্যাকার্থি। পাশেই বন্দুকের কুঁদোর দাগ–বাপ বেটায় কথা হচ্ছিল এখানে। আরে! আরে! ওইটা আবার কী! বুটের মালিক একবার এল–আবার গেল–আবার এসেছে দেখছি... ও হ্যাঁ, আলখাল্লাটা কুড়িয়ে নিতে এসেছিল। কিন্তু এল কোত্থেকে? দেখা যাক।

চেনা গন্ধ পেয়ে ব্লাড হাউন্ড যেভাবে নাক নামিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োয়, হোমসও এবার সেইভাবে মাটি দেখতে দেখতে দৌড়োতে লাগল। পেছনে ছুটলাম আমরা। এসে পৌঁছোলাম বনের ধারে। আরও কিছুদূর গেল হোমস। ফের সটান উপুড় হয়ে শুয়ে মাটি পরীক্ষা করল আতশকাচ দিয়ে। শুকনো পাতা-টাতা সরিয়ে ধুলোর মতো খানিকটা বস্তু

নিয়ে খামের মধ্যে ভরল। খুশিতে চোখ-মুখ বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আশপাশ আবার দেখল আতশকাচের মধ্যে দিয়ে। এবড়োখেবড়ো একটা পাথর নিয়েও তন্ময় হয়ে রইল অনেকক্ষণ। শ্যাওলার মধ্যে পড়ে ছিল পাথরটা। গেল বড়োরাস্তা পর্যন্ত।

ফিরে এসে সহজ গলায় বললে, ইন্টারেস্টিং মামলা। ডান হাতি বাড়িটা নিশ্চয় মি. টার্নারের। তোমরা এগোও–আমি আসছি মি. টার্নারের বাড়ির সরকারের সঙ্গে দেখা করে। একটা চিঠি লিখে আসতে হবে।

মিনিট দশেক পরে হোমস এল। গাড়ি ছুটল শহরের দিকে।

হোমসের হাতে শ্যাওলায়-পড়ে-থাকা সেই পাথরটা দেখলাম। লেসট্রেডের হাতে তুলে দিয়ে বললে, এই নাও হত্যার হাতিয়ার।

কী করে বুঝব যে এটা দিয়েই খুন করা হয়েছিল? গায়ে তো কোনো দাগ দেখছি না।

না, দাগ নেই। কিন্তু এটা যেখানে পড়ে ছিল, তার তলায় ঘাস ছিল। কোত্থেকে তুলে এনে ফেলা হয়েছে, তাও দেখতে পাইনি। যে ধরনের চোট দেখা গেছে খুলিতে, এই পাথর দিয়েই

তা সম্ভব।

খুনটা করেছে কে?

সে মাথায় বেশ ঢ্যাঙা, ল্যাটা, ডান পা টেনে চলে, পুরু সোলের শিকারের বুট পরে, গায়ে ধূসর আলখাল্লা আছে, নলে ভারতীয় চুরুট লাগিয়ে খায়, পকেটে ভোতা পেনসিলকাটা ছুরি রাখে। এতেই হবে তোমার।

হেসে ফেলল লেসট্রেড, আদালতে গ্রাহ্য হবে না যা বললেন। কল্পনা দিয়ে কারবার করলে চলে না আমাদের।

আস্তে আস্তে হোমস বললে, তাহলে তুমি তোমার পদ্ধতিতে কাজ চালাও–আমি চালাই আমার পদ্ধতিতে। সন্ধের ট্রেনে লন্ডন ফিরব ভাবছি।

সে কী! তদন্ত শেষ না-করেই যাবেন?

আরে না, শেষ করেই যাব।

সমস্যার সমাধান?

সে তো হয়ে গেছে।

খুনি কে?

যার বর্ণনা দিলাম।

তার নাম?

খুঁজলেই পেয়ে যাবে–খুব একটা লোকজন এ-তল্লাটে নেই।

দুর মশায়! খোঁড়া ল্যাটার সন্ধানে টো টো করলে হেসে কুটিপাটি হবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড!

হোমস শুধু বলল, সূত্র দিয়ে দিলাম আমার কর্তব্যও শেষ হল। এসে গেছে তোমার আস্তানা।

নেমে গেল লেসট্রেড। আমরা ফিরলাম সরাইখানায়। খেতে বসে বিশেষ কথা বলল না হোমস। মুখ দেখে বুঝলাম, দোটানায় পড়েছে।

খাওয়া শেষ হল। চুরুট ধরিয়ে হোমস বললে, ওয়াটসন, এ মামলায় দুটো অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার শুনে নিশ্চয় তোমার খটকা লেগেছে। এক হল, কু ডাক। দুই, মরবার সময়ে হঁদুর শব্দটা বলা। কু ডাকটা অস্ট্রেলিয়ায় চালু আছে। সেখানে একজন আর একজনকে এইভাবে ডাকে। মি. ম্যাকার্থি যাকে ডেকেছিল, সে-ও তাহলে অস্ট্রেলিয়ায় থাকত। সেখানেই দুজনের পরিচয়। দেখাও করতে গিয়েছিলেন তার সঙ্গে ছেলেকে ডাকেননি।

ইঁদুর-ইঁদুর করে মারা গেলেন কেন?

পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে টেবিলে বিছিয়ে ধরল হোমস।

বলল, এই হল ভিক্টোরিয়া কলোনির ম্যাপ। ব্রিস্টলে কাল চিঠি লিখে আনিয়েছি। ম্যাপের এক জায়গা হাত চাপা দিয়ে কী আছে পড়ো তো?

ARAT হাত তুলে বলল, এবার?

BALLARAT

এই নামটাই মরবার আগে বলেছিলেন মি. ম্যাকার্থি–ছেলে শুধু শুনতে পায় শেষটুকু। নামটা নিশ্চয় খুনির।

অদ্ভুত ব্যাপার তো!

তিন নম্বর অদ্ভুত ব্যাপার হল সেই ধূসর জিনিসটা–যা একটা আলখাল্লা। তাহলে, ব্যালারাট নামে এক অস্ট্রেলিয়াবাসী গায়ে ধূসর আলখাল্লা চাপিয়ে ডাঙশ মারার মতো পাথর হাঁকিয়ে খুন করে গেছে মি. ম্যাকার্থিকে। পরিষ্কার?

নিশ্চয়।

এ-অঞ্চল তার নখদর্পণেও বটে। কেননা লেকে পৌঁছোনোর দুটোই তো কেবল রাস্তা– একটা গোলাবাড়ি থেকে, আর একটা মি. টার্নারের বাড়ি থেকে।

ঠিক, ঠিক।

জমি পরীক্ষা করে খুনির দেহের যে-বর্ণনা মাথামোটা লেসট্রেডকে শোনালাম, তুমিও তা শুনেছ।

শুনেছি ঠিকই, কিন্তু কীভাবে অত খবর জানলে বুঝিনি। কতখানি লম্বা, সেটা না হয় দুটো পায়ের ছাপের মধ্যে ফাঁকটা দেখে আন্দাজ করলে। জুতোর চেহারাও ছাপ দেখে বলা যায়। কিন্তু এক পায়ে খোঁড়া জানলে কী করে?

ডান পা সবসময়ে আলতোভাবে জমি ছুঁয়ে গেছে–চাপ পড়েনি। পা টেনে চলে বলেই অমন হয়েছে।

কী করে বললে সে ল্যাটা?

খুলির পেছনে হাড় কীভাবে গুঁড়িয়েছিল, তুমি জান। চোট লেগেছিল বাঁ-দিক ঘেঁষে। অর্থাৎ বাঁ-হাতে পাথর মেরেছে খুনি। বাপ-বেটায় ঝগড়ার সময়ে গাছের আড়ালে লুকিয়ে চুরুট খেয়েছে আর ছাই ঝেড়েছে। ১৪০ রকম তামাকের ছাই নিয়ে একটা প্রবন্ধ

এককালে লিখেছিলাম। তাই ছাই দেখেই বুঝলাম, ইন্ডিয়ান সিগার। কিছুদূরে পেলাম চুরুটের গোড়া–ফেলে দেওয়া হয়েছে।

নলে লাগিয়ে খাওয়া হয়েছে বুঝলে কী করে?

গোড়াটায় দাঁতের কামড় নেই–নিশ্চয় নলে লাগানো হয়েছিল। যে-ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে, সেটা ভোতা–কেননা, কাটাটা অসমান।

বুঝেছি তুমি কার কথা বলছ। খুনি হলেন—

ঠিক এই সময়ে দরজা খুলে গেল। হোটেলের চাকর একজন আগন্তুককে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, মি, জন টার্নার।

ভদ্রলোকের চেহারাটা দেখবার মতো। বার্ধক্যের ভারে কাঁধ ঝুলে পড়েছে, পা টেনে টেনে হাঁটছেন, বলিরেখা আঁকা রুক্ষ মুখটি কিন্তু দুর্জয় মনোবলের প্রতিচ্ছবি। দাড়িতে জট, কার্নিশের মতো জটিল ভুরু–খানদানি, শক্তিমান চেহারা। কিন্তু মুখে যেন রক্ত নেই, ঠোঁট আর নাকের খাঁজ নীল হয়ে এসেছে। নিশ্চয় ছিনেজোঁক রোগের খপ্পরে পড়েছেন দীর্ঘদিন।

প্রশান্ত কণ্ঠে হোমস বললে, চিঠি পেয়েছেন তাহলে। বসুন।

আপনি লিখেছেন, কেলেঙ্কারি যদি না-চাই, তাহলে আপনার সঙ্গে যেন দেখা করি।

নিজে আপনার কাছে যায়নি ওই কারণেই।

বলুন কেন ডেকেছেন? কথাটা জিজ্ঞেস করলেন বটে, কিন্তু ক্লান্ত আর হতাশ চোখ দেখে মনে হল জবাবটা তিনি জানেন।

চোখে চোখে চেয়ে হোমস বললে, ম্যাকার্থি ঘটিত সব ব্যাপার আমি জানি!

দুই করতলে মুখ লুকিয়ে গুঙিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ টার্নার।

বললেন জড়িত স্বরে, কিন্তু জেমসের সর্বনাশ হতে আমি দেব না। যদি দেখি বিনা পাপে তার শাস্তি হচ্ছে, ঠিক করেই রেখেছি সব কবুল করব।

শুনে খুশি হলাম।

এতদিন কবুল করিনি মেয়েটার কথা ভেবে। বুক ভেঙে যাবে আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা শুনলে।

কিন্তু অতদূর জল গড়ালে তো। তার মানে?

দেখুন মশায়, আমি সরকারের নুন খাই না। এ-কেসে নাক গলিয়েছি স্রেফ আপনার মেয়ের পীড়াপীড়িতে। আপনার মেয়ে যা চায়, আমিও তাই চাই–জেমসের গায়ে যেন আঁচ না-লাগে।

মি. হোমস, বহুমূত্র রোগে আমি শেষ হয়ে এসেছি–বড়োজোর আর মাসখানেক আমার আয়ু। মৃত্যুটা বাড়িতেই হোক, এই আমি চাই জেলে যেন না হয়।

কলম আর কাগজ নিয়ে হোমস বললে, আপনি বলুন কী করেছিলেন, আমি লিখে নিচ্ছি। সাক্ষী ওয়াটসন। জেমসকে যদি কোননামতেই আর বাঁচানো না-যায়, শুধু তখনই প্রকাশ করব এই স্বীকারোক্তি।

শুধু দেখবেন, অ্যালিস যেন এই ঘটনা শুনে কষ্ট না-পায়। অবশ্য মামলা শেষ হওয়ার আগেই আমি শেষ হয়ে যাব।

এই ম্যাকার্থি শয়তানটাকে আপনারা কেউই চেনেন না। গত বিশ বছর ধরে সে আমার জীবন বিষিয়ে তুলেছিল।

ষাট দশকের গোড়ার দিকে আমরা ডাকাতি করতাম। রক্ত তখন গরম। অসৎ সংসর্গে মিশে ছ-জনের দল গড়লাম। চলন্ত গাড়ি থামিয়ে লুঠতরাজ করেছি, আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ছিনতাই করেছি। ব্যালারাটের পাষণ্ড জ্যাকের নাম শুনলে শিউরে উঠত ওখানকার মানুষ।

একদিন একটা সোনাভরতি গাড়ি লুঠ১৭ করলাম। ছ-জন পাহারাদারের চারজনকে আমরা খতম করলাম–ওরা খতম করল আমাদের তিনজনকে। ড্রাইভারের কপালে পিস্তল ঠেকিয়ে গাড়ি দাঁড় করালাম–সে কিন্তু আমাকে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছিল। উচিত ছিল মাথাটা তখনই উড়িয়ে দেওয়া।

এই লোকটাই হল ম্যাকার্থি। অত সোনা পেয়ে ভাগবাটোয়ারা করে নিয়ে দল ভেঙে দিলাম। আর কুকাজ নয়, এবার সৎকাজে পুরানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব–এই মনস্থ করে দেশে ফিরলাম, জমিজায়গা কিনলাম, বিয়ে করলাম, মেয়ে হল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই মেয়েই আমাকে সৎপথে টেনে রেখেছে–ছন্নছাড়া হতে দেয়নি।

এই সময়ে একদিন শহরে দেখা হয়ে গেল ম্যাকার্থির সঙ্গে। অবস্থা রাস্তার কুত্তার মতো। দেখিয়ে সে আমার সবচেয়ে ভালো জমি বিনা ভাড়ায় ভোগ করতে লাগল, টাকাপয়সা যখন-তখন চেয়ে নিত। নইলে পুলিশকে খবর দেবে–এই হুমকি দিয়ে চলল সমানে। জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল আমার। অ্যালিস বড়ো হওয়ার পর তার নিগ্রহের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। অ্যালিস পাছে আমার অতীতের দুষ্কর্ম জেনে ফেলে, এই ভয়ে আমি সিটিয়ে থাকি দেখে একদিন চেয়ে বসল অ্যালিসকেই।

কিন্তু এইবার আমি বেঁকে বসলাম। ওর নোংরা রক্ত আমার রক্তের সঙ্গে মিশবে, এ কখনোই হতে পারে না। তা ছাড়া ওর উদ্দেশ্য আমার সর্বস্ব গ্রাস করা। আমার আয়ু যে

ফুরিয়ে এসেছে, সে-খবর ও জানত। জেমস ছোকরার ওপর আমার কিন্তু বিতৃষ্ণা নেই কিন্তু হাজার হলেও শয়তান ম্যাকার্থির ছেলে সে।

তাই ঠিক করলাম বোঝাঁপড়া করা যাক। হ্রদের পাড়ে দেখা করার ব্যবস্থা হল। গিয়ে দেখি ছেলের সঙ্গে তর্ক হচ্ছে ম্যাকার্থির। আড়ালে দাঁড়িয়ে চুরুট খেতে লাগলাম। শুনলাম, ছেলেকে বোঝাচ্ছে আমার মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে। এমনভাবে খেপাচ্ছে জেমসকে যেন আমার মেয়ে একটা বাজারের মেয়ে। শুনতে শুনতে অন্তরাত্মা পর্যন্ত বিষিয়ে উঠল। মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। আমার দিন তো ফুরিয়ে এসেছে। কিন্তু এই শয়তান বেঁচে থাকলে যে আমার জীবনে সুখ শান্তি কিছুই থাকবে না। ভাবতে গিয়ে মাথায় রক্ত চড়ে গেল। ঠিক করলাম, আর না। ওকে খতমই করব।

তাই ওকে খুন করলাম মাথায় পাথর মেরে। মরণ-চিৎকার শুনে জেমস এসে পড়বার আগেই পালিয়ে গেলাম। কিন্তু আবার ফিরে আসতে হল ফেলে যাওয়া আলখাল্লাটা নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

হোমস সব লিখে নিল, ম্যাকার্থিকে দিয়ে সই করিয়ে নিল।

তারপর বললে, আপনার বিচারের আয়োজন হচ্ছে ওপরকার বড়ো আদালতে –এ-আদালতে তাই এই স্বীকারোক্তি আমি আর পেশ করব না। কিন্তু যদি দেখি বিনা দোষে সাজা পেতে যাচ্ছে জেমস, তাহলে তাকে বাঁচানোর শেষ উপায় হিসেবে এই স্বীকারোক্তি

আমি কাজে লাগাব। তদ্দিন এ-লেখা আমার কাছেই থাকবে। আপনার মৃত্যুর পরেও থাকবে। কেউ জানবে না।

আঃ, বাঁচালেন। এবার আমি শান্তিতে মরতে পারব, বলে পা টেনে টেনে স্খলিত চরণে নিষ্ক্রান্ত হলেন বিশালদেহী বৃদ্ধ টার্নার।

আদালতে স্বীকারোক্তি পেশ করার আর দরকার হয়নি–অন্যান্য প্রমাণের জোরে জেমসকে। খালাস করে আনে হোমস। মি. টার্নার এখন পরলোকে। আশা করি তার মেয়েকে নিয়ে সুখে ঘরকন্না করছে জেমস। আজও জানে না ওরা, কী কুটিল ছায়ায় একদিন অন্ধকার হয়ে এসেছিল তাদের অতীত জীবন।

————-

টীকা

১. বসকোম বা বসকম্ব ভ্যালির প্রহেলিকা : বসকম্ব ভ্যালি মিস্ত্রি প্রথম প্রকাশিত হয় অক্টোবর ১৮৯১ সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে।

২. টেলিগ্রামটা : ১৮৭৬ সালে লন্ডনে টেলিফোন ব্যবস্থা প্রচলিত হলেও টেলিগ্রামের জনপ্রিয়তা কমেনি। তখনও, ব্যাটারি, তামার তার, ম্যাগনেটিক সূচ প্রভৃতি সহযোগে

তৈরি টেলিগ্রাফ যন্ত্র ১৮৩৭ সালে প্রবর্তন করেন স্যার উইলিয়াম কুক এবং চার্লস হুইটস্টোন। আমেরিকায় স্যামুয়েল মর্স তার আলাদা যন্ত্র এবং বর্ণমালার কোড প্রচলন করেন আরও সাত বছর পরে, ১৮৪৪-এ।

৩. স্ত্রীকে : ড. ওয়াটসনের এই স্ত্রী আবশ্যিকভাবে দ্য সাইন অব ফোর উপন্যাসের নায়িকা মেরি মাসটন।

৪. বসকোম ভ্যালি : বাস্তবে এই নামে কোনো শহর বা অঞ্চল ইংলন্ডে নেই। এটি লেখকের কল্পনাপ্রসূত।

৫. প্যাডিংটন : ইংলন্ডে যাত্রীবাহী রেলগাড়ি প্রথম চালু হয় ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে। গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজের প্রান্তিক স্টেশন হিসেবে পাডিংটন স্টেশন নির্মিত হয় ১৮৩৮-এ। নির্মাতা-স্থপতি ইসামবার্ড কিংডম ব্রুনেল। রানি ভিক্টোরিয়া তার প্রথম রেলভ্রমণ শেষ করেছিলেন এই স্টেশনে।

৬. ট্রেনে : ১৮৩০-এ রেলপথে যাত্রী পরিবহন শুরু হওয়ার পর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য উইলিয়ম হাসকিন ট্রেনের ধাক্কায় মারা যান। সেটিই সম্ভবত প্রথম রেল দুর্ঘটনা। ১৮৪৮-এ ইংলন্ডে মোট রেলপথের পরিমাণ ছিল প্রায় ৫০০০ মাইল। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫০০০ মাইলে।



www.bengaliebook.com

৭. অস্ট্রেলিয়া : সেই সময়ে অস্ট্রেলিয়া ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। অস্ট্রেলিয়ান কলোনিজ গভর্নমেন্ট অ্যাক্ট প্রণীত হয় ১৮৫০-এর অগাস্ট মাসে। সেই আইন মোতাবেক নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়া, কুইন্সল্যান্ড এবং টাসমানিয়া স্বশাসিত কলোনি হিসেবে চিহ্নিত হয়।

৮. করোনার : ইংলন্ডের আইনে যেকোনো অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্ত করেন করোনার। তাকে সাহায্য করেন বারোজন জুরি। এই কাজের প্রয়োজনে করোনার সাক্ষ্যগ্রহণ করেন এবং নিজেই সাক্ষীদের প্রশ্ন করতে পারেন।

৯. সুইনডন : গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজের যেকোনো ট্রেনকে সুইনডন স্টেশনে দশ মিনিট দাঁড়াতে হত। ১৮৯৫-এ এই প্রথা তুলে দেওয়া হয়।

১০. লেসট্রেড : এই গল্পের আগে প্রকাশিত উপন্যাসে লেসট্রেড হাজির থাকলেও স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রকাশিত কোনো কাহিনিতে এটাই লেসট্রেড-এর আবির্ভাব।

১১. ভিক্টোরিয়ায় : ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভিক্টোরিয়া নামে একাধিক অঞ্চল, শহর, রাজধানী, পর্বতশৃঙ্গ ইত্যাদি থাকলেও এই ভিক্টোরিয়াকে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত কলোনিয় হিসেবেই ধরে নিতে হবে।

১২. সোনার খনি : ভিক্টোরিয়ায় সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় ১৮৫০-এ। এর ফলে মাত্র চার বছরে এই কলোনির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় চারগুণ।

১৩. একপাল মোষ এলেও : পায়ের ছাপ নষ্ট হওয়ার কারণে এই উপমা হোমসকে অন্যত্র অনেক কাহিনিতে ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে। আ স্টাডি ইন স্কারলেট-এ একথা বলেছিলেন শার্লক হোমস।

১৪. BALLARAT: মেলবোর্নের পঁচাত্তর মাইল পশ্চিমে অবস্থিত ব্যালারাটে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয় ১৮৫১ সালে। আবিষ্কার করেন জন ডানলপ নামে এক স্বর্ণসন্ধানী।

১৫. এই নামটাই : অন্য নামও হতে পারত। লেখক খেয়াল করেননি, অস্ট্রেলিয়ায় ARARAT (আরারাত) নামেও একটি শহর আছে।

১৬. বহুমূত্র রোগ : ডায়াবেটিস মেলিটাস বা বহুমূত্র রোগ একটি মারাত্মক এবং প্রাণান্তকারী রোগ হিসেবে বিবেচিত হত।

১৯২১-এ ইনসুলিন আবিষ্কার হওয়ায় এর প্রতিষেধক পাওয়া যায়।

১৭. সোনাভরতি গাড়ি লুঠ : এই ঘটনার সঙ্গে দুটি বাস্তব সোনা লুঠের ঘটনার মিল লক্ষ করা গিয়েছে। প্রথমটি, ১৮৫৩-র ম্যাকআইভর গোল্ড রবারি, অন্যটি, ইউগোরা এসকর্ট রবারি, ঘটেছিল ১৮৬২-তে। দুটি ঘটনাতেই ছ-জন প্রহরী এবং দু-জন ডাকাতের মধ্যে গুলির লড়াই হয়েছিল বলে জানা যায়।

**১৮.** ওপরকার বড়ো আদালতে : হোমস লেসট্রেডকে টার্নারের চেহারার বিবরণ দিলেও, লেসট্রেডের তাকে ধরতে না-পারার বিষয়টি বেশ আশ্চর্যজনক মনে করেছেন বেশ কিছু হোমস-গবেষক। তা ছাড়া একজন খুনে ডাকাতকে ছেড়ে দিয়ে হোমস উচিৎ কাজ করেননি–মনে করেন অনেকে।

**১৯.** আজও জানে না ওরা : ড. ওয়াটসনের এই কাহিনি স্ট্যান্ডে প্রকাশিত হওয়ার পর জেমস আর অ্যালিস নিশ্চয়ই আসল ঘটনা জানতে পেরেছিল।

# বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি

[এ স্ক্যানডাল ইন বোহেমিয়া]

শার্লক হোমসের চোখে তিনিই নাকি একমাত্র মহিলা পদবাচ্য স্ত্রীলোক। তার মানে এই নয় যে মেয়েটির প্রতি দুর্বলতা ছিল হোমসের। মন যার ঘড়ির কাটার মতো সুসংযত, কোনো ভাবাবেগ সেখানে ঠাঁই পায় না। হিসেবি মন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টির একটা যন্ত্র বললেই চলে তাকে। ভাবালুতার কোনো দামই নেই তার কাছে বিচারশক্তি নাকি ঘুলিয়ে যায় এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলে, তা সত্ত্বেও আইরিন অ্যাডলারকে শ্রেষ্ঠ মহিলার সিংহাসনে বসিয়েছিল শার্লক হোমস।

বিয়ের পর থেকেই হোমসের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছিল আমার। নিজের সংসার আর আলাদা ঘর নিয়েই তখন আমি মশগুল। হোমস সামাজিকতার ধার ধারে না। বেকার স্ট্রিটের ডেরায় রাশি রাশি বই; গোয়েন্দাগিরি আর কোকেনের নেশা নিয়ে সে রইল সম্পূর্ণ আলাদা জগতে। মাঝে মাঝে খবরের কাগজে চোখে পড়ত তার চমকপ্রদ কীর্তিকাহিনির সংবাদ।

নতুন করে ডাক্তারি শুরু করার পর একদিন রাত্রে রুগি দেখে বাড়ি ফিরছি (২০।৩।১৮৮৮) বেকার স্ট্রিট দিয়ে, এমন সময়ে চোখে পড়ল ওপরের ঘরে দ্রুত পায়চারি করছে হোমস। পর্দার গায়ে দু-বার ছায়া পড়ল তার লম্বা রোগা শরীরের। দেখলাম মাথা বুকের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, দুহাত পেছনে। অর্থাৎ কোকেনের নেশা

কাটিয়ে উঠেছে হোমস, কাজের নেশায় বুদ হয়েছে। মাথায় সমস্যার ভূত চেপেছে বলেই এত ছটফট করছে ঘরময়।

উঠে এলাম ওপরকার ঘরে। হোমস আমাকে দেখল, খুশি হল, কিন্তু উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল। চুরুটের বাক্স এগিয়ে দিয়ে সুরাপাত্রের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বসতে বলল চেয়ারে। তারপর তন্ময় চোখে চেয়ে রইল আমার দিকে।

বিয়ে করে সুখী হয়েছ দেখছি। সাড়ে সাত পাউন্ড ওজন বেড়েছে।

সাত পাউন্ড।

আবার ডাক্তারি শুরু করেছ?

তুমি জানলে কী করে?

দেখে। আরও দেখছি, সম্প্রতি খুব ভিজেছ বৃষ্টিতে, আর একটা অকম্মার ধাড়ি ঝি জুটেছে বাড়িতে।

ভায়া, বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না কি? সেকাল হলে তোমায় নির্ঘাত জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হত! গত বেস্পতিবার গাঁয়ে গিয়েছিলাম হেঁটে, ফিরেছি অতি কষ্টে। কিন্তু জামাকাপড়

পালটানোর পরেও তুমি জানলে কী করে বল তো? যাচ্ছেতাই ঝি-টাকেও বিদেয় করেছে স্ত্রী। অথচ তুমি—

হাসল হোমস। দু-হাত ঘষে বললে, তোমার বাঁ-পায়ের জুততায় পাশাপাশি দুটো আঁচড় পড়েছে কাদা তুলতে গিয়েছিল এমন কেউ যে ডাহা আনাড়ি। অর্থাৎ, বাদলার দিনে রাস্তায় বেরিয়েছিলে এবং যে ঝি-টিকে দিয়ে জুতো সাফ করিয়েছিলে, ঝাল ঝেড়েছে সে জুতোর ওপরেই। তোমার গায়ে আয়োডোফর্মের গন্ধ, ডান হাতের বুড়ো আঙুলে সিলভার নাইট্রেটের কালচে দাগ, আর স্টেথিস্কোপ রাখার জন্যে উঁচু টুপি দেখে অনায়াসেই বলা যায় রুগি নিয়ে ব্যস্ত রয়েছে ডাক্তার।

হেসে ফেললাম। বললাম, এত সহজ করে বললে যে মনে হল আমারও বলা উচিত ছিল।

চেয়ারে বসল হোমস। চুরুট ধরাল। বলল, তুমি দেখ ঠিকই, কিন্তু খুঁটিয়ে দেখ না তোমার সঙ্গে আমার তফাত সেইখানেই। যেমন ধর নীচের হল ঘর থেকে এই ঘরে ওঠবার সিঁড়ি তুমি দেখেছ?

নিশ্চয়।

কতবার দেখেছ?

কয়েক-শো বার তো বটেই।

ক-টা ধাপ আছে সিঁড়িতে?

তা তো বলতে পারব না।

কিন্তু আমি পারব। কেননা, তুমি শুধু দেখেছ, ঠাহর করনি–আমি করেছি। সতেরোটা ধাপ আছে সিঁড়িতে। আমার ব্যাপার নিয়ে তুমি লেখালেখি শুরু করেছ বলেই তোমাকে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, টেবিলের ওপর পড়ে থাকা একটা গোলাপি চিঠি আমার দিকে নিক্ষেপ করল হোমস, জোরে পড়ো।

চিঠির কাগজ বেশ পুরু; কিন্তু তারিখ, সই, ঠিকানা–কিছুই নেই।

চিঠিটা এই : আজ রাত পৌনে আটটায় একটা অত্যন্ত গোলমেলে ব্যাপারে পরামর্শ করার জন্যে মুখোশ পরে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। ঘরে থাকবেন।

বললাম, রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি। তোমার কী মনে হয়?

সূত্র হাতে না-আসা পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো মারাত্মক ভুল। চিঠি দেখে তোমার কী মনে হয়?

চিঠি যিনি লিখেছেন, তিনি বড়োলোক। কাগজটা রীতিমতো শক্ত, মজবুত আর দামি।

খাঁটি কথা। এ-কাগজ ইংলন্ডে পাওয়া যায় না। আলোর সামনে ধরো।

ধরলাম। জলছাপটা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। g এর পাশে E, একটা P, G-এর সঙ্গে t.

কী বুঝলে? হোমসের প্রশ্ন।

কারিগরের নাম বা মনোগ্রাম।

না। g এর সঙ্গে ৫ থাকার মানে গেসেল শাফট। জার্মান শব্দ। মানে, কোম্পানি। আমরা যেমন কোম্পানিকে কোং লিখি, ওরাও তেমনি গেসেল শাফটকে এইভাবে লেখে। P মানে পেপার। বাকি রইল E আর g এর মানেটা। কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার দেখলেই বোঝা যাবে।

তাক থেকে বাদামি রঙের ইয়া মোটা একখানি বই নামিয়ে পাতা ওলটাল হোমস। ইগ্রো, ইগ্রোনিৎস, ইগ্রিয়া। আর এই হল বোহেমিয়া। ভাষা জার্মান। কাচ আর কাগজের কারখানার জন্যে বিখ্যাত। বল, কী বুঝলে?

কাগজটা তৈরি হয়েছে বোহেমিয়ায়?

এবং পত্রলেখক একজন জার্মান। চিঠি লেখার কায়দা দেখেই বোঝা যায়। জার্মানরাই কথার শেষে ক্রিয়া বসায়। ভদ্রলোক কিন্তু এসে গেছেন।

কথা শেষ হতে-না-হতেই ঘোড়ার পায়ের টগবগ শব্দ, গাড়ির চাকার ঘরঘর আওয়াজ এবং দোরগোড়ার ঘণ্টাধ্বনি শোনা গেল।

শিস দিয়ে উঠল হোমস। বললে, দু-ঘোড়ায় টানা গাড়ি মনে হচ্ছে।

পরক্ষণেই উঁকি দিল জানলায়, ঠিক বলেছি। জোড়াঘোড়ায় টানা ব্রুহ্যাম গাড়ি। এক-একটা ঘোড়ার দামই কমসেকম দেড়শো গিনি ওয়াটসন, এ-কেসে টাকা আছে হে।

আমি যাই।

মোটেই না। কেসটা ইন্টারেস্টিং, না-থাকলে আফশোস করতে হবে।

ধীর স্থির ভারিক্কি পদশব্দ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসে স্তব্ধ হল দরজার সামনে। পরক্ষণেই টোকা পড়ল পাল্লায়–বেশ জোরে গাঁট ঠোকার আওয়াজ–যেন কর্তাব্যক্তি কেউ।

ভেতরে আসুন,বললে হোমস।

ঘরে যিনি ঢুকলেন, মাথায় তিনি রীতিমতো ঢ্যাঙা–সাড়ে ছ-ফুটেরও বেশি। হারকিউলিসের মতো গড়নপেটন। পোশাক দারুণ দামি, কিন্তু ভীষণ জমকালো ইংলন্ডের রুচিতে আটকায়। সারাগায়ে কুবেরের সম্পদ যেন ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মাথায় হ্যাট, আধখানা মুখ কালো মুখোশে ঢাকা। একটা হাত মুখোশ ছুঁয়ে রয়েছে–যেন ঢাকবার আগে এইমাত্র লাগালেন। মুখের নীচের দিকে প্রখর ব্যক্তিত্ব যেন ছিটকে বেরুচ্ছে। মোটা ঠোট আর লম্বা থুতনিতে গোঁয়ারতুমি, গাজোয়ারি আর মনের জোর বেশ স্পষ্টভাবেই ফুটে উঠেছে।

রুক্ষ জার্মান উচ্চারণে বললেন–চিঠি পেয়েছেন? বলে পর্যায়ক্রমে আমার আর হোমসের দিকে তাকালেন। যেন বুঝে উঠতে পারছেন না কার সঙ্গে কথা বলবেন।

বসুন, বললে হোমস। ইনি আমার বন্ধু এবং সহযোগী ডক্টর ওয়াটসন। কার সঙ্গে কথা বলছি জানতে পারি?

আমার নাম কাউন্ট ফন ক্র্যাম–বোহেমিয়ার খানদানি আদমি আমি। এঁকে বিশ্বাস করা চলে তো?

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছি, টেনে বসিয়ে দিল হোমস। বলল, হয় দুজনে শুনব, নয় কেউ শুনব না। এঁর সামনেই বলুন।

কাঁধ ঝাঁকি দিয়ে কাউন্ট বললেন, তাহলে কথা দিন অন্তত দু-বছর এ-ব্যাপার প্রকাশ করবেন না করলে ইউরোপের ইতিহাস অন্যরকম দাঁড়াতে পারে।

কথা দিলাম, বললাম আমি আর হোমস।

আমাকে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি চান না আমার পরিচয় ফাঁস হয়ে যাক। মুখোশ লাগিয়েছি সেই কারণে। আমার আসল নামও আপনাকে বলিনি।

জানি, কাঠখোট্টা গলায় বললে হোমস।

বোহেমিয়ার আর্মস্টাইন রাজবংশের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য এত সাবধান হতে হচ্ছে। জানবেন।

সোফায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে হোমস বললে, তাও জানি।

অবাক হলেন রহস্যময় মক্কেল। হোমসের নামডাক যে অকারণে হয়নি, তা যেন বুঝতে পারলেন।

চোখ খুলল হোমস। বললে, মহারাজ যদি মন খোলসা করে সব বলেন তাহলে আমার দিক দিয়ে পরামর্শ দিতে সুবিধে হয়।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন বিরাটদেহী আগন্তুক। দুমদাম করে ঘরময় কিছুক্ষণ চরকিপাক দিয়ে একটানে মুখোশ খুলে নিয়ে নিক্ষেপ করলেন মেঝেতে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ আমিই রাজা। অত লুকোছাপা কীসের?

আমিও তাই বলি। আপনি মুখ খোলার আগেই বুঝেছিলাম আজ আমার ঘরে পায়ের ধুলো দিয়েছেন স্বয়ং ডিউক।

ব্যাপারটা এতই গোপনীয় যে কাউকে বিশ্বাস করতে পারিনি প্রাহা থেকেই ছদ্মবেশ ধরে আসছি।

শুরু করুন, ফের চোখ বন্ধ করে হোমস।

বছর পাঁচেক আগে ওয়ারশ নগরে নামকরা অভিনেত্রী আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। নামটা শুনেছেন নিশ্চয়?

ডাক্তার, নামের লিস্টটা বার করো তো!

নামি ব্যক্তিদের যাবতীয় বৃত্তান্ত লিখে রাখত হোমস। দরকারমতো তা কাজে লাগত। আইরিন অ্যাডলারের নাম পেলাম একজন ইহুদি প্রফেসর আর মিলিটারি অফিসারের নামের মধ্যে।

দাও। হুঁ! নিউজার্সিতে জন্ম ১৮৫৮ সালে। ইম্পিরিয়াল ওয়ারশ রঙ্গমঞ্চের মূল গায়িকা। হুঁ থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে লন্ডনে আছেন। বুঝেছি। এঁকে যেসব চিঠি লিখেছেন, এখন তা ফেরত চাইছেন–এই তো?

তাই বলতে পারেন।

লুকিয়ে বিয়ে করেছিলেন?

মোটেই না।

দলিল-টলিল বা প্রশংসাপত্র জাতীয় কিছু আছে কি?

একদম না।

তাহলে সে-চিঠি যে আসল, তা প্রমাণ করা যাবে কী করে?

আমার হাতের লেখা দেখে।

হাতের লেখা জাল করা যায়।

প্যাডের কাগজ আমার।

তাও চুরি করা যায়।

সিলমোহরটাও যে আমার।

তাও নকল করা যায়।

আমার ফটো?

সে আর এমন কী–কিনতে পাওয়া যায়।

কিন্তু দুজনে একসঙ্গে আছি যে ফটোতে।

সর্বনাশ! খুব কাঁচা কাজ করেছেন।

তখন কি আর কাণ্ডজ্ঞান ছিল আমার? বয়স কম। যুবরাজ ছিলাম। এখনই তো মোটে তিরিশ বছর বয়স আমার।

ফটোটা ওঁর কাছ থেকে সরাতে হবে।

সে-চেষ্টাও হয়েছে। পারিনি।

তাহলে কিনে নিন।

বেচবে না।

চুরি করান।

পাঁচবার চেষ্টা করেছি। দু-বার চোর দিয়ে, একবার দেশ বেড়ানোর সময়ে মালপত্র সরিয়ে, আর দু-বার পথে ঘাপটি মেরে থেকে। একবারও পারিনি।

ছবি নিয়ে কী করতে চান উনি?

স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজকন্যের সঙ্গে শিগগিরই বিয়ে হবে আমার। মেয়েটি যদি জানতে পারে আমার চরিত্র ভালো নয়, বিয়ে ভেঙে যেতে পারে। আইরিন অ্যাডলার ছবিখানা সেইখানেই পাঠাবে।

পাঠিয়ে দেননি তো?

না। বিয়ের কথা যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হবে, সেইদিন পাঠাবে। অর্থাৎ সামনের সোমবার।

হাই তুলল হোমস তিনটে দিন পাচ্ছি হাতে। আপনি লন্ডনেই আছেন তো?

হ্যাঁ। ল্যাংহ্যামে পাবেন আমাকে।

খবর সেইখানেই দেব। দেনাপাওনার ব্যাপারটা কী হবে?

যা বলবেন তাই হবে। রাজ্যের খানিকটা দিয়ে দিতে পারি ফটোর দাম হিসেবে।

হাতখরচ?

একটা চামড়ার ব্যাগ বার করে টেবিলে রাখলেন গ্র্যান্ড-ডিউক।

এর মধ্যে তিন-শো মোহর আর সাত-শো পাউন্ডের নোট আছে।

রসিদ লিখে দিল হোমস আইরিন অ্যাডলারের ঠিকানাটা কী?

ব্রায়োনি লিজ, সার্পেন্টাইন অ্যাভিন, সেন্ট জনস উড।

ফটোটা ক্যাবিনেট সাইজের?

হ্যাঁ।

গুড নাইট। শিগগিরই খবর পাবেন।

গাড়ির আওয়াজ দূরে মিলিয়ে গেল। হোমস বলল, কাল বিকেল তিনটে নাগাদ চলে এস, এই নিয়ে কথা বলা যাবেখন।

০২.

পরদিন ঠিক তিনটেয় গেলাম। হোমস সকাল আটটায় বেরিয়েছে, তখনও ফেরেনি। আগুনের চুল্লির ধারে বসে রইলাম ফেরার পথ চেয়ে।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে চারটে বাজতেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকল একজন কদাকার সহিস। পোশাক নোংরা, মুখে দাড়িগোঁফ, চোখ রাঙা, ভাবভঙ্গি, মাতালের মতন। তিন-তিনবার আপাদমস্তক চোখ বুলোনোর পর চিনলাম বহুরূপী হোমসকে। শোবার ঘর থেকে পাঁচ মিনিট পরেই বেরিয়ে এল টুইড-সুট পরা ভদ্রলোকের চেহারায়। আগুনের সামনে পা ছড়িয়ে বসে পেটফাটা হাসি হাসল বেশ কিছুক্ষণ ধরে।

ব্যাপারটা কী? শুধোই আমি। দারুণ মজা হয়েছে আজ সকালে।

আইরিন অ্যাডলারের বাড়ি পাহারা দিচ্ছিলে বুঝি?

ঠিক। সহিসের ছদ্মবেশে বেরিয়েছি সকাল আটটায়। গাড়োয়ান আর সহিসে খুব মাখামাখি সম্পর্ক থাকে–খবর পেতে অনেক সুবিধে হয়। ব্রায়োনি লজ বাড়িটা দোতলা, রাস্তার ওপরেই, পেছনে বাগান, ডান দিকে সাজানো বসবার ঘর, বড়ো বড়ো জানলা। বাগানের পাঁচিল বরাবর একটা নোংরা গলি ঢুকেছে ভেতরে। সহিসরা ঘোড়া ডলাইমালাই করছে সেখানে। আমিও হাত লাগালাম। বিনিময়ে পেলাম দুটো পেনি, আধ বোতল মদ, তামাক আর আইরিন অ্যাডলার সম্পর্কে অনেক খবর। নির্ঝঞ্ঝাট মহিলা। ভোরে বেড়াতে যাওয়া আর কনসার্টে গান গাইতে যাওয়া ছাড়া রাস্তায় বেরোন না। সাতটায় ফিরে ডিনার খান। পুরুষ বন্ধু শুধু একজনই। সুপুরুষ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর, গায়ের রং গাঢ়, রোজ আসেন। পেশায় উকিল, নাম গডফ্রে নর্টন। খটকা লাগল। আইরিন অ্যাডলারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা স্রেফ উকিলের সঙ্গে মক্কেলের সম্পর্ক, ভালোবাসাবাসির ব্যাপারও আছে? প্রথমটা যদি ঠিক হয়, তাহলে ফটো তার হেপাজতেই আছে। অর্থাৎ তদন্তের ক্ষেত্র আরও বাড়ল।

ভাবছি কী করব, এমন সময়ে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। লাফিয়ে নামলেন এক ভদ্রলোক। চেহারা দেখেই বুঝলাম ইনিই গডফ্রে নর্টন। ব্যস্তসমস্তভাবে গাড়োয়ানকে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে ঝি-এর পাশ দিয়ে বোঁ করে ঢুকে গেলেন ভেতরে–যেন হরদম যাতায়াত আছে বাড়িতে।

ভেতরে রইলেন আধঘন্টা। জানালা দিয়ে দেখলাম হন হন করে পায়চারি করছেন আর হাত পা নেড়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছেন। আইরিন অ্যাডলারকে খুব একটা দেখা গেল না। তারপর বেরিয়ে এলেন আগের চেয়েও ব্যস্তভাবে। গাড়োয়ানকে হেঁকে বললেন–বিশ মিনিটের মধ্যে রিজেন্ট স্ট্রিট হয়ে সেন্ট মনিকা চার্চে যেতে হবে, আধ গিনি বকশিশ পাবে।

পেছন নেব কি না ভাবছি, এমন সময়ে একটা ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। খুব তাড়াহুড়ো করে ঘোড়া জোতা হয়েছে গাড়িতে, কোর্টের বোতাম লাগানোর সময়ও পায়নি কোচোয়ান। ঝড়ের মতো হল ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন আইরিন অ্যাডলার, গাড়িতে উঠেই হেঁকে বললেন–বিশ মিনিটে সেন্ট মনিকার গির্জেয় চল। আধ পাউন্ড বকশিশ দোব।

ঠিক এই সময়ে একটা ছ্যাকরা গাড়ি এসে গেল সামনে। তড়াক করে লাফ মেরে ঢুকে গেলাম গাড়ির ভেতরে। চিৎকার করে বললাম, সেন্ট মনিকার গিঞ্জেয় চল–বিশ মিনিটের মধ্যে যেতে পারলে আধ পাউন্ড বকশিশ।

উল্কাবেগে গাড়ি পৌছাল গির্জার সামনে। ভেতরে ঢুকে দেখলাম আইরিন অ্যাডলার, গডফ্রে নর্টন আর পাদরি ছাড়া কেউ আর নেই–বেদির সামনে দাঁড়িয়ে তিনজনে। আমাকে দেখেই কিন্তু তিনজনেই দৌড়ে এল আমার দিকে। আমি তো অবাক!

গডফ্রে নর্টন টানতে টানতে আমাকে বেদির কাছে নিয়ে গেলেন, চলে এসো! চলে এসো! তোমাকেই দরকার! আর মোটে তিন মিনিট বাকি! সাক্ষী না-থাকলে আইনের ফাঁক থেকে যাবে।

পরমুহূর্তে শুনলাম বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়া হচ্ছে আমার কানের কাছে এবং আমিও তা দিব্যি আউড়ে যাচ্ছি। যা জানি না, তার সাক্ষী দিচ্ছি। অর্থাৎ গডফ্রে নর্টন আর আইরিন অ্যাডলারের বিয়েতে মধ্যস্থতা করছি। চক্ষের নিমেষে বিয়ে হয়ে গেল। সবাই খুব খুশি। এক পাউন্ড পুরস্কারও পেলাম পাদরির কাছে। ব্যাপারটা বুঝলাম। সাক্ষী ছাড়া বিয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না–রাস্তা থেকে সাক্ষী আনতে গেলে সময় পেরিয়ে যেত–তাই আমাকে পেয়ে বর্তে গিয়েছে সকলে। এত হাসছিলাম সেই কারণেই।

তারপর? শুধোই আমি। গির্জের বাইরে এসে দুজনে গেলেন দু-দিকে–যাওয়ার আগে গডফ্রে নর্টন বলে গেলেন, সন্ধে নাগাদ রোজকার মতো আসবেন। কনে ফিরলেন বাড়িতে, আমিও এলাম এখানে–তোড়জোড় করতে।

কীসের তোড়জোড়?

খেয়ে নিয়ে বলব। পেটে আগুন জ্বলছে। বিকেলে তোমাকে দরকার। কাজটা কিন্তু বেআইনি। ধরা পড়ার সম্ভাবনাও আছে। রাজি?

এক-শোবার। উদ্দেশ্য মহৎ হলে সব কিছুতেই রাজি। কিন্তু মতলবটা কী তোমার?

খাবার এসে গেল। খেতে খেতে হোমস বললে, উদ্দেশ্য সত্যিই মহৎ। এখন পাঁচটা বাজে। দু-ঘণ্টা পরে ব্রায়োনি লজে পৌঁছোব আমরা–আইরিন অ্যাডলার তখন খেতে ফিরবেন।

তারপর?

আমি ভেতরে যাব, তুমি বাইরে থাকবে। বসবার ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে থাকবে। হাতে এই জিনিসটা রাখবে–চুরুটের মতো একটা লম্বাটে বস্তু বাড়িয়ে দিল হোমস–সামান্য ধোঁয়া-বোমা। ছুঁড়ে দিলেই আপনা থেকে জ্বলে ওঠে। চার-পাঁচ মিনিট পরে জানলা খুললে তুমি আমার হাতের দিকে নজর রাখবে। যখন দেখবে এইভাবে হাত নাড়ছি, বিশেষ একটা হস্তভঙ্গি করে হোমস, বোমাটা জানলা গলিয়ে ভেতরে ছুঁড়ে দিয়ে আগুন আগুন বলে চেঁচিয়ে উঠবে। ভিড় জমে উঠলেই সরে পড়বে। রাস্তার অন্যদিকে গিয়ে দাঁড়াবে। দশ মিনিট পরে আমি আসব সেখানে। বুঝেছ?

হ্যাঁ।

শোবার ঘরে গেল হোমস। ফিরে এল পাদরির ছদ্মবেশে। শুধু পোশাক নয়, চোখ-মুখের চেহারা পর্যন্ত পালটে গিয়েছে। হোমস অপরাধ তাত্ত্বিক হওয়ায় অভিনয় জগৎ হারিয়েছে একজন কুশলী শিল্পীকে, বিজ্ঞান জগৎ হারিয়েছে একজন চুলচেরা বিশ্লেষককে।

বেকার স্ট্রিট থেকে বেরোলাম ছটা বেজে পনেরো মিনিটে ব্রায়োনি লজের সামনে যখন পৌঁছোলাম তখন ল্যাম্পপোস্টের আলো জ্বলে উঠেছে।

বাড়ির সামনেটা যত ফাঁকা হবে ভেবেছিলাম, দেখলাম তা নয়। বেশ কিছু লোক এদিকে সেদিকে হয় আড্ডা মারছে, নয় ঘোরাফেরা করছে।

হোমস বললে, ওয়াটসন, নর্টন-অ্যাডলার বিয়ের ফলে আমাদের কাজ কিন্তু সহজ হয়ে এল। আইরিন অ্যাডলার এখন কখনোই চাইবেন না ছবিটা গডফ্রে নর্টনের চোখে পড়ুক। কিন্তু রেখেছেন কোথায়, সেইটাই এখন সমস্যা।

কোথায় বলে মনে হয় তোমার?

সঙ্গে যে রাখেননি, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। ক্যাবিনেট সাইজের ছবি মেয়েরা পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখতে পারে না–তা ছাড়া যেকোনো মুহূর্তে গ্র্যান্ড ডিউকের লোক তাঁকে ধরে সার্চ করতেও পারে।

তাহলে?

কারো কাছেও রাখেননি–কেননা ছবিটা কয়েকদিনের মধ্যে দরকার হবে। তা ছাড়া মেয়েরা যখন কিছু লুকোয় নিজেরাই লুকিয়ে রাখে–কারো সাহায্য নেয় না–বিশেষ করে

যাদের আত্মবিশ্বাস আছে। কাজেই ধরে নিচ্ছি ছবি তার নাগালের মধ্যেই আছে। অর্থাৎ, বাড়ির মধ্যে।

কিন্তু বাড়ি খোঁজাও তো হয়েছে।

ওকে খোঁজা বলে না।

তুমি কী করে খুঁজবে?

আমি তো খুঁজব না।

তবে?

উনিই দেখিয়ে দেবেন।–এই যে এসে গেছে গাড়ি।

মোড়ের মাথায় দেখা গেল গাড়ির আলো–এসে দাঁড়াল বাড়ির সামনে। সঙ্গেসঙ্গে প্রাপ্তিযোগের আশায় একজন নীচু ক্লাসের লোক দৌড়ে এসে খুলে ধরল দরজা। দৌড়ে এল আরও–একজন প্রথম জনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল বকশিশটা নিজেই নেওয়ার আশায়। লেগে গেল ঝগড়া। ছুটে এল আরও অনেকে। দুটো দল হয়ে যেতেই শুরু হল হাতাহাতি, ঘুসোঘুসি, লাঠালাঠি। হোমস দৌড়ে গেল আইরিন অ্যাডলারকে বাঁচাতে কিন্তু লাঠি খেয়ে কাতরে উঠে লুটিয়ে পড়ল রাস্তায়–রক্ত ঝরতে লাগল মুখ বেয়ে। দেখেই

ফর্সা হয়ে গেল হামলাবাজরা। অন্যদিক থেকে কয়েকজন ছুটে এসে ঘিরে ধরল জখম পাদরিকে। আইরিন অ্যাডলার ততক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছেন।

সেখান থেকেই জিজ্ঞেস করলেন, চোটটা কি মারাত্মক?

কেউ বলল, শেষ হয়ে গিয়েছে। কেউ বললে, না, না এখনও মরেনি–নিশ্বাস পড়ছে। তবে হাসপাতাল পর্যন্ত টিকবেন কিনা সন্দেহ। আর একজন বললে–ভেতরে নিয়ে যাব?

নিশ্চয়। বসবার ঘরে এনে সোফায় শুইয়ে দাও।

ধরাধরি করে হোমসকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল সোফায়। আলো জ্বলল বটে, জানলার পর্দা টানা হল না। দেখলাম, ভদ্রমহিলা নিজে শুশ্রূষা করছেন আহত পাদরিকে। ধোঁয়া বোমা হাতে নিয়ে তৈরি হলাম–সংকেত পেলেই ছুড়ব।

কষ্টেসৃষ্টে সোফায় উঠে বসেছে হোমস–বাতাসের অভাবে বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। একজন ঝি গিয়ে খুলে দিল জানলা। সঙ্গেসঙ্গে সেই বিশেষ কায়দায় হাত তুলল হোমস এবং আমিও ধোঁয়া বোমা ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলাম আগুন আগুন করে। একই সঙ্গে সমস্বরে আকাশফাটা চিৎকার আরম্ভ করল রাস্তার লোকজন। গলগল করে পুঞ্জীভূত ধোঁয়া বেরিয়ে এল জানলা দিয়ে। প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে কেউ কেউ টেনে লম্বা দিলে সেখান থেকে। তারই মাঝে শুনলাম হোমসের গলা–আগুন-ফাগুন নাকি সব বাজে কথা, নিশ্চয় কেউ ভয় দেখাচ্ছে।

সরে এলাম রাস্তার কোণে। দশ মিনিট দাঁড়ালাম। হোমস এসে আমাকে টেনে নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল বাড়ির দিকে।

শাবাশ ডাক্তার! বললে হোমস।

ফটোটা?

কোথায় আছে জেনে ফেলেছি।

কী করে জানলে?

উনি দেখিয়ে দিলেন।

কিচ্ছু বুঝলাম না।

রাস্তার লোকগুলো যে আমার ভাড়াটে অভিনেতা, তা নিশ্চয় বুঝেছ?

সন্দেহ হয়েছিল।

গোলমালের শুরুতে দৌড়ে গিয়েই দু-হাত মুখে রগড়ে নিয়েছিলাম–আগে থেকেই লাল রং মেখে রেখেছিলাম হাতে। জখম হওয়ার ভান করতেই বৈঠকখানা ঘরে না-ঢুকিয়ে পারলেন না ভদ্রমহিলা। বাড়ির কোন ঘরে ফটো লুকিয়েছেন সঠিক জানতাম না। বসবার ঘরও হতে পারে, শোবার ঘরও হতে পারে। সেটা জানবার জন্যেই ঘরের মধ্যে ধোঁয়া-বোমা ছোড়ালাম তোমাকে দিয়ে।

বাড়িতে আগুন লাগলে মেয়েরা আগে সবচেয়ে দামি জিনিস বাঁচাতে ছুটে যায়। মায়েরা দৌড়োয় বাচ্চার দিকে, কুমারীরা গয়নার দিকে। আইরিন অ্যাডলার দৌড়োলেন ঘণ্টার দড়ির ওপরকার একটা আলগা তক্তার দিকে–আধখানা টেনে সরাতেই ভেতরকার ফাঁকে দেখলাম ফটোটা। তারপরেই যখন বললাম–আগুন লাগেনি, উনি যেখানকার ফটো সেখানেই রেখে দিয়ে ধোঁয়া-বোমাটার দিকে একবার তাকিয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। সেই ফাঁকেই ছবিটা সরিয়ে নিলে হত, কিন্তু কোচোয়ান লোকটা ঘরে ঢুকে এমন কটমট করে চেয়ে রইল আমার দিকে যে ভরসা হল না। বেশি তাড়াহুড়ো না-করাই ভালো।

এবার কী করবে?

কাল সকাল আটটায় খোদ মহারাজকে নিয়ে যাব আইরিন অ্যাডলারের বসবার ঘরে। উনি অবশ্য নেমে এসে আমাদের কাউকেই দেখতে পাবেন না–সেইসঙ্গে দেখবেন ফটোও নেই খুপরির মধ্যে। আমি চাই মহারাজ নিজের হাতে ছবি উদ্ধার করুন। আর দেরি নয়, এখুনি লিখে জানাচ্ছি মহারাজকে।

বেকার স্ট্রিটে পৌঁছে গেলাম কথা বলতে বলতে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চাবির জন্যে পকেটে হাত দিল হোমস। অমনি কানের কাছে শুনলাম স্বাগত ভাষণ, গুডনাইট, মি. শার্লক হোমস!

রাস্তায় তখন গমগম করছে লোকজন। মনে হল আলস্টারধারী শীর্ণকায় এক ছোকরার দিক থেকে ভেসে এল কথাটা। হনহন করে আমাদের পাশ দিয়ে সে চলে গেল সামনে।

শ্যেনদৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে মৃদুস্বরে বললে হোমস, চেনা গলা! কিন্তু লোকটা কে?

সে-রাতে আর বাড়ি ফিরলাম না–বেকার স্ট্রিটের বাড়িতেই থেকে গেলাম। পরের দিন সকালে হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন বোহেমিয়ার গ্র্যান্ড-ডিউক।

ঢুকেই হোমসের কঁধ খামচে ধরে ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, পেয়েছেন?

এখনও পাইনি–কিন্তু এবার পাবেন।

তাহলে চলুন, আর দেরি নয়।

নেমে এলাম নীচে। ব্রহাম গাড়িতে চেপে রওনা হলাম ব্রায়োনি লজ অভিমুখে। যেতে যেতে হোমস বললে, আইরিন অ্যাডলারের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।

বলেন কী? কবে?

কালকে।

কার সঙ্গে?

উকিল গডফ্রে নর্টনের সঙ্গে।

কিন্তু আইরিন কি তাকে ভালোবাসে?

আশা করি বাসেন। আর বাসেন বলেই আপনাকে তিনি ভালোবাসেন না। তাই আপনার ভালোমন্দ নিয়ে তাঁর আর মাথা ব্যথাও থাকবে না।

বোবা হয়ে গেলেন গ্র্যান্ড-ডিউক। বিষাদাবরণে আবৃত রইলেন পথের বাকিটুকু। উদবেলিত আবেগ প্রকাশ করলেন না বাইরে।

ব্রায়োনি লজের সামনে গিয়ে দেখি দরজা খোলা, সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে একজন বুড়ি ঝি। আমাদের দেখেই তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, আপনিই কি মিস্টার শার্লক হোমস?

চমকে উঠল হোমস। বলল, হ্যাঁ, আমিই শার্লক হোমস।

দিদিমণি আজ ভোর পাঁচটা পনেরোর ট্রেনে চলে গেছেন। স্বামীকে নিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, আপনি আসতে পারেন।

সেকী! ইংলন্ড ছেড়ে গেছেন নাকি? ফ্যাকাশে হয়ে গেল হোমস। মনে হল এই বুঝি টলে পড়ে যাবে।

হ্যাঁ। আর ফিরবেন না।

কাগজপত্রগুলো! গলা ভেঙে গেল এ্যান্ড-ডিউকের।

ঝিকে ঠেলে সরিয়ে বসবার ঘরে ঢুকে পড়ল হোমস। তছনছ অবস্থা ঘরের, দেরাজগুলো খোলা, তাক ফাঁকা। ঘণ্টার দড়ির ওপরের দিলে তক্তাটা ভেঙে ফেলল হোমস। ভেতর থেকে বার করল একটা ফটো আর একটা চিঠি।

ফটোটা আইরিন অ্যাডলারের। চিঠিটা শার্লক হোমসের। খামের ওপরে তার নামের তলায় লেখা : শার্লক হোমস না-আসা পর্যন্ত যেন এ-চিঠি এখানেই থাকে।

একটানে খাম ছিড়ে ফেলল হোমস। রাত বারোটার সময়ে লেখা হয়েছে চিঠি। হুমড়ি খেয়ে একই সাথে পড়লাম তিনজনে :

ডিয়ার মিস্টার শার্লক হোমস,

আপনার কাজের ধারাই আলাদা–শতমুখে প্রশংসা করতে হয়। আগুন আগুন চিৎকার শোনার আগে পর্যন্ত বুঝিনি ফাঁদে পড়েছি। বুঝলাম যখন, তখন খটকা লাগল। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম ছবি উদ্ধারের জন্যে আপনার দ্বারস্থ হতে পারেন মহারাজ। তাই কোচোয়ানকে আপনার পাহারায় রেখে ওপরে গিয়ে পুরুষমানুষের ছদ্মবেশ ধরলাম। জানেন তো অভিনয় জিনিসটা আমি ভালোভাবেই রপ্ত করেছি এবং বহুবার দেখেছি পুরুষের ছদ্মবেশেই কাজ হয় বেশি।

আপনার পেছন ধরে বাড়ি পর্যন্ত এসে যখন দেখলাম সত্যিই আপনি শার্লক হোমস, তখন। বিবেচকের মতো গুড নাইট জানিয়ে তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে।

ঠিক করলাম, এ-রকম দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষর খপ্পর থেকে রেহাই পেতে হলে দেশ ছেড়ে চম্পট দেওয়া ছাড়া আর পথ নেই। তাই কাল সকালে এসে দেখবেন আমি নেই। ফটো নিয়ে দুর্ভাবনা করতে হবে না গ্র্যান্ড-ডিউককে। আমাকে ভালোবেসে যিনি বিয়ে করেছেন, তিনি ওঁর চাইতে উঁচু জগতের মানুষ। রাজা হয়ে আমাকে যে-আঘাত উনি দিয়েছেন, তার পালটা আঘাত আমি দেব না। তবে ছবিটাও দেব না। ভবিষ্যতের রক্ষাকবচ হিসেবে কাছে রাখব। তার বদলে অন্য একটা ছবি রেখে গেলাম, ইচ্ছে হলে উনি রাখতে পারেন।

বিশ্বস্ত
আইরিন নর্টন (অ্যাডলার)

উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন গ্র্যান্ড-ডিউক—মেয়ের মতো মেয়ে আমার রানি হওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু সমশ্রেণির নয়, এই যা দুঃখ।

উচ্ছ্বাস না-দেখিয়ে হোমস বললে, আমিও তাই দেখছি, উনি আপনার সমান শ্রেণির নন। আফশোস রয়ে গেল কেসটাকে এর চাইতে ভালোভাবে শেষ করা গেল না বলে।

বলেন কী! এর চাইতে ভালো শেষ আর হয় নাকি? আইরিন অ্যাডলার দু-কথা বলে না। ফটোটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও এত নিশ্চিন্ত থাকতাম না। বলুন কী পুরস্কার চান আপনি? এই

আংটিটা যদি দিই বলে আঙুল থেকে মরকত আংটি খুলে নিলেন গ্র্যান্ড-ডিউক।

আংটির চেয়েও দামি জিনিস কিন্তু রয়েছে আপনার কাছে?

কী বলুন তো?

এই ফোটোটা।

আইরিনের ফটো আপনি রাখবেন? বেশ তো নিন।

হেঁট হয়ে অভিবাদন জানিয়ে আমাকে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হল হোমস–পেছনও ফিরে দেখল না প্রতি-অভিবাদন জানাচ্ছেন গ্র্যান্ড-ডিউক।

এই ঘটনার পর থেকেই মেয়েদের বুদ্ধির দৌড় নিয়ে ব্যঙ্গ করা ছেড়ে দেয় হোমস।

——————

টীকা

১. বোহেমিয়ার কুৎসা-কাহিনি : আ স্ক্যান্ডাল ইন বোহেমিয়া প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এর জুলাই সংখ্যার স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বিশেষত আমেরিকার কাগজে এই গল্প উম্যানস উইট কিংবা দ্য কিংস সুইটহার্ট নামে প্রকাশিত হয়।

২. নতুন করে ডাক্তারি শুরু করার পর : হোমস-কাহিনিতে এর আগে যে ওয়াটসন ডাক্তারি করতেন, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এই গল্পের ঘটনা ১৮৮৮-র। আ স্টাডি ইন স্কারলেট প্রকাশিত হয় ১৮৮৭-তে। তখনও ওয়াটসন ডাক্তারি করতেন না। মাঝের সামান্য সময়টুকুর কথা অবশ্য জানা যায়নি।

৩. সুরাপাত্র : সে-যুগে সুরাপাত্র বলতে কাট-গ্লাসের বোতল বোঝাত।

৪. আয়োডোফর্ম : আইয়োডিন থেকে তৈরি এই যৌগিক বস্তুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং পরবর্তী যুগেও অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহৃত হত।

৫. সিলভার নাইট্রেট : কস্টিক গুণসম্পন্ন একটি রাসায়নিক যৌগ। সে-যুগে ব্যবহৃত হত অ্যান্টিসেপটিক এবং ডিসইনফেকট্যান্ট হিসেবে।

৬. উঁচু টুপি দেখে : ১৮১৯ সালে রেনে ল্যামেক আবিষ্কৃত স্টেথোস্কোপ বর্তমানে ব্যবহৃত স্টেথোস্কোপের মতো দেখতে ছিল না। ফাপা পাইপের তৈরি এই যন্ত্র ডাক্তাররা সাধারণত তাদের টপ-হ্যাটের ভেতরে রেখে দিতেন।

৭. কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার : সাইন অব ফোর উপন্যাসে শার্লক হোমসকে কন্টিনেন্টাল গেজেটিয়ার ব্যবহার করতে দেখা গিয়েছে।

৮. ইগ্রিয়া : পূর্বতন বোহেমিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ইগার (Eger) নদীর তীরবর্তী অঞ্চল ইগার। বর্তমানে উত্তর হাঙ্গেরিতে অবস্থিত ইগার শহর বিখ্যাত এখানকার রেড ওয়াইন বুলস ব্লাড-এর জন্য।

৯. বোহেমিয়া : প্রাচীন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলের দখল নিয়ে জার্মান এবং চেকদের দ্বন্দ্ব বহুদিনের। কয়লাখনির কারণে বোহেমিয়ার প্রশস্তি। ঊনবিংশ শতকের শেষে হোলি-রোমান সাম্রাজ্য বা অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় বোহেমিয়া। ১৯১৮ সালে এই অঞ্চল চেকোস্লোভাকিয়ার অধীনে আসে। বর্তমানে বোহেমিয়া চেক রিপাবলিকের অন্তর্গত।

১০. ব্রুহ্যাম : দুই বা চার আসনবিশিষ্ট হালকা এবং আচ্ছাদিত ঘোড়ায় টানা গাড়ি।

১১. গিনি : ইংলন্ডে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা গিনির বর্তমান যুগে প্রচলন নেই। এক গিনি একুশ শিলিঙের সমতুল। একসময়ে বিলাসদ্রব্য হিসেবে বা পেশাদার মানুষ, যেমন ডাক্তার, উকিল প্রভৃতির সাম্মানিক গিনিতে দেওয়া বা নেওয়ার চল ছিল।

১২. হারকিউলিস : গ্রিক উপকথার নায়ক হারকিউলিস ছিলেন অসীম শক্তিধর এবং বিশাল চেহারার অধিকারী।

১৩. ডিউক : সমসাময়িক ডিউকদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির সম্রাট ফ্রনজ যোসেফের একমাত্র পুত্র

আর্চডিউক রুডলফ এবং আর্চডিউক ফার্দিনান্দ।

১৪. ওয়ারশ : বর্তমানে পোল্যান্ডের রাজধানী এই শহর।

১৫. স্ক্যান্ডিনেভিয়া : সুইডেন এবং নরওয়ে, এই দুটি দেশ নিয়ে গঠিত স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায় হোমস কাহিনি দ্য ফাইনাল প্রবলেম এবং দ্য নোবল ব্যাচেলর গল্পে।

১৬. ল্যাংহ্যাম : ল্যাংহাম হোটেল খোলা হয় ১৮৬৩-র বারোই জুন। বর্তমান নাম ল্যাংহ্যাম হোটেল হিলটন। এখানে থাকবার ঘরের সংখ্যা ছ-শোরও বেশি।

১৭. সেন্ট জনস উড : সেন্ট জনস উড-এর দূরত্ব বেকার স্ট্রিট থেকে সামান্যই। এই অভিজাত পাড়ার বাসিন্দা ছিলেন লেখক জর্জ ইলিয়ট, থমাস হাক্সলি, জর্জ দ্য মরিয়ে প্রমুখ।

১৮. ক্যাবিনেট সাইজ : দৈর্ঘ্যে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চি এবং প্রস্থে প্রায় চার ইঞ্চি মাপের ছবিকে ক্যাবিনেট বলা হয়।

১৯. সেন্ট মনিকার গির্জে : এই নামটি কাল্পনিক। তবে এজওয়্যার রোডের কাছাকাছি ক্রিকলডাউনে অ্যাগনেস গির্জা, সেন্ট অ্যান্থনির গির্জা এবং সেন্ট সেভিয়ারের গির্জা অবস্থিত।

২০. পাদরির ছদ্মবেশ : কোনো চার্চের সঙ্গে যুক্ত পাদরির পোশাক পরে ঘুরে বেড়ানো সে-যুগে ইংল্যান্ডে অপরাধ হিসেবে গণ্য হত।

২১. ভাড়াটে অভিনেতা : কোনো কোনো সমালোচক এত কম সময়ে ভাড়াটে অভিনেতা সংগ্রহ করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

২২. আংটিটা যদি দিই : আ কেস অব আইডেন্টিটি গল্পে হোমসের কাছে একটি সোনার নস্যদানি দেখা গিয়েছে, সেটি নাকি বোহেমিয়ার এই রাজারই দেওয়া।

২৩. ফোটোটা : পরবর্তীকালে কখনো দেখা হলে আইরিন অ্যাডলারকে চিনতে পারার জন্য হোমস ফোটোটা রেখে দিয়েছিলেন এমনই মনে করেন কয়েকজন হোমস-গবেষক।

# রহস্য নিকেতন কপার-বীচেস

[দি অ্যাডভেঞ্চার অফ দ্য কপার-বীচেস]

শার্লক হোমস ছুঁড়ে ফেলে দিল ডেইলি টেলিগ্রাফের বিজ্ঞাপনের পাতাটা।

বললে, ওয়াটসন, আমারকীর্তি নিয়ে তুমি যখনই গল্প লিখেছ, সেগুলো গল্পইহয়ে দাঁড়িয়েছে–রং চড়ানোর দিকে নজর না-দিয়ে যুক্তিবিজ্ঞানের দিকে বেশি নিষ্ঠা দেখালে ভালো করতে।

কথা বলতে বলতে চেরি কাঠের পাইপটা ধরিয়ে নিল হোমস। তর্ক করার দরকার হলে এই পাইপ খায় ও, ধ্যানস্থ থাকার সময়ে ক্রে পাইপ।

কথা হচ্ছে বেকার স্ট্রিটের বাসায়। বাইরে বেশ ঠান্ডা পড়েছে। আগুনের দু-পাশে বসে আছি আমরা দুই বন্ধু। ব্রেকফাস্ট এইমাত্র শেষ হয়েছে। খবরের কাগজ খুলে এতক্ষণ বিজ্ঞাপন পড়ছিল হোমস, এখন তা নিক্ষেপ করে পেছনে লেগেছে আমার।

পাইপে টান মেরে বললে, একটা ব্যাপারে অবশ্য তোমার নিষ্ঠা আছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনা না-বেছে এমন সব কেস নিয়ে লিখছ যার মধ্যে যুক্তিবিদ্যার বিশ্লেষণী ক্ষমতা ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। তবে কী জানো, রং চড়াতে গিয়ে সেগুলো গল্পই হয়ে গেছে, নইলে যুক্তিবিজ্ঞানের প্রবন্ধ হয়ে দাঁড়াত।

হোমসের চরিত্রের এই অহমিকা এর আগেও লক্ষ করেছি। তাই মুখ গোঁজ করে বললাম, সামান্য ঘটনাগুলোই কিন্তু অসামান্য হয়ে উঠেছে তোমার যুক্তিবিদ্যার জোরে।

ভায়া, যুক্তিবিদ্যার কদর কি আর আছে? সাধারণ মানুষ আজকাল অন্ধ চোখ খুলে দেখেও। দাঁত দেখে তাতিকে চেনা অথবা বাঁ-হাতের আঙুল দেখে ছাপাখানার কম্পাোজিটর কিনা বলে দেওয়ার মতো বিশ্লেষণ বা অনুমিতি-সিদ্ধান্তর যুগ চলে গেছে। তোমার আর দোষ কী বল। আজকালকার অপরাধীরাও আর তেমন মৌলিক অপরাধ করতে পারছে না! আমার কাজটা এখন কারো পেনসিল হারালে খুঁজে দেওয়া, নয়তো স্কুলের মেয়েদের জ্ঞান দেওয়া। দুর! দুর! এই চিঠিটাই দেখ না কেন। নাও, পড়ো! দলা-পাকানো একটা কাগজ আমার দিকে ছুঁড়ে দিল হোমস।

কাগজটা একটা চিঠি। লেখা হয়েছে মন্টেগু প্লেস থেকে গত সন্ধ্যায়।

প্রিয় মি. হোমস,

আপনার সঙ্গে পরামর্শকতে চাই একটা চাকরি নেওয়ার ব্যাপারে। চাকরিটা গৃহশিক্ষয়িত্রীর। নেওয়াটা উচিত হবে কি না আপনি বলে দেবেন। কাল সকাল সাড়ে দশটায় আসছি।

আপনার বিশ্বস্ত

ভায়োলেট হান্টার

ভদ্রমহিলাকে চেনো? আমার প্রশ্ন।

না।

সাড়ে দশটা তো বাজল।

দরজার ঘণ্টাও বোধ হয় বাজল।

একটু পরেই ঘরে ঢুকল একজন তরুণী। চটপটে চেহারা। চোখে-মুখে বুদ্ধির ছাপ। বেশবাস সাদাসিধে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন। মুখটিতে টিটিভ পাখির ডিমের মতো মেচেতার দাগ।

অভিবাদন বিনিময়ের পর হোমসের হৃষ্ট মুখ দেখে বুঝলাম মেয়েটিকে তার খারাপ লাগেনি। আপাদমস্তক সন্ধানী চোখ বুলিয়ে নিয়ে অর্ধনিমীলিত চোখে আঙুলের ডগায় ডগায় চুইয়ে বললে, বলুন আপনার কী সমস্যা।

মেয়েটি বললে, গত পাঁচ বছর যেখানে গৃহশিক্ষয়িত্রীর কাজ করছিলাম, তারা আমেরিকায় চলে যাবার পর আমি এখন বেকার। তাই চাকরি জোটানোর একটা সংস্থায় প্রায় ফ্রি-হপ্তায় যাই। মিস স্টোপার সেখানকার কাজ দেখেন।

গত হপ্তায় গিয়ে দেখলাম মিস স্টোপারের সঙ্গে বসে রয়েছেন অসুরবিশেষ এক ভদ্রলোক। থুতনির নীচে চর্বির ভাঁজ, চোখে চশমা। মুখে দেখন-হাসি। আমাকে দেখেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

বাঃ এই তো পাওয়া গেছে! পরমোৎসাহ হাত ঘষতে ঘষতে বললেন মিস স্টোপারকে এঁকে দিয়েই কাজ হবে।

আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মিস, চাকরি চাই, তাই না?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গৃহশিক্ষয়িত্রীর?

হ্যাঁ।

কত মাইনে চাও। কর্নেল মনরো দিতেন মাসে চার পাউন্ড।

অ্যাঁ! মাসে চার পাউন্ড! কী অন্যায়! কী অন্যায়! সুন্দরী শিক্ষিতা একটা মেয়েকে এত কম মাইনেও কেউ দেয়?বলতে বলতে হাত ছুঁড়ে চেঁচিয়ে ভীষণ রাগে যেন ফেটে পড়লেন ভদ্রলোক।

কিন্তু আমি খুব একটা লেখাপড়া শিখিনি। ফরাসি আর জার্মান ভাষাটা একটু-আধটু জানি। সামান্য গান-বাজনা আর ছবি আঁকা—

আরে দুর। লেখাপড়ার চেয়ে বড়ো হল সহবত। সেইটা না-থাকলে ঘরের ছেলেকে যার তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় কি? এ জিনিস যার মধ্যে আছে, তার মাইনে কখনো বছরে এক-শশা পাউন্ডের কম হতে পারে না। তোমার মাইনেও তাই হবে। কি, রাজি?

মি. হোমস, আমার তখন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মতো অবস্থা বলতে পারেন। পকেট গড়ের মাঠ, দেনাও করে ফেলেছি। তা সত্ত্বেও এত টাকা মাইনের প্রস্তাব শুনে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারলাম না।

ভদ্রলোক তখন হাসতে হাসতে পকেট থেকে একটা নোট বার করে বললেন, আমার অভ্যেস হল মাইনের অর্ধেক টাকা আগাম দিয়ে দেওয়া। খরচপত্র আছে তো?চর্বির ভঁজের মধ্যে কুতকুতে চোখ দুটো প্রায় অদৃশ্য হয়ে এল হাসির ধাক্কায়। চোখ তো নয় যেন দুটো আলোকবিন্দু।

এমন চমৎকার ভদ্রলোক জীবনে দেখিনি। তবুও কীরকম অদ্ভুত মনে হচ্ছিল। ভাবলাম একটু বাজিয়ে নিই, আরও খবরাখবর নিয়ে।

জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম ভদ্রলোক থাকেন হ্যাম্পশায়ারে। মাইল পাঁচেক ভেতরে একটা গ্রামে। বাড়ি নাম কপার-বীচেস। তার দু-বছরের ছেলেকে সামলাতে হবে। ভারি দুষ্টু ছেলে।

কুতকুতে চোখে হাসতে হাসতে বললেন, কী বজ্জাত! কী বজ্জাত! চটি দিয়ে চটাচট আরশুলা মারাটা যদি দেখ।

বজ্জাতির ধরন শুনে আমার চক্ষু স্থির হয়ে এল। তারপরে চোখ কপালে উঠল ভদ্রলোকের বায়নাক্কা শুনে।

আমাকে তার স্ত্রী-র ফাইফরমাশ খাটতে হবে। তাতে আপত্তি করিনি। বড় খেয়ালি তাঁরা। তাই আমার খুশিমতো পোশাক পরা চলবে না—তাদের পছন্দমতো পোশাক পরতে হবে। অবাক হলেও তাও মেনে নিলাম। তারপর নাকি তাদের কথামতো এখন সেখানে বসতে হবে। এ-প্রস্তাবেও আপত্তির কিছু দেখলাম না। কিন্তু যখন বললেন স্ত্রী-র ইচ্ছেমতো আমার এই সুন্দর চুলের বোঝা ছেটে ফেলতে হবে, তখন বেঁকে বসলাম।

বললাম, তা কি হয়? আমার এই চুল দেখে শিল্পীরাও মুগ্ধ হয়ে যায়। এ-চুল তো ছাঁটতে পারব না।

ভদ্রলোক পলকহীন চোখে আমার দিকে চেয়ে ছিলেন। মুখখানা কালো হয়ে গেল আমার মাথানাড়া দেখে।

বললেন, মিস, ওইটাই কিন্তু আসল ব্যাপার। আমার গিন্নি গোঁ ধরেছে, ছোটো চুল রাখতে হবে গভর্নেসকে।

না, চুল ছাঁটতে আমি পারব না, বললাম শক্ত গলায়।

তাহলে আর হল না। সব পছন্দ হয়েছিল, তোমার মতো মেয়েই চাইছিলাম। যাক গে, মিস স্টোপার, দেখুন আর কাউকে পাওয়া যায় কি না।

এতক্ষণ মিস স্টোপার চুপ করে কথা শুনছিলেন। এবার বিরক্ত সুরে বললেন, আমি আর তোমার জন্যে চাকরি খুঁজতে পারব না। আসতে পার।

বাড়ি ফিরে এলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। সংসারে সবকিছুই বাড়ন্ত দেখলাম। ভাবলাম, দুর ছাই, চাকরিটা নিলেই হত। কী হবে চুল রেখে? চুল ছোটো করলে অনেককে বরং ভালোই লাগে। বছরে এক-শো পাউন্ড কি সোজা কথা! ঠিক করে ফেললাম, পরের দিন ফের ধরনা দেব মিস স্টোপারের কাছে।

তার আর দরকার হল না। পরের দিন একটা চিঠি এল সেই ভদ্রলোকের কাছ থেকে।

চিঠিখানা সঙ্গে এনেছি। শুনুন, পড়ছি।

কপার-বীচেস।

প্রিয় মিস হান্টার,

মিস স্টোপার তোমার ঠিকানা দিলেন। তুমি আর একবার ভেবে দেখ আমার চাকরি নেবে কি না। আমার খেয়াল মেটাতে গিয়ে তোমার চুল কাটতে হবে ঠিকই তার খেসারতও পাবে। বছরে এক-শো বিশ পাউন্ড দেব। বিদ্যুৎ-নীল রঙের পোশাক আমার স্ত্রীর খুব পছন্দ। খামোোকা কিনে টাকা খরচ করবার দরকার নেই। আমার মেয়ে অ্যালিস এখন ফিলাডেলফিয়ায় গেছে–তার পোশাকটা তোমাকে ফিট করবে। সকাল বেলা পরবে এই পোশাক। মাঝে মাঝে এখানে সেখানে বসবে কোনো অসুবিধে তোমার হবে না। ছেলের সম্বন্ধে খুব একটা ভাবতে হবে না। খুব হালকা কাজ, উইনচেস্টারে এক-ঘোড়ায় টানা গাড়ি নিয়ে হাজির থাকব। কোন ট্রেনে আসছ, জানাও।

তোমার বিশ্বস্ত<br>
জেফ্রো রুকাসল

মি. হোমস, চিঠিটা পেয়ে ভাবছি, চাকরিটা নেব। কিন্তু তার আগে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই।

মিস হান্টার, বলল শার্লক হোমস, আমার কোনো বোনকে বলব না এই পরিবেশে চাকরি নিতে। পরিবেশটা আর যাই হোক, কোনো তরুণীর পক্ষে অনুকূল নয়। বিপদ আছে।

কীসের বিপদ?

তা তো এখুনি বলতে পারব না। ভদ্রলোকের বউ পাগল নন তো? উদ্ভট খেয়াল মেটানোর জন্যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না তো?

হতে পারে। আমি শুধু ভাবছি বছরে চল্লিশ পাউন্ড দিলেই যখন গভর্নেস পাওয়া যায়, তার তিনগুণ টাকা খরচ করা হচ্ছে কেন। নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।

সেইরকম যদি কিছু বুঝি, আপনাকে চিঠি লিখলে আপনার সাহায্য পাব?

এক-শো বার। আপনার কেসটা সত্যিই ইন্টারেস্টিং। যখনই আপনার টেলিগ্রাম পাব, দৌড়ে যাব, কথা দিলাম।

মিস হান্টারের মুখ থেকে মেঘের ভার সরে গেল। চট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আজ রাতে আমি চুল ছেটে ফেলছি। কাল রওনা হব উইনচেস্টার। চললাম।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল চটপটে পদশব্দ। আমি বললাম, চালাক মেয়ে। নিজেকে সামলাতে জানে।

তা ঠিক, গম্ভীর মুখে হোমস বললে, তবে ওর টেলিগ্রাম শিগগিরই আসবে। বিপদ আসন্ন।

বিপদটা যে কী, তা হোমস মেয়েটির কাছে ভাঙেনি, আমার কাছেও বলল না। তবে সেইদিন থেকেই প্রায়ই দেখতাম ভুরু কুঁচকে কী যেন ভাবছে! ভাবনাটা আমার মনেও যে আনাগোনা করেনি, তা নয়। যার খপ্পরে গিয়েছে মিস হান্টার, সে শয়তান না সাধু কিছুই আঁচ করতে পারতাম না। মনটা কিন্তু অস্থির হয়ে থাকত। হোমসকে জিজ্ঞেস করলে অস্থির হয়ে হাত ছুঁড়ে বলত, দুর! ঘটনা ছাড়া সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় নাকি? তবে কী জানো, আমার বোনকেও আমি যেতে দিতাম না।

হোমসের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল পনেরো দিন পর। গভীর রাতে টেলিগ্রাম এল হোমসের নামে।ও তখন ওর নৈশ গবেষণার জন্যে তৈরি হচ্ছে। বকযন্ত্র আর টেস্টটিউব সাজাচ্ছে রাসায়নিক বিশ্লেষণ নিয়ে রাত কাটিয়ে দেবে বলে। এমন সময়ে এল টেলিগ্রামটা।

হোমস চোখ বুলিয়ে নিয়ে গবেষণার সরঞ্জাম সরিয়ে রেখে বললে, আজ রাতে ঘুম চাই–কাল অনেক ঝামেলা আছে। ওয়াটসন, উইঞ্চেস্টারের ট্রেন ক-টায়?

টাইমটেবল দেখে বললাম, সকাল সাড়ে নটায়।

টেলিগ্রামটা পড়লাম। লেখা আছে : কাল দুপুরে উইঞ্চেস্টারের ব্ল্যাক সোয়ান হোটেল-এ আসবেন। সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। হান্টার।

পরদিন সকাল এগারোটায় চলে এলাম প্রাচীন ইংলন্ডের রাজধানীতে ট্রেনে খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে বসে ছিল হোমস। হ্যাম্পশায়ার পেরিয়ে আসার পর কাগজের ভাঁই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নিসর্গ দৃশ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল। বসন্তের সাজে প্রকৃতি সেজেছেও চমৎকার। নীল আকাশ, সাদা মেঘ, মিষ্টি রোদ। চারিদিকে কেবল সবুজ পাতার সমারোহ—ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে খামার বাড়ির ছাদ।

বেকার স্ট্রিটের দম আটকানো কুয়াশা থেকে এই মন মাতানো পরিবেশে পড়ে পুলক জাগল আমারও চিত্তে। সোল্লাসে বললাম, হোমস, কী সুন্দর বল তো? সব টাটকা, তাজা, নতুন।

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস। মাথা নেড়ে বললে, ভায়া, শহরে ক্লেদ আছে, কিন্তু আইন ভাঙা সেখানে কঠিন। এখানে প্রকৃতির উদারতার মধ্যে নৃশংস কাণ্ড ঘটে গেলেও কেউ টের পাবে না। মেয়েটা উইঞ্চেস্টারে থাকলে এতটা ভাবনা হত না–পাঁচ মাইল ভেতরে গ্রামের মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটতে পারে।

কী ঘটতে পারে বলে মনে হয় তোমার?

মোট সাতটা সম্ভাবনা ভেবে রেখেছি। দেখা যাক কোনটা সত্যি।

ব্ল্যাক সোয়ান সরাইখানাটা হাইস্ট্রিটের ওপরে–স্টেশনের কাছেই। মিস হান্টার আমাদের জন্যে লাঞ্চ সাজিয়ে বসে ছিল।

আমরা যেতেই বললে, আঃ, বাঁচলাম আপনাদের দেখে। মি. রুকাসলকে বলে এসেছি তিনটের মধ্যে ফিরব। উনি অবশ্য জানেন না কেন এসেছি।

আগুনের সামনে লম্বা ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে হোমস বললে, বলুন কী দেখলেন?

মি. হোমস, প্রথমেই বলে রাখি মি. রুকাসল আমার সঙ্গে মোটেই খারাপ ব্যবহার করেননি। কিন্তু ওঁদের মতিগতি মাথায় ঢুকছে না।

খুলে বলুন।

মি. রুকাসল নিজে গাড়ি হাঁকিয়ে কপার-বীচেস-এ নিয়ে গেলেন আমাকে। বাড়িটা চৌকোনা পুরোনো। তিন দিকের জঙ্গল লর্ড সাদাম্পটনের সম্পত্তি। একদিকের জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে সাদাম্পটন রোেড বড়োরাস্তা পর্যন্ত রাস্তাটা কিছুদূর গিয়ে বাঁক নিয়েছে।

বাড়িতে গিয়ে ছেলে বউয়ের সঙ্গে আলাপ করার পর বুঝলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়– মিসেস রুকাসল মোটেই পাগল নন। তবে যেন মনে চাপা দুঃখ আছে। চুপচাপ থাকেন। কখনো কখনো গালে হাত দিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবেন। সবসময়ে চোখে চোখে রাখেন স্বামী আর ছেলেকে। দুজনেই যেন নয়নের মণি। মাঝে মাঝে কঁদতেও দেখেছি। স্বামী ভদ্রলোক একটু রুক্ষ হলেও স্ত্রীকে যত্নে রাখেন। গিন্নির এত ভাবনা বোধ হয় ছেলেটার জন্যে। ভারি বদ ছেলে। নিষ্ঠুর। হেঁড়ে মাথা, বেঁটে, গোঁয়ার। ইতর প্রাণীকে কষ্ট দিয়ে বিকট উল্লাস পায়। আদর দিয়ে বাঁদর করা ছেলে।

ভদ্রলোক বিপত্নীক ভদ্রমহিলা তার দ্বিতীয় পক্ষ। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান পনেরো বছর পঁয়তাল্লিশ আর তিরিশ। প্রথম পক্ষের একমাত্র মেয়ে ফিলাডেলফিয়ায় চলে গেছে সম্মা-র সঙ্গে বনিবনা হয়নি বলে। বয়সের ব্যবধান খুবই তো কম। মেয়েটির বয়স কুড়ি। খবরটা মি. রুকাসলই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলেছেন। দ্বিতীয় পক্ষ সংসারে এসেছে বছর সাতেক। খুব শান্ত মহিলা।

বাড়িতে ঝি-চাকরের পাট প্রায় নেই বললেই চলে। প্রথম থেকেই খটকা লেগেছে এই নিয়ে। আছে কেবল দুজন—টলার আর তার বউ। টলার লোকটা চোয়াড়ে, চুলদাড়ি খোঁচা খোঁচা, অষ্টপ্রহর মাতাল। বউটা মদ্দা টাইপের কিন্তু মুখটা সবসময়ে নিমতেতো। বাড়ির গিন্নির মতোই চুপচাপ থাকা স্বভাব। এদের সান্নিধ্য মোটেই সুখের নয়।

বাড়িতে এসে দু-দিন ভালোই কাটল। তৃতীয় দিন ব্রেকফাস্ট খাওয়ার পর কর্তার কানে কানে কী যেন বললেন গিন্নি।

হাসিমুখে আমার দিকে ফিরে কর্তা বললেন, মিস হান্টার, তুমি আমাদের কথা রেখেছ–চুল ঘেঁটে ফেলেছ। চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু। এবার আর একটা কথা রাখো। তোমার বিছানায় ইলেকট্রিক ব্লু কালারের একটা ড্রেস দেখতে পাবে। যাও, পরে এসো।

ঘরে গিয়ে দেখলাম সত্যিই অদ্ভুত সুন্দর একটা পোশাক রয়েছে খাটে। গায়ে দিতে চমৎকার ফিট করে গেল–যেন আমার মাপেই তৈরি।

এলাম বসবার ঘরে।এ-ঘরটা বাড়ির সামনের দিকে। পাশাপাশি তিনটে মেঝে পর্যন্ত নামানো বিরাট কাচের জানলা আছে সাদাম্পটন রোডের দিকে! মাঝের জানলাটার সামনে পেছন করে বসানো চেয়ারে বসতে বলা হল আমাকে। আমার সামনে দিয়ে পায়চারি করতে করতে মজার মজার হাসির গল্প বলতে লাগলেন মি. রুকাসল। হাসতে হাসতে পেটে খিল লেগে যাবার উপক্রম হল। গিন্নি কিন্তু রামগরুড়ের ছানার মতো চুপচাপ বসে রইলেন চেয়ারে। ভাবগতিক দেখে মনে হল যেন উদবেগে ভুগছেন।

ঘণ্টাখানেক পরে উঠিয়ে দেওয়া হল আমাকে। ড্রেস পালটে ছেলে দেখাশুনা করতে গেলাম।

দু-দিন পরে আবার হুকুম হল নীলবসনা হয়ে জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসবার। এবারও হাসির গল্প শুনিয়ে হাসিয়ে ছাড়লেন মি. রুকাসল। শেষকালে একটা হলদে

মলাটের বই হাতে দিয়ে মাঝখান থেকে কয়েক পাতা পড়ে শোনাতে বললেন। একটু পড়বার পরেই উনি আমাকে উঠিয়ে দিলেন–পোশাক পালটে নিতে বললেন।

লক্ষ করেছি, কিছুতেই জানলার দিকে মুখ ফেরাতে দেওয়া হয় না আমাকে পেছনে কী ঘটছে দেখতে দেওয়া হয় না। তাই বিষম কৌতূহল হল। অদ্ভুত ব্যাপারটার মানে জানবার জন্য ভেতরটা আকুলিবিকুলি করতে লাগল। পরের বার নীলবসনা হয়ে বসবার সময়ে রুমালের মধ্যে লুকিয়ে রাখলাম ভাঙা আয়নার একটা টুকরো। কথার ফাঁকে ফাঁকে রুমাল তুলে ধরলাম চোখের সামনে। প্রথমটা কিছু দেখিনি। দ্বিতীয়বার দেখলাম, বাড়ির জমির রেলিংয়ে ভর দিয়ে সাদাম্পটন রোডে একজন দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় কত লোক যাচ্ছে—এ কিন্তু চলে যাচ্ছে না–ঠায় তাকিয়ে আছে এদিকে। গায়ে ছাই রঙের পোশাক, আকারে ছোটোখাটো।

মিসেস রুকাসল খরখরে চোখে চেয়েছিলেন আমার দিকে। মনে হল রুমালের মধ্যে লুকোনো আয়না উনি দেখে ফেলেছেন। কর্তাকে বললেন, দেখ দেখ, রাস্তার একটা লোক প্যাট প্যাট করে চেয়ে আছে মিস হান্টারের দিকে।

তাই নাকি? মিস হান্টারের বন্ধু নয় তো?

আজ্ঞে না। এখানকার কাউকেই চিনি না আমি।

তাহলে বাজে লোক। তুমি এইভাবে হাত নেড়ে বিদেয় করো ওকে।

রাস্তায় কে দাঁড়িয়ে আছে, তা নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার কী? উনি কিন্তু পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। উনি যেভাবে দেখালেন, সেইভাবে হাত নাড়ালাম। সঙ্গেসঙ্গে জানলার পরদা টেনে দিলেন গিন্নি ঠাকরুন। এই গেল সাতদিন আগেকার ঘটনা। এরপর আর জানলায় নীল ড্রেস পরে বসতে হয়নি।

ইন্টারেস্টিং কেস, বলল হোমস। তারপর?

প্রথম যেদিন কপার-বীচেস-এ গেলাম, সেদিন মি. রুকাসল আমাকে বারবাড়ির রান্নাঘরের পাশে একটা ছোটো ঘরের সামনে নিয়ে গেছিলেন। ভেতর থেকে শেকল নাড়ার ঝনঝন শব্দ শুনলাম, সেইসঙ্গে একটা জন্তুর চলাফেরার খচমচ শব্দ।

তক্তার ফাঁক দিয়ে ভেতরে তাকাতে বললেন মি. রুকাসল। তাকিয়েই রক্ত হিম হয়ে গেল। অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে যেন দু-টুকরো আগুন–একজোড়া চোখ।

মিষ্টি করে হাসতে হাসতে মি. রুকাসল বললেন, ওই হল আমার আদরের ডালকুত্তা–কার্লো। একবেলা খাইয়ে রাখা হয়–পেটে সবসময়ে খিদে থাকে মানুষ পেলেই যাতে ছিঁড়ে খেতে পারে। রাত্রে টলার ওকে ছেড়ে দেয়। তাই বলে রাখি, সন্ধের পর বাড়ির বাইরে পা দিয়ো না। টলার ছাড়া ওকে সামাল দিতে পারে না কেউ।

কথাটা যে মিথ্যে নয়, দু-দিন পরে চাদের আলোয় রাত দুটোর সময়ে বাগানের দিকে তাকিয়ে তার প্রমাণ পেলাম। দাঁড়িয়ে ছিলাম জানলার সামনে। এ-বাড়ির কপার বীচেস নাম হয়েছে তামাটে পাতাওলা কপার বীচেস গাছের জন্যে গাছটা আছে বাড়ির একদম সামনে। তারই ছায়ায় বাছুরের মতো বড়ো কী যেন একটা নড়তে দেখলাম। তারপরেই চাদের আলো পড়ল কালো ছায়াটার ওপর। একটা দানব কুকুর। ঝুলন্ত চোয়াল, কালচে নাক, কপিশ বর্ণ। প্রকাণ্ড হাড়গুলো যেন ঠেলে বেরিয়ে আছে। ভয়ংকর সেই আকৃতি দেখে রাতে ভালো করে ঘুমোতেও পারলাম না।

এরপর আর একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। আগের চাইতেও আশ্চর্য। লন্ডনে চুল হেঁটে ফেলে কাটা চুলগুলো আমার ট্রাঙ্কের তলায় রেখে দিয়েছিলাম।একদিন সন্ধেবেলা ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়লে আমার ঘরের জিনিসপত্র গোছাতে গিয়ে দেওয়ালের একটা দেরাজে তালা দেওয়া দেখলাম। অন্য দুটো দেরাজ খোলা ছিল। তাতে আমার জামাকাপড় রাখার জায়গা কুলোত না। তাই ভাবলাম এ-দেরাজটা যদি ভোলা যায় বাড়তি জামাকাপড় রাখা যাবে। চাবির গোছার একটা চাবি লেগেও গেল। ভেতর থেকে পেলাম সেই কাটা চুলের বোঝা।

আমি তো অবাক। বেশ মনে আছে আমার চুল আছে আমারই ট্রাঙ্কে–এখানে এল কী করে?

খুললাম আমার তোরঙ্গ। আমার চুল যথাস্থানেই আছে। বার করে এনে রাখলাম দেরাজে পাওয়া চুলের পাশে। মি. হোমস, বললে বিশ্বাস করবেন না–দুটো চুলই একরকম। একরকম বেণী, একইরকম রং।

এ কী রহস্য! হাত কাঁপতে লাগল আমার। বেশ বুঝলাম, এ-রহস্য যাতে আমি টের না-পাই, তাই দেরাজে ছিল। খোলাটা অন্যায় হয়েছে। কাউকে বলাটাও ঠিক হবে না।

এর পরের ঘটনাও কম অদ্ভুত নয়। আমি যা দেখি, ভালো করেই দেখি। দেখার ব্যাপারে চোখ আমার ধারালো। কপার-বীচেস বাড়িটার একপাশে একটা অংশে কেউ থাকে না গোড়া থেকেই লক্ষ করেছি। টলার-দম্পতি যেখানে থাকে, তার পাশ দিয়ে সেদিকে যেতে হয়। সবসময়ে তালা ঝোলে অংশটায়। একদিন এই দরজা দিয়েই রাগে থমথমে মুখে মি. রুকাসলকে বেরিয়ে আসতে দেখলাম–হাতে চাবি। দরজায় তালা দিয়ে আমার পাশ দিয়ে হনহন করে চলে গেলেন কথাও বললেন না।

কৌতূহল হল। সেইদিকের অংশটা ঘুরে দেখতে গিয়ে খটকা লাগল। পেছনে চারটে জানলা। তিনটেতে ধুলোবালি জমে প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে আর একটায় কেবল খড়খড়ি দেওয়া। পায়চারি করছি আর জানলা দেখছি, এমন সময়ে হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন মি. রুকাসল–কিছুক্ষণ আগেকার সেই গনগনে রাগের চিহ্নমাত্র নেই মুখে।

বললেন, তখন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারিনি, কিছু মনে করনি তো?

আমি বললাম, না না। মনে করব কেন? কিন্তু এইদিকে কতকগুলো ঘর খালি পড়ে রয়েছে দেখছি–একটাতে আবার খড়খড়ি তোলা।

ভদ্রলোক চমকে উঠলেন আমার কথা শুনে।তৎক্ষণাৎ অবশ্য সামলে নিলেন। বললেন, ফটো তোলার শখ আছে তো। ওই হল ডার্করুম। কিন্তু তোমার তো দেখছি সবদিকেই চোখ। আশ্চর্য। খুবই আশ্চর্য! কথার স্বরে স্পষ্ট সন্দেহ আর বিরক্তি চোখে কপট হাসি।

বেশ বুঝলাম উনি চান না তালা দেওয়া অংশ নিয়ে মাথা ঘামাই। ফলে, কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। দেখতেই হবে কী আছে ও-ঘরে। শুধু মি. রুকাসল নন, তার স্ত্রীকেও ভেতরে ঢুকতে দেখেছি–একদিন টলারকেও দেখেছি থলি হাতে চৌকাঠ পেরোতে।

সুযোগ পেলাম হঠাৎ গতকাল। মাতাল টলার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তালা দিতে ভুলে গেছিল। কর্তা গিন্নি আর ছেলেটাও নীচে। ধাঁ করে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

সামনে একটা লম্বা করিডর। শেষের দিকে বাঁক নিয়েছে। সেখানে পাশাপাশি তিনটে ঘর। দু-পাশের ঘর দুটোর দরজা খোলা–ভেতরে অন্ধকার আর ধুলো। মাঝের দরজাটা লোহার খিল দিয়ে বন্ধ করা এবং কড়ায় তালা দেওয়া! পাল্লার নীচে আলো দেখা যাচ্ছে। এটাই সেই ঘর যার খড়খড়ি তোলা থাকে। আলোটা আসছে বোধ হয় স্কাইলাইট দিয়ে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঘরের রহস্য নিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি, এমন সময় স্পষ্ট পায়ের আওয়াজ শুনলাম ঘরের ভেতরে। পাল্লার নীচে আলোয় যেন কার ছায়াও পড়ল।

সাংঘাতিক ভয়ে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এলাম বাইরে—আছড়ে পড়লাম মি. রুকাসলের দু-বাহুর মধ্যে।

মিষ্টি হেসে বললেন, ধরেছি ঠিক। দরজা খোলা দেখেই ভেতরে ঢুকে পড়েছ?

উঃ ভীষণ ভয় পেয়েছি।

কীসের ভয় মিস হান্টার?ভাবতে পারবেন না কী আশ্চর্যনরম সুরে বললেন মি. রুকাসল– আদর আর ভালোবাসা যেন ঝরে পড়ল প্রতিটি শব্দ থেকে।

শুনেই আমি হুঁশিয়ার হলাম। বেশি মোলায়েম হাত গিয়ে ন্যাকামিটা নিজেই ধরিয়ে দিয়েছেন মি. রুকাসল। মেকি আদর–সাচ্চা নয়।

বললাম, বড্ড অন্ধকার। গা শিরশির করে উঠেছিল! এই দেখুন না কেন এখনও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

ব্যস? শুধু এই? ধারালো চোখে আমার মুখ দেখতে দেখতে বললেন মি. রুকাসল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার কী?

দরজা বন্ধ রাখি কেন জান?

না তো।

পরের ব্যাপারে যারা নাক গলায় তাদের জন্যে।

আমি তো জানতাম না—

এখন জেনেছ। ফের যদি দেখি এদিকে এসেছ–বলতে বলতে মুখটা পিশাচের মতো হয়ে গেল। দাঁতে দাঁত পিষে ভীষণ চোখে তাকিয়ে বললেন, ওই ডালকুত্তার সামনে তোমাকে ফেলে দেব।

এমন ভয় পেলাম যে বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। দৌড়ে এসে অজ্ঞানের মতো পড়ে গেলাম বিছানায়। অনেকক্ষণ পরে সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আপনার কথা মনে পড়ল। এই শত্রুপুরীতে কেউ আমার আপন নয়–এমনকী দু-বছরের বাচ্চাটাও আমার অমঙ্গল চায়। আমাকে বাঁচাতে পারেন কেবল আপনি। তাই তক্ষুনি চুপি চুপি চলে গেলাম আধ মাইল দূরে পোস্টাপিসে–টেলিগ্রাম পাঠালাম আপনাকে। টলার মদের ঝোঁকে তখন অজ্ঞান বললেই চলে–সেইজন্যে যাওয়ার সাহস পেলাম–ও ছাড়া ডালকুত্তাকে ছেড়ে দেওয়ার ক্ষমতা কারোর নেই। বাড়ি ফিরে রাতটা প্রায় না-ঘুমিয়েই কাটালাম। আজ ছুটি নিয়ে এসেছি তিনটে পর্যন্ত। সন্ধ্যায় কর্তা গিন্নি কোথায় যাবেন–বাড়ি থাকবেন না। বাচ্চাটাকে আমি একাই দেখব। মি. হোমস, সব তো শুনলেন, এবার বলুন এই অদ্ভুত কাণ্ডকারখানার মানে কী?

এই বিচিত্র কাহিনি শুনলাম আমি আর হোমস মন্ত্রমুগ্ধের মতো। তারপর পকেটে হাত পুরে গম্ভীর মুখে পায়চারি করতে করতে বন্ধুবর শুধোল, টলার এখনও মদে বেঁহুশ?

হ্যাঁ।

মিস্টার অ্যান্ড মিসেস রুকাসল? সন্ধের পর বাড়ি থাকছেন না?

না।

তাহলে একটা কাজ করুন। মিসেস টলারকে কোনো একটা ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিন। কুকুরটাও ছাড়া থাকছে না। সেই ফাঁকে আমরা দুই বন্ধু গিয়ে খানাতল্লাশ করে দেখি রহস্যটা কদ্দূর দানা বেঁধেছে। মিস হান্টার, আমি এই মুহূর্তে যা বুঝেছি, তা এই : আপনি এসেছেন অ্যালিস মেয়েটার ভূমিকায় অভিনয় করতে। অ্যালিসকে দেখতে মোটামুটি আপনার মতো চুল একরকম। নাছোড়বান্দা কাউকে ধোঁকা দেওয়ার জন্যে আপনাকে তারই পোশাক পরিয়ে বসানো হয় জানলার সামনে পিঠ ফিরিয়ে। ছিনেজোঁক এই লোকটা হয় অ্যাসিসের বন্ধু নয় তা হবু-বর। অ্যালিস আমেরিকায় গেছে, এই কথা রটানো রয়েছে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যে। আপনার ইশারা দেখে ছিনেজোঁকটি যাতে নিশ্চিন্ত থাকে এই হল অ্যালিসের বাবার মতলব। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হচ্ছে দু-বছরের বাচ্চাটা সম্বন্ধে যা শুনলাম।

বাচ্চাটা আবার কী করল? আমি তো অবাক।

ভায়া, বাচ্চাটা কিছু করেনি–কিন্তু বাচ্চার চরিত্র বিচার করে বাপ-মায়ের চরিত্র আঁচ করা যায়। সন্দেশ দেখে যেমন ছাঁচ কীরকম জানা যায়—এও সেইরকম। ওইরকম উৎকট বিকট নিষ্ঠুরতা যার চরিত্রে জন্মসূত্রে বাসা নিয়েছে তার বাপ অথবা মা নিশ্চয় দয়ালু যিশু নয়। মাকে বাদ দিলাম–বাপ সম্বন্ধে যা শুনলাম, তাতে মনে হয় লোকটা অমানুষিক নৃশংস। একটি মেয়েকে তিনি যন্ত্রণা দিচ্ছেন–তাকে বাঁচাতে হবে।

সন্ধ্যা সাতটার সময়ে হাজির হলাম কপার-বীচেস ভবনে। সামনেই সেই গাছ। তামাটে পাতা চকচক করছে পড়ন্ত সূর্যের আলোয়। মিস হান্টার সদর দরজা থেকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদের নিয়ে গেল ভেতরে।

বলল, দুমদাম আওয়াজ শুনছেন? মিসেস টলারকে ভাড়ার ঘরে আটকে রেখেছি। বুড়ো টলার এখনও বেহুঁশ। এই নিন মি. রুকাসলের চাবির নকল।

হোমস বললে, ভালোই হল। চলুন কোথায় যেতে হবে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে দরজা খুললাম। অন্ধকার করিডর বেয়ে বন্ধ দরজার সামনে পৌঁছোলাম। লোহার পাতটা দরজার সামনে থেকে সরিয়ে নিল হোমস, কিন্তু চাবি ঘুরিয়েও তালা খুলতে পারল না। ভেতর থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সব নিস্তব্ধ।

মুখটা কালো হয়ে গেল হোমসের। বিড়বিড় করে বললে, দেরি করে ফেললাম নাকি! ওয়াটসন, কঁধ লাগাও।

দুই বন্ধু মিলে চাপ মারলাম জীর্ণ দরজায়। মচ মচাৎ শব্দে কবজা থেকে ঠিকরে গেল পাল্লা। হুড়মুড় করে ঢুকলাম ভেতরে। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না। একটা টেবিল আর বাক্সভরতি কিছু পোশাক ছাড়া কিচ্ছু নেই ঘরে। স্কাইলাইট খোলা।

লাফ দিয়ে কড়িকাঠের কাছে উঠে স্কাইলাইট ধরে ঝুলতে ঝুলতে হোমস বললে, বাইরে একটা দড়ির মই ঝুলছে দেখছি। পিশাচ বাপ মেয়েকে এদিক দিয়েই সরিয়েছে মনে হচ্ছে। বাইরে যাওয়ার নাম করে বাইরে থেকেই সেরেছে কাজ। ধড়িবাজ শয়তান কোথাকার, ঠিক এই সময়ে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল সিঁড়িতে।

চাপা গলায় হোমস বললে, ওয়াটসন, মি. রুকাসল আসছেন মনে হচ্ছে। পিস্তলটা হাতে রাখো। লোক কিন্তু খুব খারাপ।কথা শেষ হতে-না-হতেই দরজায় আবির্ভূত হল ভীষণ মোটা বিশালদেহী এক পুরুষ, হাতে একটা মোটা লাঠি। দেখেই আর্ত চিৎকার করে উঠে দেওয়ালে সিটিয়ে গেল মিস হান্টার। এক লাফে লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিন্তু স্বয়ং শার্লক হোমস।

জানোয়ার কোথাকার! কোথায় আপনার মেয়ে?

ঘরময় চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্কাইলাইটের দিকে তাকাল মোটকা লোকটা।

বলল বজ্র হুংকারে, তবে রে! ওপরচালাকি হচ্ছে! আমাকেই আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে। চোর কোথাকার। কোথায় সরিয়েছিস ওকে? দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোদের মজা! বলেই করিডর দিয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল নীচে।

কুকুর আনতে গেল যে! ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মিস হান্টার।

আসুক না, আমার রিভলভার তো রয়েছে, অভয় দিলাম আমি।

সামনের দরজাটা বন্ধ করে দিই চলো, বলেই ঘর থেকে ছিটকে গেল হোমস। তিনজনেই সিঁড়ি বেয়ে ঝড়ের মতো নেমে এলাম নীচে। হল ঘরে পৌঁছোতে-না-পৌঁছোতেই শুনলাম কুকুরের গুরুগম্ভীর গর্জন–পরমুহূর্তেই একটা তীব্র যন্ত্রণাময় আর্ত চিৎকার—রক্ত-জল-করা সেই ভয়ংকর চিৎকার কান পেতে শোনাও যায় না। একজন লাল মুখখা বয়স্ক পুরুষ টলতে টলতে বেরিয়ে এল পাশের একটা দরজা দিয়ে।

সর্বনাশ। কে ছাড়ল কুকুরটাকে। দু-দিন খাওয়ানো হয়নি যে! তাড়াতাড়ি চলুন, তাড়াতাড়ি।

হোমস আর আমি তিরবেগে বেরিয়ে এলাম বাইরে, বাড়ির কোণ ঘুরে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োলাম শব্দ লক্ষ করে পেছন পেছন ছুটে এল টলার। দূর থেকেই দেখতে পেলাম

ভয়ংকরদর্শন উপপাসি দানব কুকুরটাকে কালো নাক ঠেকে রয়েছে রুকাসলের গলার ওপর মাটিতে পড়ে যন্ত্রণায় পাকসাট দিচ্ছেন–রুকাসল–বিকট চিৎকারে খানখান হয়ে যাচ্ছে রাত্রি। কাছে গিয়েই নির্ভুল লক্ষ্যে ঘিলু বার করে দিলাম ডালকুত্তার–সাদা দাঁত তখনও কামড়ে রইল ঘাড়ের থাক থাক চর্বি। অতি কষ্টে চোয়াল ছাড়িয়ে মুমূর্মুকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এলাম বাড়ির মধ্যে। প্রাণটা পুরোপুরি বেরোয়নি কিন্তু কাঁধের অবস্থা চোখ মেলে দেখা যায় না–এমনি ভয়াবহ। সোফায় শুইয়ে সেবাশুশ্রুষায় মন দিলাম আমি–টলারকে পাঠালাম বউকে খবর দিতে।

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল লম্বা, অস্থিসর্বস্ব শুকনো চেহারার একজন স্ত্রীলোক।

মিসেস টলার! অস্ফুট কণ্ঠে বললে মিস হান্টার।

হ্যাঁ, মিস। মি. রুকাসল আপনার সন্ধানে যাওয়ার আগে ঘর থেকে বের করে দিয়ে গেছিলেন আমাকে। আরে মিস, আমাকে বললেই তো হত আপনাদের আসল মতলব। এত ঝামেলার মধ্যে তাহলে আর যেতে হত না।

তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে শার্লক হোমস বললে, তাই বল। মিসেস টলার দেখছি কেউ যা জানে , তাও জানে।

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি সবই জানি। বলতেও এক পায়ে খাড়া আছি।

তাহলে বসে পড়ো। কয়েকটা জায়গা ভালো বুঝিনি–খোলসা করে দাও দিকি বাপু।

নিশ্চয় দেব। ঘরে ঢুকিয়ে শেকল তুলে দেওয়ার আগে যদি জিজ্ঞেস করতেন, সব বলতাম। আদালত পর্যন্ত যদি গড়ায় ব্যাপারটা, খেয়াল রাখবেন আপনাদের এই বান্ধবীটির সত্যিকারের বন্ধু আমি–মিস অ্যালিসও কিন্তু আমার বড়ো বন্ধু।

দ্বিতীয় বিয়ের পর থেকেই এ-বাড়িতে সুখে থাকতে পারেনি অ্যালিস। লাঞ্ছনা মুখ বুজে সয়ে গেছে! অত্যাচার চরমে উঠল মি. ফাউলারের সঙ্গে তার আলাপ হওয়ার পর। উইল অনুসারে অ্যালিসও বেশ কিছু টাকাকড়ি পায় কিন্তু অ্যাদ্দিন কোনো কথা বলেনি–সব ছেড়ে দিয়েছিল মি. রুকাসলের হাতে। কিন্তু বিয়ের কথা উঠতেই বাপ দেখলেন মহা মুশকিল–এবার সম্পত্তির ভাগ চেয়ে বসবে জামাই–তাই উঠে পড়ে লাগলেন যাতে সব সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়। জোর করে অ্যালিসকে দিয়ে একটা কাগজে সই করিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, বিয়ে হলেও যাতে টাকার ওপর দখল থাকে মি. রুকাসলের। অ্যালিস বেঁকে বসল। শুরু হল অমানুষিক পীড়ন। ব্রেন-ফিভারে শয্যাশায়ী হল অ্যালিস ছ-মাস লড়াই চলল যমে মানুষে। প্রাণে বেঁচে গেলেও শরীর একেবারে আধখানা হয়ে গেল–অমন সুন্দর চুলের বোঝাও কেটে ফেলতে হল। তাতে মন টলল না মি. ফাউলারের ধনুর্ভঙ্গ পণ করে রইল অ্যালিসকেই বিয়ে করবে।

হোমস বললে, এবার বুঝেছি। বাকিটা আমি বলছি। মি. রুকাসল তখন থেকেই মেয়েকে সেইভাবে বন্দিনী করে রাখতে লাগলেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

লন্ডন থেকে মিস হান্টারকে নিয়ে এলেন ছিনের্জোক মি, ফাউলারকে ঘাড় থেকে নামানোর জন্যে?

মি. ফাউলারের জেদ তাতে চিড় খেল না। অসমি অধ্যবসায় তার। বাড়ি অবরোধ করে বসে রইলেন। তোমার সঙ্গেও তার একটা বোঝাঁপড়া হয়ে গেল বুঝিয়ে দিলেন তার স্বার্থের সঙ্গে তোমার স্বার্থের কোনো সংঘাত নেই!

মি. ফাউলারের কথাবার্তাই শুধু মিষ্টি নয়, হাতটিও দরাজ।

তাই তোমার পতিদেবতার যাতে মদের অভাবনা-ঘটে, সে-ব্যবস্থা করে তোমাকে দিয়েই দড়ির মই জোগাড় করে রাখল যাতে মনিব বেরিয়ে গেলেই ভাবী বউকে নিয়ে চম্পট দেওয়া যায়?

আপনি তো দেখছি ঠিক ঠিক সব বলে যাচ্ছেন?

ডাক্তার এসে গেছেন দেখছি। মিসেস টলার, অনেক উপকার করলেন, অনেক ধাঁধা কাটিয়ে দিলেন। মিস হান্টারকে নিয়ে আমরা চললাম উইঞ্চেস্টারে।

তামাটে বৃক্ষ কপার-বীচেসওলা রহস্য-নিকেতনের রহস্য এইভাবেই ফর্দাফাই করে ছাড়ল সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ডিটেকটিভ শার্লক হোমস। মি. রুকাসল প্রাণে বেঁচে গেলেও খুব সুখে তার দিন কাটেনি স্ত্রী-র আন্তরিক সেবায় দিন চলে গেছে কোনোরকমে। ঝি-চাকরকে তাড়ানোর সাহস হয়নি ভদ্রলোকের। ওঁর কুকীর্তি এত বেশি জেনে ফেলেছে টলার-দম্পতি যে বাড়িতেই তাদের থাকতে দিতে হয়েছে–এখনও আছে। বাড়ি থেকে পালানোর পরের দিনই সাদাম্পটনে গিয়ে বিশেষ লাইসেন্সের জোরে মি. ফাউলারের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় অ্যালিসের। এখন তিনি সরকারি চাকরি নিয়ে মরিশাসে আছেন। মিস হান্টার একটা প্রাইভেট স্কুলের ভার নিয়ে ওয়ালসালে–তার সম্বন্ধে শার্লক হোমসের আর কোনো আগ্রহই নেই–যা দেখে খুবই হতাশ হয়েছি আমি।

—————-

টীকা

১. রহস্য নিকেতন কপার-বীচেস: দি অ্যাডভেঞ্চার অব দ্য কপার-বীচেস ১৮৯২-এর জুন মাসের স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

২. ডেইলি টেলিগ্রাফ : এই সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা কর্নেল স্নে। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫৫-র ২৯ জুন। সানডে টাইমসের মুদ্রক যোসেফ মোজেস লেভি ছাপতেন ডেইলি

টেলিগ্রাফ। পরে কর্নেল স্লে-র কাছ থেকে মালিকানা আসে লেভির হাতে। তার ক-দিন পরেই এই খবরের কাগজের বিক্রি অন্য সব দৈনিক কাগজের বিক্রিকে ছাড়িয়ে যায়।

৩. সেগুলো গল্পই হয়ে গেছে : দ্য ব্ল্যাঞ্চড সোলজার গল্পটি শার্লক হোমস বর্ণিত। তখন কিন্তু হোমস স্বীকার করেন গল্পের বর্ণনা তেমনই হওয়া উচিত, যা পড়তে পাঠকের ভালো লাগে।

৪. চুল তো ছাঁটতে পারব না : ভিক্টোরীয়-যুগে ইংরেজ মহিলারা লম্বা চুল পছন্দ করলেও, চুল ছোটো করে ছাঁটারও চল ছিল।

৫. আমার কোনো বোনকে : হোমসের কোনো বোন থাকবার কথা আর্থার কন্যান ডয়াল লেখেননি। কিন্তু কোনো। কোনো গবেষক তার এক বা একাধিক বোন থাকার সম্ভাবনা অনুমান করেন।

৬. প্রাচীন ইংলন্ডের রাজধানীতে : উইনচেস্টার ছিল ৫১৯ খ্রিস্টাব্দে ওয়েসেক্সের স্যাক্সন রাজ্যের রাজধানী। ইংলন্ডের রাজা অ্যালফ্রেড দ্য গ্রেটের সময়ে, ৪২৭ সালে, উইনচেস্টার ইংলন্ডের রাজধানী হয়। ক্যানিউট দ্য ডেন, উইলিয়ম দ্য কনকারার প্রভৃতি রাজাও রাজত্ব করেছেন এই শহর থেকে। ১১৪১-এ ঘটিত এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর এই শহর গুরুত্ব হারায়।

৭. মোট সাতটা সম্ভাবনা : সাতটা সম্ভাবনার কথা হোমস বলেছেন দ্য মিসিং থ্রি কোয়ার্টার্স গল্পে। দ্য নাভাল ট্রিটি গল্পে বলেছিলেন সাতটা সূত্রর কথা।

৮. ব্ল্যাক সোয়ান সরাইখানাটা : উইনচেস্টার এই নামে সত্যিই একটি হোটেল ছিল।

৯. কার্লো : দ্য সাসেক্স ভ্যাম্পায়ার গল্পে এই নামের একটি স্প্যানিয়েল কুকুর দেখা যায়।

১০. তোমাকে দিয়েই দড়ির মই জোগাড় করে রাখল : অল্প সময় আগেই কিন্তু হোমস ভেবেছিল ওই দড়ির মই দিয়েই রুকাসল সরিয়ে দিয়েছে অ্যালিসকে।

১১. মরিশাসে মরিশাসে ১৮১০ সাল থেকে ব্রিটিশ উপনিবেশ পত্তন হয়। সেই সময়ে এই দ্বীপ ছিল জলপথে ভারতবর্ষে পৌঁছোনোর রাস্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ১৯৬৮ সালে মরিশাস স্বাধীন হয়।

# লাল-চুলো সংঘ

[দ্য রেড হেডেড লিগ]

গত বছর শার্লক হোমসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম শরৎকালে। লাল-চুলো মোটাসোটা এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিল হোমস। শুধু লালই নয়। আগুনের মতোই জ্বলজ্বলে চুলের বাহার দেখবার মতো। হঠাৎ ঢুকে পড়ার জন্যে ক্ষমা চেয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছি, হোমস আমাকে টেনে নিয়ে গেল ভেতরে।

বললাম, পাশের ঘরে বসি?

না।–মি. উইলসন, ডক্টর ওয়াটসন আমার সহযোগী। একে দিয়ে আপনারও কাজ হবে।

ভদ্রলোকের চর্বি-ঘেরা কুতকুতে চোখে কৌতূহলের রোশনাই দেখা গেল।

হোমস বসল। বলল, আমার কাজকারবারে তোমার উৎসাহ কম নয়। আমাকে নিয়ে অনেক কাহিনিও লিখেছ–যদিও তা অতিরঞ্জন-দুষ্ট। এর আগেও তোমাকে বলেছি, কল্পনা দিয়ে রাঙানো ঘটনা কখনোই বাস্তব ঘটনার মতো চাঞ্চল্যকর হতে পারে না।

তাতে আমার সন্দেহ আছে।

তাহলে আরও উদাহরণ হাজির করা যাক। মি. জাবেজ উইলসন একটা অসাধারণ কেস এনেছেন আজ। এর আগেও তোমাকে বলেছি, খুব অদ্ভুত আর অসাধারণ ঘটনার পেছনে বড়ো অপরাধ নাও থাকতে পারে থাকে কিন্তু এমন ব্যাপারের পেছনে যা চোখ এড়িয়ে যায় অতি সহজেই। এই যে কেসটা এখন শুনছি, এর মধ্যে অপরাধের ছায়াটুকুও দেখছি না। তা সত্ত্বেও বলব ইদানীংকালের মধ্যে এমন বিচিত্র মামলা আর হাতে আসেনি। মি. উইলসন, আপনার আশ্চর্য কেসটা আবার গোড়া থেকে বলুন। ডক্টর ওয়াটসনের শোনা দরকার।

লম্বা কোটের পকেট থেকে একটা নোংরা দলা পাকানো খবরের কাগজ বার করে বিজ্ঞাপনের স্তম্ভ দেখতে লাগলেন মি. উইলসন। ভদ্রলোক একটা ঢিলেঢালা টাইপের। পোশাক পরিচ্ছদও তাই। কারবারি ইংরেজের চেহারা যেরকম হয় আর কি। ওয়েস্টকোটে ঝুলছে তামার অ্যালবার্ট চেন, তাতে লাগানো একটা চৌকোনা ধাতু। চেহারার মধ্যে একমাত্র বৈশিষ্ট্য তাঁর আগুন-রাঙা লাল চুল, ভাবভঙ্গি বেশ অশান্ত।

দেখলাম, আমার মতো শার্লক হোমসও বিশ্লেষণী দৃষ্টি বুলিয়ে নিচ্ছে ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে। চোখাচোখি হতেই হাসল।

বলল, কিছুদিন ইনি মজুরের কাজ করেছেন, নস্যি নেওয়ার অভ্যেস আছে। রাজমিস্ত্রির কাজও করেছেন, চীনদেশে ছিলেন এবং এখন খুব লেখালেখি নিয়ে আছেন।

দারুণ চমকে উঠলেন জাবেজ উইলসন। কাগজে তর্জনী রেখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন হোমসের পানে।

বললেন, আশ্চর্য! আপনি জানলেন কী করে? সত্যিই তো মজুর হিসেবেই আমার কর্মজীবনের শুরু। জাহাজের ছুতোর মিস্ত্রি ছিলাম।

আপনার হাত দেখে জানলাম। ডান হাতটা বাঁ-হাতের চেয়ে বেশি মাংসল কাজের হাত কিনা।

নস্যি নিই জানলেন কী করে? অথবা রাজমিস্ত্রি ছিলাম?

আপনার ব্রেস্টপিন দেখে জানলাম আপনি রাজমিস্ত্রি ছিলেন। নস্যির ব্যাপারটা বলে আপনার বুদ্ধিকে খাটো করতে চাই না।

লেখা নিয়ে আছি বুঝলেন কীভাবে?

আপনার ডান হাতার তলার পাঁচ ইঞ্চি বেশ চকচক করছে। আর বাঁ-হাতার কনুইটা কালচে মেরে গেছে টেবিলে ভর দিয়ে থাকার দরুন।

চীনদেশে থাকাটা?

ডান কবজিতে একটা উল্কি আঁকিয়েছেন। মাছের টাট্টু। আঁশটা গোলাপি। এ-কাজ চীন দেশেই হয়। উল্কি নিয়ে আমি একটু কাজ করেছি, প্রবন্ধও লিখেছি। তা ছাড়া ঘড়ির চেনের ওই চীনে মুদ্রাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আপনি চীন ঘুরে এসেছেন।

অট্টহেসে জাবেজ উইলসন বললেন, ওঃ, এই ব্যাপার! আমি ভাবলাম না-জানি কী অসাধারণ ক্ষমতাই দেখাচ্ছেন।

অত খুলে না-বললেই ভালো হত দেখছি–সুনামটা আর রইল না পেয়েছেন বিজ্ঞাপনটা?

হ্যাঁ, এই দেখুন। যত গণ্ডগোল এই বিজ্ঞাপন থেকেই। ডক্টর ওয়াটসন, পড়ুন আপনি।

আমি পড়লাম :

যুক্তরাষ্ট্রের স্বর্গত হপকিন্সের ইচ্ছাপত্র অনুযায়ী লাল-চুলো সংঘে আর একটা সদস্যপদ শূন্য হয়েছে। সামান্য কাজের বিনিময়ে হপ্তায় চার পাউন্ড মাইনে দেওয়া হবে। বয়স যার একুশের বেশি, চুলের রং লাল, তিনি আবেদনপত্র নিয়ে বেলা এগারোটায়, ফ্লিট স্ট্রিটের সাত নম্বর পোপস কোর্টে সংঘ-দপ্তরে ডানকান রসের সঙ্গে দেখা করুন।

হতভম্ব হয়ে বললাম, এ আবার কী বিজ্ঞাপন!

জোরে হেসে উঠল হোমস। বলল, তাহলেই দেখ ব্যাপারটা মামুলি নয় মোটেই। মি. উইলসন, এবার আপনার আর্থিক অবস্থাটা খুলে বলুন। ওয়াটসন, কাগজটার নাম তারিখ লিখে রাখো।

মর্নিং ক্রনিকল। তারিখটা দেখছি দু-মাস আগেকার ২৭ এপ্রিল, ১৮৯০।

বলুন মি. উইলসন।

আমার একটা বন্ধকি কারবার আছে। ছোটো কারবার। কর্মচারী মাত্র একজন–তাও হাফ মাইনের–তা না-হলে রাখতে পারতাম না।

নাম?

ভিনসেন্ট স্পলডিং। বয়স খুব কম নয়, তেমন ধড়িবাজও নয়–নইলে এই মাইনেতে পড়ে থাকে? দোষের মধ্যে ফটো তোলার বাই আছে। দিনরাত ক্যামেরা কাঁধে টো-টো করছে, ছবি তুলছে। নীচের অন্ধকার ঘরে ডেভলাপ করছে।

এখনও কাজ করছে আপনার?

তা করছে। সেইসঙ্গে একটা মেয়েও আছে। বছর চোদ্দো বয়স। সংসারের কাজ করে। কারণ আমি বিপত্নীক। বেশ ছিলাম এই তিনজনে–কিন্তু মাস দুয়েক আগে এই বিজ্ঞাপনটা এনে স্পলডিং বললে–আহারে, আমার যদি লাল চুল থাকত।

অবাক হয়ে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কী। ও তখন বিজ্ঞাপনটা দেখাল। বললে, লাল-চুলো লোকের আকাল পড়েছে বলেই নিশ্চয় বিজ্ঞাপন দিয়েছে অছিরা। চুলের রংটা পালটে নিতে পারলে সে নিজেই যেত। বছরে দু-শো পাউন্ড কি চাট্টিখানি কথা? অথচ আমার চুল টকটকে লাল হওয়া সত্ত্বেও ঘর থেকে নড়ছি না।

কিছুদিন ধরে কারবার ভালো চলছিল না। লাল চুলের দৌলতে দু-শো পাউন্ড রোজগারের খবর শুনে তাই লোভ হল।

বললাম, ঝেড়ে কাশশা, কী বলতে চাও?

ও তখন এই বিজ্ঞাপনটা দেখাল। বললে, তার চাইতে আপনি নিজেই পড়ে দেখুন। একজন লাল-চুলো আমেরিকান কোটিপতি একটা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সেই লাল-চুলো সংঘ। ভদ্রলোকের নিজের মাথার চুল লাল ছিল বলে লন্ডনের সব লাল-চুলোদের জন্যে দরদ উথলে উঠেছিল। সামান্য গতর খাটিয়ে যাতে তারা দু-পয়সা পকেটে পায় সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকাটা দেওয়া হয় তার সম্পত্তির সুদ থেকে। দরখাস্ত করলেই চাকরিটা পাওয়া যাবে।

শুনে তো চক্ষু স্থির হয়ে গেল আমার, সেকী! লাখে লাখে লাল-চুলো দরখাস্ত নিয়ে ছুটবে যে।

স্পলডিং বললে, মোটেই না। প্রথম কথা বয়স কম হলে চলবে না। তারপর লন্ডনের বাসিন্দা হওয়া চাই কেননা ব্যাবসা করে টাকা কামিয়েছিলেন তিনি এখান থেকেই। তার চেয়েও বড়ো কথা হল, চুলের রং শুধু লাল হলেই চলবে না–আগুনরাঙা হওয়া চাই ঠিক আপনার চুলের মতো। দরখাস্ত করলেই কিন্তু পেয়ে যাবেন কাজটা–যদি দরকার মনে করেন।

দেখলাম, অনেক খবরই রাখে স্পলডিং। কথাটাও মন্দ বলেনি। আমার চুলের রংখানা দেখেছেন? ঠিক যেন আগুন। কাজেই সেদিন দোকান বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম ওকে নিয়ে।

গিয়ে মুণ্ডু ঘুরে গেল কাতারে কাতারে লাল-চুলো মানুষ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তবে হ্যাঁ, আমার মতো আগুন রাঙা চুল কারোরই নেই। যেদিকে দু-চোখ যায় কেবল লাল মাথা। এরই মধ্যে দিয়ে আশ্চর্য কৌশলে স্পলডিং আমাকে টেনে নিয়ে গেল সিঁড়ি বেয়ে অফিস ঘরের সামনে। সিঁড়িতেও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লাল-চুলোরা–কেউ কেউ মুখ কালো করে নেমে আসছে চাকরি না-পাওয়ায়।

অফিস ঘরে ঢুকে একজন লাল-চুলোকে টেবিল চেয়ার নিয়ে বসে থাকতে দেখলাম। আমার চাইতেও রাঙা চুল। প্রার্থীদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তৎক্ষণাৎ নাকচ করছে দেখে

মনটা দমে গেল। কিন্তু আমার পালা আসতে বুকটা নেচে উঠল আমার প্রতি তার পছন্দ ভরা চাহনি দেখে। উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে ঘাড় কাত করে বেশ করে দেখল আমাকে। দু-চারটে কথা জিজ্ঞেস করার পর এসে দাঁড়াল আমার সামনে। তারপর আচমকা আমার চুল খামচে ধরে এমন হ্যাচকা টান মারল যে চেঁচিয়ে মেচিয়ে চোখে জল এনে ফেললাম। ভদ্রলোক লজ্জিত হয়ে বললে, কিছু মনে করবেন না–নকল চুল কিনা দেখে নিলাম। দু-বার ঠকেছি কিনা—রং করা চুল নিয়েও এসেছে অনেকে।

এই বলে জানলার সামনে নিয়ে হেঁকে বললে, লোক পাওয়া গেছে–চাকরি আর খালি নেই। হতাশ হয়ে সরে পড়ল লাল-চুলোরা।

ভদ্রলোক বলল, আমি এখানকার ম্যানেজার। নাম ডানকান রস। আপনি কী করেন?

সামান্য একটা ব্যাবসা, বললাম আমি।

স্পলডিং বলে উঠল, সে-কাজ আমি আপনার হয়ে করে দিতে পারব, মি. উইলসন।

এখানকার কাজ ক-টায়?

দশটা থেকে দুটো।

ভেবে দেখলাম, বন্ধকি কারবার চলে সাধারণত সন্ধের দিকে সকালের দিকে আমার কোনো কাজই নেই। সেই ফাঁকে বাড়তি পয়সা স্বচ্ছন্দে রোজগার করতে পারব। ব্যাবসাটা

স্পলডিং দেখতে পারবে।

বললাম, আমি রাজি। কত মাইনে?

হপ্তায় চার পাউন্ড।

কাজটা কী?

খুবই সামান্য। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা দেখে স্রেফ নকল করে যাওয়া। কালি কলম কাগজ সব আপনি নিয়ে আসবেন। কিন্তু ঘর ছেড়ে একদম বেরোতে পারবেন না–কোনো অছিলাতেই নয়–অসুখবিসুখ বা হঠাৎ কাজের চাপেও ডুব মারা চলবে না–তাহলেই জানবেন চাকরিটা যাবে। শর্তটা পরিষ্কারভাবে লেখা আছে উইলে। বলুন, পারবেন কাল থেকে আসতে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

বিদায় জানিয়ে স্পলডিংকে নিয়ে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলাম আমি।

বাড়ি ফিরে কিন্তু সাত পাঁচ ভাবতে গিয়ে মনটা আবার মুষড়ে পড়ল। জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লাম কি? সামান্য এই কাজের জন্য এত টাকা কেউ দেয়? স্পলডিং অবশ্য সমানে উৎসাহ জুগিয়ে চলল আমাকে।

পরের দিন কাগজ কলম কালি নিয়ে গেলাম সংঘের দপ্তরে। ডানকান রস হাজির ছিল। আমাকে Aঅক্ষর থেকে শব্দকোষ কপি করতে বসিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু মাঝে মাঝে এসে দেখে গেল ঠিকঠাক কাজ করছি কি না। ছুটি দিল ঠিক দুটোর সময়।

শনিবারে পেলাম চারটে পাউন্ড। একদিনের জন্যেও কামাই না-করে প্রতিদিন দশটা থেকে দুটো হাজিরা নিয়ে চললাম দপ্তরে। ডানকান রস ক্রমশ আসা কমিয়ে ছিল। রোজ একবার আসাও শেষকালে বন্ধ হয়ে গেল। আমি কিন্তু প্রতিদিন দশটা থেকে দুটো পর্যন্ত নকলনবিশি চলিয়ে গেলাম স্রেফ টাকার লোভে। কী জানি বাবা, একদিন না-এলে যদি টাকাটা খোয়া যায়।

এইভাবে গেল আটটা সপ্তাহ। A প্রায় শেষ করে এনেছিলাম। এমন সময়ে আচমকা শেষ হয়ে গেল ব্যাপারটা।

আজ সকালে কাজে গিয়ে দেখি দরজায় তালা দেওয়া। এই পিচবোর্ডটা ঝুলছে পাল্লায়।

চৌকানা একটা পিচবোর্ড এগিয়ে দিলেন জ্যাবেজ উইলসন। আকারে নোটবইয়ের চাইতে বড়ো নয়। তাতে লেখা :

লাল-চুলো সংঘ
উঠে গেল
অক্টোবর ৯, ১৮৯০

জাবেজ উইলসনের মুখের চেহারা দেখেই আমি আর হোমস কেউই হাসি সামলাতে পারলাম না। যাকে বলে অট্টহাসি, তাই হেসে উঠলাম।

একে তো ওইরকম লাল চুল ভদ্রলোকের, তার ওপর আমাদের ছাদ কাপানো অট্টহাসি শুনে যেন আরও লাল হয়ে গেল চুলের গোড়া পর্যন্ত।

চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে রক্তিম মুখে বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি, আমার দুর্দৈব দেখে এত মজা পাবেন আপনারা বুঝিনি।

হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিল হোমস। বলল, আপনার কেস আমি নিলাম। দরজায় এই পিচবোর্ডটা দেখবার পর কী করলেন এবার বলুন!

নীচের তলায় বাড়িওয়ালা থাকেন। তার কাছে গিয়ে রক্তকেশ সংঘের নাম করতে তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। ডানকান রস নামটাও নাকি জীবনে শোনেননি। কিন্তু লাল-

চুলো চেহারার বিবরণ দিতেই চিনলেন। বললেন, সলিসিটর ভদ্রলোকের কথা বলছেন তো? ওঁর নাম তো উইলিয়াম মরিস। নিজের অফিস গুছোনো না-হওয়া পর্যন্ত আমার অফিসে ছিলেন। কালকেই চলে গেছেন। ১৭ নম্বর কিং এডওয়ার্ড স্ট্রিটের অফিসে গেলেই দেখা পাবেন।

গেলাম সেখানে। গিয়ে আবার বোকা বনলাম। ঠিকানায় একটা কারখানা আছে। উইলিয়াম মরিস বা ডানকান রসের নামও কেউ শোনেনি। বাড়ি ফিরে স্পলডিংকে সব বললাম। ও বললে, দেখাই যাক না দু-দিন সবুর করে। নিশ্চয় চিঠিতে খবর আসবে। কিন্তু তাতে আমার কী লাভ বলুন? চাকরিটা তো আর পাব না। তাই ভাবলাম আপনার বুদ্ধি নিতে আসি গরিব দুঃখীদের অনেক সাহায্য আপনি করেন জানি।

বেশ করেছেন। ব্যাপারটা কিন্তু যত সহজ ভাবছেন তত সহজ নয়। বেশ গুরুত্ব আছে।

তা তো আছেই। হপ্তায় চার পাউন্ড কি চাট্টিখানি কথা। কিন্তু কথা হচ্ছে আমার পেছনে বত্রিশটা পাউন্ড খরচ করে এই ঠাট্টাটা করার কী দরকার ছিল?

স্পলডিং লোকটা আপনার কাছে কদ্দিন কাজ করছে?

মাসখানেক।

ওকে কাজে নিলেন কীভাবে?

বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অনেকেই এসেছিল। ওর চাহিদা দেখলাম সবচেয়ে কম।

সস্তায় কিস্তি মেরেছেন বলতে পারেন। চেহারা কীরকম স্পলডিংয়ের?

মাথায় খাটো, গাঁট্টাগোট্টা। তড়বড়ে। পরিষ্কার গাল। বয়স বছর তিরিশ। কপালে একটা সাদা দাগ–অ্যাসিডে পুড়ে গিয়েছিল।

সিধে হয়ে বসল হোমস। কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল উত্তেজনা, ঠিক ধরেছি। দু-কানের লতিতে কি ফুটো আছে?

আছে। ছেলেবেলায় নাকি একজন বেদে জোর করে কান বিঁধিয়ে দিয়েছিল।

গম্ভীর হয়ে গেল হোমস, এখন সে কোথায়?

আমারই ডেরায়।

হুম। আজ শনিবার। আশা করছি সোমবারের মধ্যেই কিছু একটা করতে পারব।

বিদেয় হলেন জাবেজ উইলসন।

হোমস বললে, ওয়াটসন, কী বুঝলে বললো।

কিস্‌সু না। দারুণ ধোঁয়াটে।

যে-মামলা বেশি ধোঁয়াটে মনে হয়, তাতেই বরং ধোঁয়া কম থাকে। কিন্তু যা একেবারেই সাদাসিদে, রহস্য তাতেই বেশি।

মতলব কী তোমার?

আপাতত তামাক খাওয়া। পরপর তিন পাইপ তামাক না-খাওয়া পর্যন্ত একদম কথা বলব। বলে চেয়ারের ওপর পা তুলে পাইপ কামড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রইল অনেকক্ষণ। ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়ে পড়ল। ঢুলুনি আমারও এল। তারপরেই চমকে উঠলাম ওর লাফিয়ে ওঠায়।

পাইপ নামিয়ে বললে, চলো, ঘণ্টা কয়েক সেন্ট জেমস হলে বাজনা শুনে আসা যাক। সময় হবে?

নিশ্চয়।

তবে চলো। বেরিয়ে পড়া যাক। প্রা্েগ্রামে দেখছি অবশ্য জার্মান বাজনাই বেশি। ফরাসি বা ইটালিয়ান বাজনার চেয়ে ভালো। নিজেকে হারিয়ে ফেলা যায়–এখন যা দরকার।

হোমস কিন্তু বাজনার আসরে আগে গেল না–গেল স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারে। ভারি অপরিচ্ছন্ন অঞ্চল। কোণের বাড়িটায় বোর্ডে লেখা জাবেজ উইলসনের নাম। লাল-চুলো মক্কেলের বন্ধকি দোকান নিশ্চয়। চোখ কুঁচকে চেয়ে রইল হোমস সেইদিকে। তারপর দু-পাশের ইটের বাড়িগুলো দেখতে দেখতে এল মোড় পর্যন্ত। ফের ফিরে এল দোকানের সামনে। জোরে জোরে দু-তিনবার লাঠি ঠুকল দরজার কাছে। অমনি খুলে গেল দরজা। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক পুরুষ, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

বললে, আসুন।

ধন্যবাদ। স্ট্র্যান্ডে যাওয়ার রাস্তাটা বলতে পারেন? শুধোয় হোমস।

পথের হদিশ বলে দিয়ে দুম করে দরজা বন্ধ করে দিলে লোকটা।

হোমস বললে, দেখলে তো কীরকম চটপটে? এ-রকম স্মার্ট লোক লন্ডনে আছে আর তিনজন। বুকের পাটার দিক দিয়ে এ কিন্তু তিন নম্বর।

রাস্তা জানতে চাইলে কেন? চেহারাটা দেখবার জন্যে তো?

না, না।

তবে?

ট্রাউজার্সের হাঁটুটা দেখলাম।

তাই নাকি! কী দেখলে হাঁটুতে?

যা দেখব বলে এসেছিলাম।

মেঝেতে লাঠি ঠুকলে কেন?

এখন দেখবার সময় ওয়াটসন, কথা বলার সময় নয়। এদিকের রাস্তা দেখা হয়েছে, চলো এবার পেছনে যাই।

পেছনের রাস্তা কিন্তু জমজমাট পথচারী আর যানবাহনের ভিড়ে। স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ারের নির্জনতার ঠিক বিপরীত। দু-পাশে সারি সারি ঝলমলে দোকান।

তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে রইল হোমস। যেন আপন মনেই বললে, তামাকের দোকানের পরেই খবরের কাগজের দোকান; ব্যাঙ্কের পরেই রেস্তোরাঁ; তারপর বাড়ির কারখানা। চলো ওয়াটসন। এখানকার কাজ শেষ। এবার একটু চোখ বুজে তন্ময় হয়ে বাজনা শোনা যাবে।

হোমস ভালো বেহালা বাজাতে পারে, ভালো বাজনা শুনতেও ভালোবাসে। নতুন নতুন সুর তুলতে তার উৎসাহের অন্ত নেই। বাজনার আসরে বসে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেল। সত্যিই নিজেকে হারিয়ে ফেলল গানের জগতে। তীক্ষ্ণবুদ্ধি রহস্যসন্ধানী বলে তখন তাকে আর মনেই হল না। এই সময়টাই কিন্তু শত্রুশিকারের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। অসাধারণ বিশ্লেষণী শক্তি খাপখোলা বাঁকা তরবারির মতোই রহস্যকে কচুকাটা করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে যায় এহেন অলস মুহূর্তে! ওর চরিত্রের এই দ্বৈত রূপ আমি দেখেছি বলেই বুঝলাম শত্রুপক্ষের কপাল পুড়তে আর দেরি নেই।

বাজনা শেষ হল। রাস্তায় বেরিয়ে হোমস বললে, ডাক্তার, কেসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ–গুরুত্বটা বেড়েছে আজকে শনিবার হওয়ায়। সাংঘাতিক চক্রান্ত চলেছে এই কোবার্গ স্কোয়ারে। আমাকে একটু অন্য জায়গায় যেতে হবে কিন্তু আজ রাত্রে তোমার সাহায্যও দরকার। আসবে?

ক-টায়?

এই ধর দশটায়?

আসব–বেকার স্ট্রিটে দেখা হবে।

সঙ্গে মিলিটারি রিভলভারটা এনো দরকার হতে পারে। বলেই সাঁৎ করে মিলিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

শার্লক হোমসের তুলনায় আমি যে কত নির্বোধ, সে প্রমাণ বারে বারে পেয়েছি। লাল-চুলো সংঘের বিচিত্র কাণ্ডকারখানার আমি যা জানি, সে-ও তা জানে; আমি যা দেখেছি, সে-ও তা দেখেছে। তা সত্ত্বেও হোমস জেনে ফেলেছে একটা ঘোর ষড়যন্ত্র চলছে এখানে এবং এমনই বিপদের সম্ভাবনা আছে যে পিস্তল পর্যন্ত সঙ্গে রাখতে হচ্ছে। অনেক ভেবেও কুলকিনারা করতে পারলাম না হেঁয়ালির হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলাম।

যথাসময়ে গেলাম বেকার স্ট্রিটের বাড়িতে। দেখি ঘরে হাজির হয়েছেন একজন পুলিশ ইনস্পেকটর আর একজন দামি পোশাক পরা বিষন্ন ভদ্রলোক। প্রথম জনকে আমি চিনি—স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা। নাম, পিটার জোন্স। দ্বিতীয়জন অপরিচিত।

পরিচয় করিয়ে দিল হোমস। ভদ্রলোকের নাম মি. মেরিওয়েদার। নৈশ অভিযানে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন।

ব্যাজার মুখে মি. মেরিওয়েদার কিন্তু গজগজ করতে লাগলেন, নিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু পণ্ডশ্রম হবে। সাতাশ বছরে এই প্রথম শনিবারের তাস খেলাটা হল না আমার।

হোমস বললে, তাসের চাইতেও বেশি বাজি জিতবেন আজ রাতে তিরিশ হাজার পাউন্ড কি কম হল? আর মি. জোন্স পাবেন একজনকে যাকে হন্যে হয়ে খুঁজছেন দীর্ঘদিন।

সে আবার কে?

তার নাম জন ক্লে। মানুষ খুন বলুন, কি চুরিচামারি বলুন, ডাকাতিই হোক কি জালিয়াতি হোক–সব বিদ্যেতেই সে তুখোড়। বয়স কম, রাজবংশের ছেলে। উচ্চশিক্ষা পেয়েছে, কিন্তু নীচ পেশায় রপ্ত হয়েছে। আজ রাতেই তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব আপনার। চলুন এবার বেরোনো যাক। বলে শিকারের চাবুক নিয়ে পা বাড়াল সিঁড়ির দিকে।

পথে নেমে দুটো গাড়িতে উঠলাম চারজনে। আমি আর হোমস রইলাম পেছনের গাড়িতে। বেশ কিছুক্ষণ মনের আনন্দে নানারকম সুর ভেজে চলল গোয়েন্দা বন্ধু।

তারপর বললে, এসে গেছি। শোনো ওয়াটসন, এই মেরিওয়েদার লোকটা একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর। আজকের অভিযানে ওঁর থাকা দরকার ওঁর নিজের স্বার্থে। জোন্সকে সঙ্গে নিলাম ওর বুলডগের মতো জেদ আর সাহসের জন্যে।

দিনের আলোয় ঝলমলে যে দোকান পসারির সামনে দিয়ে গিয়েছিলাম, সেই রাস্তায় নামলাম গাড়ি থেকে। মি. মেরিওয়েদার আমাদের একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে নিয়ে গিয়ে ছোট্ট দরজা খুলে ভেতরে ঢোকালেন। সেখান থেকে করিডর পেরিয়ে লোহার ফটক খুলে ঘোরানো পাথরের সিঁড়ি বেয়ে মাটির তলায় নামলেন। লোহার দরজা পেরিয়ে কিছুদূর গিয়ে ঢুকলেন একটা পাতাল ঘরে–ঘরভরতি কেবল বড়ো বড়ো কাঠের বাক্স।

আসবার পথে একটা লণ্ঠন জ্বেলে এনেছিলেন মেরিওয়েদার। সেইটা মাথার ওপর তুলে হোমস বললে, বিপদটা ওপর থেকে আসছে না।

নীচ থেকেও আসবে না, বলে ঠক ঠক করে মেঝেতে লাঠি ঠুকলেন মি. মেরিওয়েদার। চমকে উঠলাম সঙ্গেসঙ্গে, আরে সর্বনাশ! মেঝেটা ফাঁপা মনে হচ্ছে না?

রেগে গেল হোমস। বললে, ঘাটে এসে তরী ডুববে দেখছি আপনার জন্যে। দয়া করে বাগড়া না-দিয়ে বাক্সের ওপর উঠে বসবেন?

মি. মেরিওয়েদারের মুখ লাল হয়ে গেল। গম্ভীর মুখে একটা কাঠের বাক্সে উঠে বসে রইলেন।

হোমস তখন লণ্ঠন আর আতশকাচ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মেঝের ওপর। অনেকক্ষণ ধরে পাথরের জোড় পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়াল হৃষ্টচিত্তে।

বললে, হাতে এখনও ঘণ্টাখানেক সময় আছে। জাবেজ উইলসন ঘুমিয়ে কাদা না-হওয়া পর্যন্ত ওরা কাজে নামবে না। ওয়াটসন, কোথায় দাঁড়িয়ে আছ বুঝেছ তো? ব্যাঙ্কের ভল্ট এটা–মি. মেরিওয়েদার এই ব্যাঙ্কের সর্বময় কর্তা। লন্ডনের ডাকসাইটে ক্রিমিনালরা হঠাৎ এই ভল্ট নিয়ে কেন উঠে পড়ে লেগেছে উনিই ভালো বলতে পারবেন।

মি. মেরিওয়েদার খাটো গলায় বললেন, সোনার জন্যে।

সোনা?

হ্যাঁ, ফরাসি সোনা। ব্যাঙ্ক অফ ফ্রান্স থেকে আনিয়ে এই ভল্টে রাখা হয়েছে আর্থিক অবস্থা ভালো করার জন্যে। আনা হয়েছে মাসখানেক আগে, এখনও রয়ে গেছে এইসব বাক্সের মধ্যে। আমি যে-বাক্সে বসে, এর মধ্যেও সিসের পাত দিয়ে মুড়ে সোনা রাখা আছে। এত সোনা কোনো ব্যাঙ্কে থাকে না–নেইও।

হোমস বললে, ব্যাঙ্কের আড়ালে লুকিয়ে থাকুন প্রত্যেকে ওরা বেপরোয়া আমাদেরও তৈরি থাকতে হবে সেইভাবে। আপাতত আমি লণ্ঠনে ঢাকা দেব, ঘর অন্ধকার করব। কিন্তু আলো ফেলবার সঙ্গেসঙ্গে বেরিয়ে পড়বেন আড়াল থেকে।ওয়াটসন, যদি দেখ গুলি চালাচ্ছে, নির্দ্বিধায় তুমিও গুলি চালাবে।

রিভলভার বার করে কাঠের বাক্সের ওপর রেখে আড়ালে বসে পড়লাম আমি। হোমস ঘর অন্ধকার করে দিল লণ্ঠনে ঢাকা দিয়ে। সে কী অন্ধকার! পাতালঘর বলেই যেন আরও বেশি অন্ধকার। কোনো ভাষায় সে-অন্ধকারের বর্ণনা করা যায় না। তেলপোড়া গন্ধটা নাকে ভেসে আসায় বুঝলাম বাতি এখনও জ্বলছে, সময়মতো আলো দেখা যাবে।

ফিসফিস করে হোমস বললে, এদিকে তাড়া খেয়ে পালালে বেরোবার পথ কিন্তু একটাই–স্যাক্স কোবার্গের সেই বাড়ি। মি. জোন্স, যা করতে বলেছি করেছেন তো?

নিশ্চয়। একজন ইনস্পেকটর দুজন চৌকিদার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে সেখানে।

চমৎকার। সব পথ বন্ধ। এবার শুধু প্রতীক্ষা।

প্রতীক্ষা বলে প্রতীক্ষা! ওত পেতে ছিলাম মাত্র সওয়া একঘণ্টা। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল যেন পুরো রাতটাই কাবার হয়ে গেল। ঘর নিস্তব্ধ। ফলে প্রত্যেকের বুকের খাঁচায় সচল হৃদযন্ত্রের আওয়াজ ঘরের মধ্যে যেন ধুপধাপ শব্দে শোনা যাচ্ছে। একে তো অন্ধকার, তার ওপর উৎকণ্ঠা–স্নায়ুর অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। হঠাৎ একটা রোশনাই দেখা গেল মেঝেতে।

সামান্য একটা আলোর রেখা। অতি ক্ষীণ। পাথরের জোড় ভেদ করে আলোক রশ্মি অন্ধকারের বুকে প্রকট হয়ে উঠল। এতটুকু শব্দ শোনা গেল না কিন্তু হলদেটে আলোর পরিধি বেড়েই চলল–দেখা গেল একটা গর্ত। মেয়েলি হাতের মতো একটা সাদা হাত বেরিয়ে এল সেই ফুটো দিয়ে। মিনিট খানেক বাদে হাতটা অদৃশ্য হল পাতালে। তার কিছু পরেই সশব্দে উলটে পড়ল একটা বড় সাইজের পাথর। চৌকোনা গর্ত দিয়ে ঠিকরে এল লণ্ঠনের আলো। বাচ্চা ছেলের মুখের মতো একটা মুখ উঁকি দিল সেই গর্ত দিয়ে। এদিক-ওদিক জুলজুল করে তাকিয়ে হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে এল মেঝেতে–টেনে তুলল আর একজন হালকা চেহারার পুরুষকে–এর চুল টকটকে লাল রঙের।

বাতাসের মতো সুরে বললে শেষোক্ত ব্যক্তি, বেলচা আর থলি দাও–আরে সর্বনাশ! পালাও, পালাও, আর্চি–লাফিয়ে পড়ো গর্তে।

কিন্তু পালানোর আর সময় কোথায়? বাঘের মতো লাফিয়ে গিয়ে তার জামার কলার খামচে ধরল শার্লক হোমস। রিভলভারের নল ঝলসে উঠতেই সপাং শব্দে চাবুক হাঁকড়াতেই ঠিকরে গেল রিভলভার। পড়-পড় আওয়াজ হল। আর্চির জামা ছিড়ে যাওয়ায় জোন্সের হাত ফসকে গর্তে লাফিয়ে পড়েছে সে।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে হোমস বললে, জন ক্লে, তোমার খেল খতম হয়েছে–এবার ক্ষ্যামা দাও।

কিন্তু আমার দোস্তকে তো ধরতে পারেননি, ততোধিক শান্ত কণ্ঠে বললে লাল-চুলো লোকটা। তার জামার খানিকটা কাপড়ই কেবল পেয়েছেন।

তার জন্যে সুড়ঙ্গের ও-মুখে দাঁড়িয়ে আছে তিনজন–কিচ্ছু ভেবো না।

বাঃ। চমৎকার নিখুঁত কাজ হয়েছে দেখছি।

তা হয়েছে, তোমারটাও কম নিখুঁত হয়নি। লাল-চুলোর আইডিয়া সত্যিই প্রশংসার করার মতো!

জোন্স বললে, বন্ধুর জন্যে মন কেমন করছে তো? শিগগিরই দেখা হয়ে যাবে। এবার এসো দিকি বাছাধন, হাতকড়াটা লাগিয়ে দিই।

খবরদার! খ্যাক করে ওঠে জন ক্লে। মনে রাখবেন আমার গায়ে রাজরক্ত আছে। ননাংরা হাতে ছোঁবেন না আমাকে। ততক্ষণ কবজিতে লেগে গেছে হাতকড়া। তা সত্ত্বেও তড়পানি কমল না জন ক্লে-র–বাজে কথা একদম বলবেন না। হুজুর বলে ডাকবেন। সবসময়ে দয়া করে কথাটা বলবেন।

তাই ডাকব হুজুর, মুচকি হেসে বললে জোন্স, এখন দয়া করে উঠে আসুন, থানায় যেতে হবে যে।

বাঃ, এই তো চাই, বসে বাতাসে মাথা ঠুকে আমাদের সবাইকে অভিবাদন জানিয়ে জোন্সের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল জন কে।

গদ গদ কণ্ঠে মেরিওয়েদার বললেন, মি. হোমস আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন! ব্যাঙ্ক লুঠের এ-রকম আশ্চর্য চেষ্টা আজ পর্যন্ত হয়নি। শুধু আপনার জন্যেই বানচাল হয়ে গেল ওদের ষড়যন্ত্র।

হোমস বললে, জন ক্লে-র সঙ্গে আমার একটু বোঝাঁপড়া বাকি ছিল–তাই তা চুকিয়ে নিলাম। এতে আমার কিছু খরচপত্র হয়েছে। ব্যাঙ্ক থেকে তা দিয়ে দিলে বাধিত হব। আমার সবচেয়ে বড়ো লাভ কিন্তু লাল-চুলো সংঘের এই অসাধারণ মামলার সুরাহা করা।

পরের দিন সকাল বেলা বেকার স্ট্রিটের ঘরে বসে মদ্যপান করতে করতে হেঁয়ালি ব্যাখ্যা করল শার্লক হোমস।

বলল, লাল-চুলো সংঘের বিচিত্র বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে শব্দকোষ নকলের অছিলায় রোজ চার ঘন্টা একটা ঘরে বসিয়ে রাখার একটাই উদ্দেশ্য নিজের বাড়ি থেকে মাথামোটা বন্ধকি কারবারিকে সরিয়ে রাখা। চার পাউন্ডের লোভ বড়ো কম নয়। জাবেজ উইলসনের মাথার লাল চুল দেখেই আইডিয়াটা মাথায় আসে শয়তানদের। দুজনে মিলে বড়ো করে লাল-চুলো সংঘের নাম করে বেচারিকে সরিয়ে রাখল বাড়ির বাইরে।

কিন্তু কেন? আর্থিক অবস্থা তার ভালো নয়, কারবারও ছোটো, কাজেই বাড়ির মধ্যে তেমন ধনদৌলত নেই। সোমত্ত মেয়েও নেই যে প্রেম করার জন্যে বাড়ির মালিককে বাড়ি থেকে সরাতে হবে। তাহলে নিশ্চয় আসল কাণ্ডটা ঘটছে অন্য কোথাও। ষড়যন্ত্র চলছে এই বাড়িতেই। তারপর যখন শুনলাম, মাটির তলার ঘরে ফটো ডেভলাপ করতে যায় কর্মচারী—তখনই রহস্য-তিমিরে আলো দেখতে পেলাম। চেহারার বর্ণনা শুনেই বুঝলাম লন্ডনের বড়ো অপরাধীদের মধ্যে সে-ও একজন। দু-মাস ধরে রোজ চার ঘণ্টা হিসেবে মাটির তলার ঘরে সে কী করেছে? নিশ্চয় সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে অন্য বাড়িতে যাওয়ার জন্যে।

অকুস্থলে পৌঁছে লাঠি ঠুকে দেখলাম সুড়ঙ্গটা বাড়ির সামনে না পেছনে। সামনে যে নয়, নিরেট আওয়াজ শুনেই বুঝলাম। কর্মচারী বেরিয়ে আসতেই দেখলাম হাঁটুতে মাটি লেগে কি না। সত্যিই লেগে আছে–ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে বসে মাটি খুঁড়লে প্যান্টের যা অবস্থা, অবিকল তাই। আমরা কেউ কাউকে চাক্ষুষ দেখিনি বলেই এই ঝুঁকিটা নিলাম।

বাড়ির পেছনে গিয়ে দেখলাম রাস্তা পেরোলেই ব্যাঙ্ক। তখন আর কোনো সন্দেহই রইল না। তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে সোজা গেলাম স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড আর ব্যাঙ্ক ডিরেক্টরের কাছে।

কিন্তু জানলে কী করে যে সেইদিনই ওরা আসবে?

সংঘ তুলে দেওয়ার নোটিশ দেখে। অর্থাৎ জাবেজ উইলসনকে বাড়ি থেকে সরিয়ে রাখার দরকার নেই–সুড়ঙ্গ খোঁড়া হয়ে গেছে–এবার সোনা লুঠ করা দরকার। এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ততই মঙ্গল। সেদিক দিয়ে শনিবার প্রশস্ত সময়–কেননা পালাবার জন্যে দুটো দিন হাতে পাওয়া যাবে। ওইসব ভেবেই শনিবারের ফাঁদ পাতলাম।

চমৎকার! এ যে দেখছি যুক্তির শেকল–ফাঁক নেই কোথাও ! বললাম সোচ্ছ্বাসে।

হাই তুলে হোমস বললে, এসব মামলা হাতে নিলে একঘেয়েমি থেকে বাঁচা যায়। এইটাই আমার বড়ো লাভ।

সেইসঙ্গে মানুষ জাতটারও কত মঙ্গল হল বল তো?

তা হয়তো হল, তবে মানুষের চেয়েও বড়ো হল তার কীর্তি–যা থেকে যাবে।

———————

টীকা

১. লাল-চুলো সংঘ : দ্য রেড-হেডেড লিগ প্রথম প্রকাশিত হয় অগাস্ট ১৮৯১-এর স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনে।

২. গত বছর : প্রথম প্রকাশের হিসেবে ১৮৯০ সাল। সেই সময়ে শুধুমাত্র আ স্টাডি ইন স্কারলেট এবং দ্য সাইন অব ফোর প্রকাশিত হয়েছে।

৩. অ্যালবার্ট চেন : পকেট ঘড়ি আটকানোর চেন। ইংলন্ডের রানি ভিক্টোরিয়ার স্বামী, প্রিন্স অ্যালবার্ট এই ধরনের চেন ব্যবহার করতেন। তাঁর নাম থেকেই চেনের নামকরণ।

৪. ফ্লিট স্ট্রিট : লন্ডনের এই ব্যস্ত রাস্তায় বহু সংবাদপত্র এবং প্রকাশন সংস্থার দপ্তর এখনও বিদ্যমান। সংবাদপত্রের জন্য এই রাস্তার খ্যাতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকে।

৫. মর্নিং ক্রনিকল : এই নামের সংবাদপত্রটি ১৮৬০ সাল নাগাদ দেউলিয়া ঘোষিত হয়ে উঠে যায়। সেক্ষেত্রে ত্রিশ বছর পরে লেখা নামটি কাল্পনিক।

৬. দু-মাস আগেকার : এই সময়কাল যে সম্পূর্ণ অবাস্তব, একটু পরেই তা বোঝা যাবে।

৭. বন্ধকি কারবার : ভিক্টোরীয় যুগে এবং তার কিছুকাল পরও ইংলন্ডে বন্ধকি কারবারের যথেষ্ট রমরমা ছিল। সমাজের প্রায় সব শ্রেণির মানুষ নিজেদের দামি জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার করত এই ধরনের দোকান থেকে।

৮. কাগজ কলম কালি নিয়ে গেলাম : যারা সপ্তাহে চার পাউন্ড মাইনে দিতে পারে, তারা কেন যে কাগজ কলম কালি জোগাতে পারল না, সেই প্রশ্ন তুলেছেন কিছু সমালোচক।

৯. অক্টোবর ৯, ১৮৯০ : ওপরের ৬নং টীকা দ্রষ্টব্য। উইলসন কাজে লেগেছিলেন ২৯ এপ্রিল। কাজ করেছেন আট সপ্তাহ। তাহলে অক্টোবর মাসে প্রায় সাড়ে চোদ্দো সপ্তাহের হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না।

১০. সলিসিটর : সলিসিটররা আইন ব্যাবসা করতেন। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট বা জাস্টিস অব দ্য পিস-এর ওপরের কোনো আদালতে তারা সওয়াল করতে পারতেন না।

১১. উইলিয়াম মরিস : এই গল্প যখন প্রকাশিত হয়, সেই সময়ে লন্ডনে উইলিয়াম মরিস (১৮৩৪-১৮৯৬) নামে এক খ্যাতনামা সমাজবাদী নেতা ছিলেন। তিনি ছিলেন কবি, চিত্রকর এবং ব্যবসায়ী।

১২. স্যাক্স কোবার্গ স্কোয়ার : লন্ডনে এই নামে আদৌ কোনো রাস্তা বা এলাকা নেই।

১৩. স্ট্যান্ড : টেমস নদীর তটরেখা বরাবর লন্ডন শহর থেকে ওয়েস্ট এন্ড পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা। এই রাস্তা এবং সাদাম্পটন স্ট্রিটের সংযোগস্থলে অবস্থিত ছিল স্ট্র্যান্ড ম্যাগাজিনের কার্যালয়।

১৪. স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড : লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের সদর দপ্তর ৪, হোয়াইট হল প্লেস ছিল স্কটল্যান্ডের রাজপরিবারের সম্পত্তি। ইংলন্ড ও স্কটল্যান্ডের সংযুক্তিকরণের আগে স্কটল্যান্ডের রাজপ্রতিনিধি বা দূত এই সম্পত্তি ব্যবহার করতেন।

১৫. পিটার জোন্স : দ্য সাইন অব ফোর উপন্যাসে অ্যাথলেনি জোন্স নামের এক গোয়েন্দার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৬. সুড়ঙ্গ খুঁড়েছে : অতখানি লম্বা সুড়ঙ্গ খুঁড়তে যে মাটি বেরোল, সেগুলি কোথায় রাখা হল তার ব্যাখ্যা কিন্তু পাওয়া যায়নি।

১৭. সোনা লুঠ : ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখা সোনার ওজন কিছু কম ছিল না, সুড়ঙ্গ দিয়ে অত সোনা সরানো এবং তারপর সেগুলি অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কী ব্যবস্থা চোরেরা করেছিল, তাও অজানা রয়ে গিয়েছে।